প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৫ ॥ আগস্ট ১৯৫৮

প্রকাশক :

ডি. মেহ্‌রা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০৭৩

৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১

১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪

৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : দরিয়াগঞ্জ : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদশিল্পী :

অজয় গুপ্ত

মুদ্রক :

কনকপ্রভা বসু

কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৬

সমর সেনের জন্য

সূচীপত্র

১

১	কলকাতা প্রতিদিন	১
২	ভস্মশেষ	৮
৩	এ-দেশ তাঁর অভাব বোধ করবে না	১৬
৪	একটি চেনা মেয়ে	২১
৫	মাদার কারেজ	২৮
৬	ইন্দ্র লোহারের কাহিনী	৩৪
৭	জন্মিলে মরিতে হবে	৪০
৮	এক ঐতিহাসিক সমান্তর	৪৬
৯	কমল বসুর মুক্তিলাভ	৫৩
১০	ফ্যাশিবাদ চলবে না	৬০
১১	সত্যমিথ্যা	৬৬
১২	ক্ষীণ আশার হাওয়া	৭৩
১৩	পাণ্ডববিবর্জিত	৮০
১৪	একটি বিপ্লবী হাতঝাঁকুনি	৮৬
১৫	কর্তার ভূত	৯২
১৬	এই ভিড় শীর্ণ, কুঞ্চিত	৯৭
১৭	কবিকাহিনী কবিবাহিনী	১০২
১৮	একটি ছোট্ট অন্ত্যেষ্টি	১০৭
১৯	আখতারি বাঈ-এর জাতীয়করণ	১১৪
২০	একজন সাধারণ লোক	১২০
২১	বহু স্বপ্নের অস্থিচুর	১২৭
২২	আনন্দময়ীর আগমনে	১৩৩
২৩	টোটেমই সব	১৩৮
২৪	গ্যের্নিকা মৃত্যুহীন	১৪৩
২৫	ভুল নিশানার তীরন্দাজ	১৪৮

২

২৬ দুমুখো অর্থনীতি ১৫৭
২৭ স্বপ্ন যদি সত্যি হত ১৬২
২৮ নয়া ব্রাহ্মণ ১৬৮
২৯ বারোমাসে তেরো পার্বণ ১৭৪
৩০ অন্তিম প্রতিকার ১৮০
৩১ উপরি দু-টাকার জন্য ১৮৫
৩২ এ-পথে আমি যে গেছি বার-বার ১৯১
৩৩ বছরের সেরা ভোজবাজি ১৯৭
৩৪ যঃ পলায়তে ২০৪
৩৫ তথ্য যা বলে ২১১
৩৬ রসিক উজির ২১৭
৩৭ ব্রাজিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন ২২৩
৩৮ মুষ্টিভিক্ষা চাই ২২৯

৩

৩৯ নেই-দেশের দিনপঞ্জি ২৩৫
৪০ বিশ্বের সবেধন হিন্দুরাজত্ব ২৪১
৪১ প্লাস্টিক সার্জারি বিলকুল বরবাদ ২৪৭
৪২ দীন দুনিয়ার মালিক ২৫৩
৪৩ পরিপাটি এক সমাজ … ২৬০
৪৪ লর্ড কিচেনার বহাল তবিয়তে ২৬৮
৪৫ বুড়ো হাড়ে ভেলকি ২৭৬
৪৬ একখানা বিপ্লবই কি যথেষ্ট ? ২৮২



১

কলকাতা প্রতিদিন

ঘাম। ঘামের গন্ধ। কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একটি ঝরঝরে বাস কালো ধোঁয়ার অসুস্থ কুণ্ডলি ওগরাচ্ছে। শুকনো ঘাস, মরা ঘাস, পোড়া সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাগজ—ট্র্যামের রাস্তার দুই সমান্তরাল রেখার মধ্যে সবকিছুর গোবেচারা সহাবস্থান। এক সাড়ে-তিন তলা বাড়ি—সম্ভবত ১৯৩৮-এর কাছাকাছি কোনো সময়ে তার গায়ে রঙের পোঁচ পড়েছিল ; বাড়িটা কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না এক্ষুনি ফুটপাথে ধ্বসে পড়বে, না কি পৌনে একঘণ্টা পরে। দেয়ালে-দেয়ালে বিপ্লবী বিবৃতি। কিংবা নিদেন তার কোনো-একটা সংস্করণের। ভিখিরির দল। এক কুষ্ঠরোগী আর তার সুন্দরী বউ। হঠাৎ এক গাছ : প্রায় কুড়ি ফিট লম্বা, চারদিকে রোগা-রোগা ডালপালা, ফুলে-ফুলে লাজুকভাবে হাসছে। ঘরমুখো স্কুলের ছেলেরা, এ ওকে ঢিল ছুঁড়ছে। বাজার : মাছ, শাক-সব্জি আর অস্নাত মানুষের গায়ের গন্ধ মিলে-মিশে একাকার, ঝিম-ধরা। কিছু প্রতিবিপ্লবী আর্যবচন, এবার এক সিনেমার বিজ্ঞাপনের গায়ে ছিটোনো। হিন্দি দিবাস্বপ্ন, সম্ভবত তামিলনাড়ু মার্কা, চিলতে চোলি আর খাটো শাড়ি, স্তনগুলোয় অঢেল সুখের ইশারা। কাকের দঙ্গল, নেতিবাচক নান্দনিক হিসেবের ভাগফল একেকটা স্ট্যাচু, লোহিয়ামার্কা অপসারণের জন্য চ্যাঁচাচ্ছে—এমন-সব স্ট্যাচু। ফুটবলের ভক্তদের চেয়েও প্রতি বর্গকিলোমিটারে কবির সংখ্যা বেশি। এক খবরকাগজের কিয়স্ক, গণ্ডা-গণ্ডা কবিতার কাগজ, আরো বিপ্লবী বাণী। গ্রীষ্মমণ্ডলে বিপ্লব, গ্রীষ্মমণ্ডলে মহব্বৎ, গ্রীষ্মমণ্ডলের বস্তাপচা কবিতা। লাল ত্রিকোণ, অশ্লীল সমাজ, নয়া

দিল্লি থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে-পড়া আধ্যাত্মিক আহ্লাদ। একটি রেশনের দোকান, সবুজ বিপ্লবের সংবিধান, আরেক ধরনের বিপ্লবী সত্যের একটি গরাস—বিপ্লবের সাফল্য যত বেশি হবে, গমের দামও তাই। দ্বন্দ্ববাদের নানা দিক, বহু বহিরঙ্গ, ময়দানে বক্তৃতা, আর ক্যালকাটা ক্লাবে লাঞ্চ খেতে-খেতে দরাদরি। ইতিহাস এখনও যাদের গ্রেফতার করেনি এমনি-সব রং-করা স্ত্রীলোক, গল্‌ফ, শনিবারের রাত, অলস অপরাহ্ণে পার্ক স্ট্রিটের আশপাশে কেনাকাটার মরূদ্যান, এয়ার-কণ্ডিশনার বসানো গাড়ি। ভিখিরি, পকেটমার, জীর্ণ উর্দিপরা পুলিশ, একটা হাইড্র্যান্ট সকাল থেকেই ফেঁসে রয়েছে। রাস্তাঘাট ভাসিয়ে জোর এক পশলা কালবৈশাখী, গোটা দুই ক্লান্ত গাছ বিজলি তারের ওপর ঘাড়মুখ গুঁজরে আছাড় খেয়েছে। যতটুকু সাধ্য তার চেয়েও বেশি কাজ করার দৃষ্টান্ত: যে নাগরিক-সুবিধেগুলো এককালে ভাবা গিয়েছিল মাত্র আট লক্ষ লোকের জন্য এখন তাদের আশি লক্ষ লোকের কাজে টেনে বাড়ানো হল। এরই বিরোধাভাস হল মানুষ—যাদের কাজে লাগানো হল খুবই কম। ক্ষুদে-ক্ষুদে ইনজিনিয়ারিং সংস্থা, ছাঁটাই মজুর, বেকার তরুণ প্রয়োগবিদ্‌। রাজনৈতিক দলগুলোর তাতে কীই বা এসে যায়, আর মাথা ঘামাতেও পারে না, কেবল বইয়ের পর বই আউড়ে যায় রুশদেশ চীন বা কুবার অবস্থার কথা। কলকাতা ১৯৬৯-এর হাল যে কী, তার কোনো হদিশ নেই। মুঠোপাকানো হাত, মাও-এর রেডবুক, আকাশে-বাতাসে হিংস্রতা, তার মোকাবিলাও করবে তেমনিতর হিংস্রতাই, ভাপ, কুয়াশা, স্নায়ুর গোলযোগ, আর কোন্‌ অর্থের কী সারার্থ। মাস্টারমশাইদের মিছিল, প্রচুর মেদপৃথুল স্ত্রীলোক ছোটো-ছোট সভায় ভাষণ দিচ্ছে: কৃত্রিম জরায়ু সংরক্ষণ সমিতি। কেরানিরা—না-পারে নথি সেরেস্তা ঠিক রাখতে, না-পারে ব্যারিকেডে লোক রাখতে: পুষ্টির অভাব, এদিকে জ্বালাময়ী ভাষার ফুলঝুরি। বউয়েরা রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের মধ্যে হন্তদন্ত দৌড়োয়, অনেকেই টেঁশে যায় তিরিশ ছোঁবার আগে, ছেলেপিলেগুলো গোল্লায় যায়। পুষ্টির অভাব, কিন্তু স্নায়ুর দাপট তুলকালাম, তেড়েফুঁড়ে আসে, স্নায়ুর তাকৎ যত চাই তত।

দু-দল গুণ্ডায় মারামারি, দিশেহারা অস্থির কিশোরীদের পেছন-তাড়া, খাদ্যের অভাব, কিন্তু চায়ের দোকান অজস্র, কেউ-কেউ দিশি মালের দোকানে দেশান্তরী হবে। তরুণদের বিপ্লবী করে তুলতে হবে, পকেট ভর্তি লিন পিয়াও, বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব, ঘূর্ণির মধ্যে ঘূর্ণি, অন্য কত স্বর, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের অন্য-সব ব্যাখ্যা। এক ব্যাঙ্ক লুঠ, বিবেকহীন সাংবাদিক, দার্শনিক সেজে ঘুরে-বেড়ানো সাংবাদিক, দেশনেতা সেজে ঘুরে-বেড়ানো সাংবাদিক। রবীন্দ্রনাথ আর তাদের মধ্যকার ইতিহাসে ছিল ফক্কা, শূন্য, কিছুই না—এই কথা ভেবে নিয়েছে এমন-সব সাংবাদিক। বিপ্লবী আবরুমোচনের রীতি ; যত আপসহীন কোনো বিপ্লবী, উঁচু বুর্জোয়া খবরকাগজগুলোয় জায়গা পাবার জন্য তত হাপিত্যেশ, তত আকুলি-বিকুলি। অন্য যে-বিধি, শক্তির বিনাশ-অবিনাশ সম্বন্ধে, তার মোদ্দা কথা : যত গর্জাও, তত বর্ষাও না। সাফল্য সম্বন্ধে সত্যি অবশ্য কেউ মাথাও ঘামায় না : অন্তত পাঁচ বছর ধরে রাইটার্স বিল্ডিংসএ থাকছে যুক্তফ্রন্ট, দুনিয়া তো তোফাই আছে। ১৯৭২-এর ঝলক, হিন্দুস্থান পার্ক থেকে সাউথ ব্লক, শিলিগুড়ি থেকে শ্রীকাকুলাম। টেরিলিনের পাৎলুন আঁটা যুবকেরা লালঝাণ্ডা, কাস্তেহাতুড়ি। সে যে কত হাতুড়ি আর কত কাস্তে, চাষীভাইদের মুক্তি চাই, মজুর হাতের যন্ত্র নামাও থামাও বলা জো-হুজুর, ট্র্যানজিস্টার রেডিও কিনবে বলে লালাঝরা মজুর। অর্থনীতিবাদ ক্লান্ত প্রাণের আফিম কি না, এই নিয়ে যারা মাথাই ঘামায় না—সেইসব মজুর। ছাত্ররা—যারা শতকরা সত্তর কি তারও বেশি নম্বর পেয়ে ভর্তি হয়েছে প্রেসিডেনসি কলেজে—কেউ যোগ দেয় বেকার ল্যাবরেটরিতে, কেউ বা বসে আই. এ. এস. পরীক্ষায় ; বই, বইয়ের দোকান, কফিহাউস, ফিসফিস কেচ্ছায় সরগরম ; তরুণীরা—যারা প্লাসটিক বোমা আর কবিতা লেখা দুইকেই মিলিয়ে দিয়েছে ; রিফিউজি বাড়ির মেয়েরা ; ছেলেরা—আন্তরিকতা আর, ফেরেব্বাজির মধ্যে দুই পা দিয়ে অনিশ্চিত দাঁড়িয়ে। সন্ধে, ছিঁচকাঁদুনে ইলশেগুঁড়ি, কাদা আর ধোঁয়া। এ কি তবে আর কোনো আশাই নেই এমন বোধ, না কি বিক্ষোভ ফেটে পড়ার আগেকার থমথমে শান্তি—কিংবা আবারও,

হয়তো দুই-ই। সন্ধ্যাবেলা, অনেক মানে হয় এমন-সব রবীন্দ্রসংগীত, ফুটবল মাঠ থেকে ফেরা ভিড়, ছোটোখাটো দাঙ্গা : সবই যে ঠিক আছে, সুস্থ, স্বাভাবিক, তারই আগমার্কা। কোথাও এক মার-মার কাট-কাট হুলুস্থুল, ওলটানো বাস, কোন্ এক রাস্তার ছোঁড়া চাপা পড়েছে, 'শুনুন, দয়া করে বাসে কিংবা ট্র্যামে আগুন লাগাবেন না, আপনাদের প্রিয় নেতাকে খবর দেয়া হয়েছে, উনি আসছেন, উনি আপনাদের ভাষণ দেবেন, উনি আপনাদের শান্ত হয়ে থাকতে বলবেন।' বিপ্লবী অনুত্তেজনা, সবার আগে চাই শৃঙ্খলাবোধ, ক্যাডারদের স্থির হয়ে থাকতে শিখতে হবে—এবং শিখতে হবে কী ভাবে স্থির না হয়ে থাকতে হয়, কিন্তু বড্ড বেশি লাল ঝাণ্ডা, অহংএ অহংএ সংঘর্ষ। বাঙালিরা—কে যেন দেখিয়েছিল—তিন-চতুর্থাংশ মোঙ্গোল। সীমান্তের ওপারেই তাদের আট কোটি আছে, শক্ত পোক্ত চাষীর বংশ, তিন-চতুর্থাংশ মোঙ্গোল। গ্রীষ্মমণ্ডলের আলস্য আর প্রশ্রয় বাদ দাও, যদি ভিয়েৎনামিরা তাদের ভাগ্য অর্জন করে নিতে পারে, তাহলে তোমরাই বা পারবে না কেন, তোমরা, যারা তিন-চতুর্থাংশ মোঙ্গোল? ইতিমধ্যে অবশ্য ক্যাডারদের শিখতে হবে বিপ্লবী সত্যের মৎপ্রণীত সংস্করণ : আমার বিপ্লব যে তোমারটার চেয়ে সরেস, এ তো স্বপ্রকাশ। আরো বিপ্লবী পোস্টার, করপোরেশনের ভোটের পোস্টারের মধ্যে আদ্ধেকও চাপা পড়েনি। ক্ষমতা বাড়ে; ক্ষমতা বাড়ে রাইটার্স বিল্ডিংসএ, ক্ষমতা বাড়ে দুর্গাপুরে, ক্ষমতা বাড়ে বিতর্কিত—এবং তত বিতর্কিত নয়, এমন—জমিতে বর্গাদারেরা চেপে বসার পর। বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস—কার বন্দুক, কোন্ নল? ক্ষমতা বাড়ে, যেহেতু হিন্দু চাষী তার মুসলমান প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পারে না; ক্ষমতা বাড়ে, যখন হিন্দু মজুর গুণ্ডাবদমাশদের সঙ্গে জোট বাঁধে মশজিদ ভেঙে দিতে; ক্ষমতা বাড়ে, যখন পৌরসভার এক কমিউনিস্ট সদস্য পাড়ার দুর্গাপূজা সমিতির সভাপতি হন; ক্ষমতা বাড়ে, যখন কোনো পার্টি কমরেড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অভ বেঙ্গল দখল করে নেবার রণকৌশল ফাঁদেন। ক্ষমতা বাড়ে বিসর্পিল উভয়বলী ধরনে;

ক্ষমতা তো বেড়েছে ইন্দোনেশিয়ায়, অন্তত ১৯৬৫-র অক্টোবর অব্দি। মনে আছে মাও সে তুংএর প্রশ্ন? চমৎকার, কমরেড আইদিৎ, লোকসভায় আর সেনাবাহিনীতে আপনার তো এতজন লোক, তাই না, তো তবে আপনারা পাহাড়ে ঘাঁটি গাড়ছেন কবে? নথির পাহাড়, বিপ্লবী সাহিত্যের পাহাড়, কবিতার পাহাড়। কবিতা আর নাটক আর গান আর নাচ। আ, গণনাট্য সংঘের বীরেরা কোথায় গেলেন? তাঁরা তো পাহাড়ে যাননি, তাঁরা জঙ্গলে ঢুকেছেন—নামকাম করার জঙ্গলে। বিপ্লব করতে গেলেও তো আপনার টাকা চাই, এমনকি কড়কড়ে নগদ টাকা বিলোতে গেলেও বিপ্লব চাই, টাকাই প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। আরো একটা ব্যাঙ্ক লুঠ, ঢেউ মিলিয়ে যাবার আগে দু-একটা বুড়বুড়ি গিয়ে পৌঁছোয় সেইসব মেয়েদের কাছে যাদের সতীত্ব তত বজ্রআঁটুনি নয়। অনেক রকমেরই সতীপনা কাজ করে যাচ্ছে, সতীত্বে সতীত্বে একেবারে ছয়লাপ। তবে এইসব সতীত্বের বিনিময় যে এতই সহজে ঘটে যায়, তাতেই জনতার থমকে যাওয়া উচিত, হর্ষে পুলকে রোমাঞ্চে ভরে যাওয়া উচিত। নির্দ্বন্দ্ব স্ববিরোধিতার যে এমনি রক্তবীজের মতো বংশবৃদ্ধি হয় তা তো জানা ছিল না কারু। সবকিছুই চলে: সবকিছু দিব্যি চলে অন্যকিছুর মধ্যে: সাম্যবাদ, সরকারি চাকরি, বিপ্লবী ভাষণ, কোনো মারকিন বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ, বম্বাইমার্কা সিনেমার প্রযোজনা, রেডবুক, আরোএকটা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। হুগলির ওপর নতুন সেতু বসাবার প্রস্তাবের মতো রোজই টাটকা আনকোরা নতুন পার্টি, অধিকন্তু ন দোষায়, যত দল তত হুল্লোড়। যদি একজনে চেষ্টা করে আর জনাকয়েক মিলে গলাগলি করেও যদি তা হয়, তবে কোথাও একটা গিয়ে পৌঁছুবোই আমরা। পরস্পরের সঙ্গে লড়ুক না সহস্র ভাবনা, প্রতিটি ভাবনাই স্থান পাবে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট—অথবা যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী—দলে, যদি অবশ্য অমন কোনো দল গড়ে তোলার চেষ্টা করে কেউ। শ্রমিকদের কিছুই এসে যায় না, ছাত্রদেরও কিছু এসে যায় না, কেরানিদের কিছুই এসে যায় না, গৃহলক্ষ্মীদেরও কিছু এসে যায় না, বাক্সওলা মনসবদারদেরও

কিছু এসে যায় না। গৃহলক্ষ্মীদের যত্নআত্তি শুধু সস্তা উপন্যাসোপম বড় গল্প আর সিনেমার পর্দায় আবির্ভূত আরো শস্তা হাঁদাদের জন্য। অথচ তাদেরই একটা বড়ো অংশ কমিউনিজমের কোনো-একটা সংস্করণের জন্য ভোট দেবে; বিপ্লব শুরু হবার জন্য তর সয় না তাদের—রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যেগুলো বেশি অসহ্য, সেখানে যেমন দয়াময়ের প্রতি অভিমান থাকে, সব বাঙালির কাছে তেমনিভাবে বিপ্লবই সর্বস্ব, বুকের ধন, পরশপাথর। ধুলো, গরম। পায়ের তলায় অ্যাস্‌ফল্ট গলে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটের দশা কী নিদারুণ করুণ। যুক্তফ্রন্ট থাকুক বা না-থাকুক, কানু সান্যাল রেডবুক আঁকড়ে থাকুন বা না-থাকুন, জোড়াসাঁকো-জোড়াবাগান-বড়োবাজার-চৌরঙ্গিতে কিছু লোক টাকা কামাচ্ছে; তারা আপনাকে এমন-কি বিপ্লবের পক্ষেও খোলামকুচির মতো মহাপুরুষের উক্তি বিতরণ করতে পারে। কিন্তু এ-সব যে যোগ করা যায় না, যোগ করলেও যে কিছু হয় না। কলকাতায় অবশ্য কিছুরই কোনো মানে নেই। পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে, এখানে-ওখানে, ভিক্টরিয় উপনিবেশবাদ ও আইজেনহাওয়ারীয় আমেরিকার বর্ণসংকরজাত তলানির ছোপ। দলছুট চীনেরা বছরের পর বছর বানিয়ে চলেছে নিষ্করুণ জুতো, দালালরা রেস্ত ভাগ করে নিচ্ছে পোকাপড়া ভুটানি বেশ্যার আয় থেকে, আর বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ইওনেস্কোর এক হিন্দি সংস্করণের অভিনয় চলেছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মহিমার মধ্যে পৃথুলামধ্যবয়েসী মহিলাদের সামনে। আচমকা, এক মিছিল। আচমকা ছিটকোতে শুরু করে বোমার টুকরো। আচমকা কিছু রক্তক্ষরণ। জিগেস করে দেখুন ফিরিওলাদের; দুপুরবেলায় ঠিক এখানটাতেই দুজন সাবাড় হয়ে গেছে, ফিরিওলারা এর চেয়ে বেশি উদাসীন আর হবে কী করে। কিছুই মেলানো যায় না কলকাতায়। না বিপ্লব, না শোধনবাদ। না সত্যজিৎ রায়ের তথাকথিত গুণপনার গুজব, না বা তাঁর বহুস্তুত প্রতিভা। না কবিতা, না নবনাট্য। না রাস্তায় গর্ত, না ঝলমলে করবী গাছ। না বস্তীবাসীদের অসাড় যা-দশা, না বা সামাজিক প্রজাপতিদের রংবাহার। এটা এক ভয়ংকর মাথাঘোলানো সহাবস্থান। প্রত্যেকে

প্রত্যেকের সঙ্গে মিশছে ঃ ক সকালবেলার সম্পাদকীয়তে পেড়ে ফেলছে খ-কে, ক সন্ধেবেলায় যাচ্ছে খ-এর ককটেল পার্টিতে। সব মিলিয়ে বিপ্লবের মধ্যেই কত বিপ্লব, আবর্তের মধ্যে কত আবর্ত। কলকাতাকে বোঝার সাধ্য কারু নেই, কলকাতা অসংশোধনীয়, কলকাতার অবস্থান সম্ভবপরতার পরপারে। গ্রীষ্মকাল। ছায়ার মধ্যেই একশো ন ডিগ্রি ফারেনহাইট। এক মিছিল। এক সভা, জমায়েৎ। 'আন্তর্জাতিক', জাগো জাগো জাগো সর্বহারা। লেনিন কী বলেছেন, কখন। এবং কেন। আমার উদ্ধৃতি তোমার উদ্ধৃতির চেয়ে ভালো। আমি বেকার, তুমি বেকার। আমি বিপ্লবী, তুমি নয়াশোধনবাদী, ওরা আসলে আমার সঙ্গেই আছে, ওরা কেবল একটুক্ষণের জন্য তোমার ধাপ্পায় ভড়কি খেয়েছে। আমি রেডবুক আওড়াই, তুমি রেডবুক আওড়াও— ওদের কিসসু এসে যায় না! অথচ, শুধু ওদের দিয়েই বিপ্লব হয়··· রক্ত, তিন-চতুর্থাংশ মোঙ্গোল। রক্তকণিকার উল্লেখ করে তুমি তো স্বীকারই করো তোমার সামাজিক ফ্যাশিবাদের চাপা বোধগুলো। কিন্তু আমারও এর উত্তর জানা আছে ঃ বিপ্লবের মধ্যে কত বিপ্লব, আবর্তের মধ্যে কত আবর্ত···

২

ভস্মশেষ

চুপি-চুপি, গত হপ্তায় এক রাতে, হাওড়া থেকে তাঁরা নয়াদিল্লির ট্রেনে চেপে বসেছিলেন, সবশুদ্ধু নব্বুই জন হবে সংখ্যায়, বেশির ভাগেরই বয়েস ষাট পেরিয়েছে, কয়েকজন তো আরো, আরো বুড়ো। অবসন্ন, নির্জীব, উদাসীন সব বৃদ্ধ, কয়েকজন বৃদ্ধাও আছেন ; কে সে কল্পনা করবে যে এঁদের মধ্যেও, এককালে, আগুন ছিল, যে-আগুন বিপ্লবী অনুভূতির কত বিচিত্র ধারাকে ঝলসে তুলেছিল ? এক হতজীর্ণ স্পেশ্যাল ট্রেন তাঁদের নিয়ে গেল রাজধানীতে ; তাঁরা—নিকট অতীতের রাজনৈতিক নির্যাতিতরা—তাঁদের নাকি স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে সম্মান দেখানো হবে। তালিকাটি খুবই খুঁটিয়ে গড়া ; সত্যি তো, অন্তত দেশের এই অংশে, ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে, ইংরেজদের এই-ঐ জেলখানায় কাল কাটিয়েছেন এমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কোনো ইয়ত্তা নেই—আর তাঁরা হয়তো বেঁচেও আছেন, আশপাশেই। সরকারকে বেশি দোষ দেয়া ঠিক হবে না ; এই হাজার-হাজার রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিল্লি যাওয়া-আসার রাহা খরচ সে নিশ্চয়ই জোগাতে পারবে না ; তাদের সকলের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হত। কাজেই একটা ছোটো তালিকা অপরিহার্য : অতীতের দেশপ্রেমিক বীর-বীরাঙ্গনাদের মধ্য থেকে জর্জর নিরুৎসাহ এই নব্বুইটি আত্মা শুধু বাছাই নমুনা। এও হতে পারে সেই বৃষ্টিভেজা রাতে যাঁরা হাওড়া স্টেশনে জমায়েৎ হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই একচোখোমির নজির—হয়তো নমুনাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে স্তরান্বিত করে দেখা হয়নি, হয়তো যাঁরা এখন শাসকদলের দিকে ঝুঁকে আছেন, তাঁরাই শুধু তালিকায় উঠতে পেরেছেন—অন্য যাঁরা উল্টোদিকে

হেলে আছেন, তাঁদের হেনস্থা করা হয়েছে। আর এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেরা তালিকায় নাম ওঠাবার জন্য নিজেদের মধ্যে কী খেয়ো-খেয়িটাই না করল: কলকাতার দুই প্রধান দলের মধ্যে দারুণ উত্তেজনায় ভরা ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে রবাহূত ও ধেড়ে ছোকরাগুলোও হয়তো এমন কুৎসিত হুজ্জুত করত না, অথবা আত্মসম্মান বোধের এতটা অভাব দেখাত না। ফুলকি কবেই নিভে গেছে, সত্যি নিভে গেছে, সন্দেহাতীত-ভাবে; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শুধু তাঁদের স্মৃতির শোচনীয় ও শোকাবহ প্রদর্শনী, যদি দৈবাৎ কোনো-কোনো মনের গোপনে সেই আগুনের ছিটেফোঁটাও ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে এখনও। ছিন্নমূল, নিরাশ্রয়, উঞ্ছজীবী—বাসস্থান বা সংস্থান কোনোটাই এঁদের থাকে না কখনো; মুদ্রাস্ফীতি আক্রান্ত দুর্নীতিবশ প্রথাটির জালজটিলতার সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেন না এঁরা, কোনো মতে নয়াদিল্লি যাবার দর্শনী জোগাড় করে নিতে পারাটাই এখন এঁদের সন্তোষের ভিত্তি। সম্মান করুন এঁদের, এঁরা তো আপনাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। এছাড়া অবশ্য আছে ব্রিটিশ আমলের প্রতিটি রাজনৈতিক লাঞ্ছনার বলিদের জন্য দুশো টাকার মাসোহারা দেবার এক প্রকল্প, শুধু একটা-কোনো দলিলের প্রত্যয়িত নকল চাই, সরকারের গেজেটে-নাম-ওঠা কোনো আমলার দস্তখৎওলা একটি প্রত্যয়িত নকল—এটাই প্রমাণ করতে যে ইনি সত্যি ইংরেজদের কোনো জেলখানায় ঘানি টেনেছেন, এবং সেটা কোনো রাজনৈতিক কর্মের জন্য। বিচিত্র সব দলমতের প্রাক্তন বিপ্লবীদের সে কী ছুটোপাটি আর সাড়া: চোখে ঝকঝকে আলো, বেশ খানিকটা ছুটোছুটি, ঊর্ধ্বশ্বাসে, এই দুর্লভ দলিলটিকে নিয়মমাফিক প্রত্যয়িত করে নেবার জন্য। গেজেটে-নাম-ওঠা আমলাদের হঠাৎ দারুণ চাহিদা আর খাতির: অতীতের সব মহান বিপ্লবীরা, কিংবদন্তির সব নাম, সরকারি আমলাতন্ত্রের যে কারু কাছে ব্যাকুলভাবে কাকুতি-মিনতি করে চলেছেন: শুনুন, অনুগ্রহ করে দিন না এটা প্রত্যয়িত করে, প্রত্যয়িত······

তাহলে স্বাধীনতার পরে এই কী আমাদের সব সুকৃতির পরিমাপ? শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীদের রাস্তার ভিখিরি বানিয়ে তোলা? তাকিয়ে দেখুন

একবার এঁদের, এঁরা মনে করিয়ে দেন সার্কাসের সব মরফিয়াঠাশা করুণ সিংহদের : উপলক্ষ এলে এঁদের খেল দেখাতে হবে, চাবুক আছে উঁচনো, আছে শপাং, আছে চাবুকের হিশ করে নেমে আসা : একবার তাদের খেলাটা পালাটা শেষ হয়ে গেলে সিংহরা চলে যায় আড়ালে, পেছনের দু-পায়ের মধ্যে ন্যাৎ-ন্যাৎ করছে ল্যাজ, ঘুমের ওষুধ এতটাই যে জাগরণের আর-কোনো সম্ভাবনাই নেই।

লাঞ্ছনায় আর অপমানে ভরা একটি দৃশ্য। কিন্তু জিগেস করুন সরকারকে, সন্দেহের কোনো দ্বন্দ্বই নেই এতে, আমরা তো এঁদের শ্রদ্ধাই জানাচ্ছি, যাঁরা আমাদের জন্য স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। কিন্তু এঁরা নিজেরা ? এঁরা যখন ভাবেন ? নিদারুণ দারিদ্র্য আর লাঞ্ছনায় কোণঠাসা, অতীতের এই মস্তান বিপ্লবীরা কী ভাবেন পঁচিশ বছরের এই স্বাধীনতা সম্বন্ধে ? তবে কি, হায়, সরকারের হাতে-পায়ে ধরে বাড়তি দুটি পয়সা জোগাড় করতে গিয়ে তাঁদের মস্তিষ্কের সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই তূরীয় অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে ? বৃদ্ধেরা, তারা বলে, ভুলে যায়। কিন্তু এঁদের সব স্মৃতিই কি তাহলে বেমালুম উধাও ? আদর্শচ্যুত, আবেগবর্জিত শুধু কি বুড়ো হাড়গোড়ের একটা পোঁটলাই এঁদের সম্বল ?

এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনেকেই—যখন তাঁদের দিনগুলোয় আগুন ধরেছিল—স্বপ্ন দেখতেন শ্রেণীবিহীন সমাজের, এক আদর্শ সমাজতন্ত্রের। এমন-এক সমাজের স্বপ্নে তাঁরা বিভোর ছিলেন যেখানে শোষণ-নিপীড়নের সব প্রকরণই হবে নিষিদ্ধ : সেখানে হয়তো অজস্র ঐশ্বর্য থাকবে না, কিন্তু যতটুকু থাকবে, সবাই সেটা সমানভাবে মিলেমিশে ভাগ করে নেবে। তাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে। তাঁরা কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে সেই দাসত্বহীন ব্যবস্থা এসে গিয়েছে ? এই কি, এই কি সেই মুখশ্রী যা হাজার তরী ভাসিয়েছিল সিন্ধুজলে আর আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ট্রয় নগরে ?

স্মৃতি হানা দেয়। কয়েকবার সেই স্বপ্নগুলোর স্মৃতি। সেই স্মৃতি, যখন সবাই আগ্রহে অঙ্গীকার করেছিল, ত্যাগ করেছিল উন্নতি বা প্রতিষ্ঠার সহজ পথ, সজোরে এড়িয়ে গিয়েছিল সব প্রলোভন, সব ব্যক্তি-

স্বার্থ। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে পূর্ববঙ্গের কোনো শহরেরই অলিতে-গলিতে হেঁটে যাওয়া যেত না, তা সে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর বা বরিশাল যা-ই হোক-না কেন, কেউ-কেউ দেখিয়ে দিতই কোনো বাড়ি, যেখান থেকে কোনো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আন্দামানে অথবা কোনো অজপাড়াগাঁয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে, কিংবা তাকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়েছে অন্য দূর রাজ্যে; কিংবা বলা হত কোনো মেয়ের কথা, পিকেট করেছিল বলে যাকে বের করে দেয়া হয়েছে কলেজ থেকে, অথবা অসহযোগ আন্দোলনের দিনে যে জেল খেটেছে। বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শের সে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি সেদিন এইসব তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হয়েছিলঃ বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের টুকরোটাকরা বিশৃঙ্খল পঙ্‌ক্তি; তিলক থেকে সি. আর. দাশের এক ঝলক সালংকার উচ্চারণ; মাঝে-মাঝে গান্ধিমহারাজের বাণী—তাঁকে তখন এই প্রিয় নামেই ডাকা হত; আইরিশ ম্যাকস্যুইনির দৃষ্টান্ত; সুভাষ বসুর জাদু আর অভিরাম সম্মোহন জেলখানা থেকে অথবা পালাতে-পালাতে কোনো সন্ত্রাসবাদীর লেখা নথিপত্র—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আনা; চমৎকার চমকপ্রদ রুশ-বিপ্লবের সেই গোড়ার দিকের যত প্রস্তাব ও পুস্তিকাঃ ম্যাকসিম গোর্কি, লেনিন, বুখারিন, এখানে-ওখানে মার্ক্সের টুকরোটাকরা, অনেকটাই অনাত্মীকৃত। কুচকাওয়াজ করে চলেছিল সহস্র; সহস্র, পিলপিল করে ঢুকেছিল জেলখানায়; কেউ হাতে তুলে নিয়েছিল পিস্তল. কয়েকজন ধীরে-ধীরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে এগিয়ে এসেছিল। বিশেষত এই শেষোক্ত রূপান্তরটি যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধিনির্ভর। এই তরুণ-তরুণীরা প্রধানত এসেছিলেন নিবিড় এক হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে—যাঁদের ভরণপোষণ নির্ভর করত নিচু তলার চাষীসমাজকে শোষণ করার ওপর—আর সেই চাষীসমাজ প্রধানত গড়ে উঠেছিল মুসলমান ও অন্ত্যজ শ্রেণীকে নিয়ে। যাঁরা সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের সামনে সেইজন্যেই ছিল ভেবেচিন্তে বেছে নেবার প্রখর দায়, কেননা আদর্শ একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে শ্রেণীস্বার্থকে। তবু, সানন্দে, তাঁরা এই সংক্রমণ ঘটিয়েছিলেন।

বাড়িঘর, পুরোনো আনুগত্য ও ধ্যানধারণা ছেড়েছুড়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন দেশেগাঁয়ে গরিব চাষীদের সংগঠিত করার জন্য; বৃহত্তর কলকাতার পাটশিল্পবেষ্টনীর মধ্যে তাঁরাই প্রথম শুরু করেছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন অন্দোলন; ছাত্র-ছাত্রীদের দীক্ষিত করেছিলেন প্রগতিশীলতায়। যখন পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালোছায়া হানা দিল, আর লক্ষ-লক্ষ মানুষ মারা গেল, তাঁরা, তাঁদের হৃদয়ে ঐক্য আর সহমর্মিতার প্রখর বোধ, তাঁরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ত্রাণের কাজে, সামান্য যা ত্রাণশিবির তাঁরা সংগঠিত করেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল জেদ, উগ্র দায়িত্ববোধ, কর্ম-উদ্দীপনা। হয়তো যা তাঁদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তা তাঁদের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা আর এই সর্ববিসারী আস্থা, যে একদিন এই স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠবে।

দেশভাগ, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে এল যে ব্যাপক হত্যা আর উচ্ছেদ—ছিনিয়ে নিয়ে গেল সব। আর বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত আশাহীনভাবে ফাঁদে পড়ে গেল তার অবস্থানের গলদে-স্ববিরোধে। হঠাৎ দেশটা টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল; পূর্ববঙ্গ, হয়ে গেল পাকিস্তানের অংশ: আর বিপ্লবী ও রাজনৈতিক প্রগতিবাদীদের পায়ের তলা থেকে আক্ষরিকভাবে সরে গেল শক্ত মাটি। কিছুকাল তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন পূর্ববঙ্গে থেকে গিয়ে নতুন রাজনৈতিক বিন্যাস রচনা করতে। সেই চেষ্টা সফল হয়নি, আর পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে মহাপ্রস্থানের সেটাই শুরু। এইসব লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্মীদের অনেকেরই আত্মীয়স্বজন ধরা পড়ে গেল উৎকট সাঁড়াশিতে; সীমান্তের ওপারে হারিয়ে গেল সম্পত্তি; আচমকা রূঢ় ঝটকা খেল ছেলেমেয়ের শিক্ষা; এমন-কি সামান্য মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করাটাও কঠিন হয়ে উঠল। সে ছেঁটে দিল পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি আর স্বাভাবিক বিকাশ, ধীরে-ধীরে বদলে গেল রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের অন্তঃসার। কলকাতায় আর আশেপাশে বৃদ্ধি পেতে থাকে উদ্বাস্তু শিবির, বিচ্ছিন্নতাবোধ কথাটি আর বইয়ে-পড়া তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ থাকে না, বরং হয়ে ওঠে নির্মম বাস্তব। সমাজের উঁচু মহলকে যে-সমৃদ্ধি ছুঁয়ে গেল, অতীতের স্বাধীনতাসংগ্রামীদের অনেকেরই পাশ

কাটিয়ে তা চলে গেল, ঠিক যেমনভাবে দেশের বিপুল জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশেরও নাগালের বাইরে তা থেকে গেল। অনেক-দিনকার সৈনিক কখনো মরে না—তারা মিলিয়ে যায়—বাংলাদেশের অবদান প্রধানত উধাও হয়ে গেল বিভিন্ন রঙের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর অলিতে গলিতে। কেউ-কেউ পারঙ্গম চমৎকার তাত্ত্বিক বিতর্কে আর অন্তর্দলীয় কোন্দলে। কিন্তু তাঁদের বড়ো অংশটাই চুরমার হয়ে গেল, সীমান্তরবাসীদের সুকঠোর অস্তিত্বের নামহীনতায় ফিরিওলারা দরাদরি করে দখল করে নিল কংগ্রেস, বামপন্থীদেরও কোন-কোন গোষ্ঠীতে ঢুকে পড়ল সুচতুর সপ্রতিভ বাহারেরা আর সুবিধেবাদীরা—যারা সংসদীয় বিরোধিতার মধ্যে চমৎকার গুছিয়ে নিতে পারল আখের। অতীতের প্রগতিবাদী আর আদর্শবাদীদের সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হল; তাঁদের গিলে খেল নিদারুণ দারিদ্র্য আর বিস্মৃতি। গত পঁচিশ বছরে কোনো সরকারই তাঁদের কী দশা হয়েছে সে-খোঁজ নেয়নি। যে-দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা তাঁদের জীবনের সেরা দিনগুলি উৎসর্গ করেছিলেন, সে-দেশ তাঁদের কোনো পাত্তাই দেয় না—আর পুঁজি বা সম্পত্তির কোনো নোঙর ছাড়া, বান্ধববিহীন, যথাযোগ্য-স্তরে সংযোগবিহীন, অতীতের এই বীর-বীরাঙ্গনাদের কাছে সিকি শতাব্দীর এই স্বাধীনতা ছিল অপেক্ষার আর ভেসে বেড়াবার সময়—যে-সময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখেছে অতীত বিশ্বের অতীত মূল্য-বোধের পরিপূর্ণ ভাঙন আর বিলয়। তাঁদের প্রতি তাঁদের ছেলেপুলের শুধু অপরিসীম অবজ্ঞা আর উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাঁরা এমনই অপদার্থ যে দেশপ্রেমের উত্তেজনায় তাঁরা কিছুই গুছিয়ে নিতে পারেননি। তাঁদের সন্তান-সন্ততি অনেকেই ভিড় জমিয়েছে অপরাধজগতের নিচের মহলে। অবশিষ্টদের কেউ-কেউ, তাদের পিতামাতার মতোই, বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলোর বেড়াজালে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাও হয়তো কোনো আশার ইঙ্গিত নয়—বরং এ হয়তো অনেকটাই অভ্যাসের ভঙ্গি। একবার যদি আপনার জীবন থেকে আলো চলে যায়, আপনি যোগ দেন প্রতিবাদের আন্দোলনে : এটা সত্যি বলতে আস্থার কোনো প্রকাশ

নয়, কিংবা নয় স্পর্ধার ইঙ্গিত, বরং আপনি নিয়ে নিয়েছেন নিতান্তই সহজ পথটি—আর তাদের পিছনে গিয়ে ভিড় করেছেন, যারা, প্রলোভনের মতো, প্রতিবাদকে একটা বিশ্বাসযোগ্য গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে দেখাতে সফল হয়। জীবন বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই আপনি অবশ্য ভরাডুবি জাহাজের ইঁদুরের মতো হয়ে উঠবেন—আর যোগ দেবেন আপনার শ্রেণীশত্রুদের সঙ্গে।

বাংলাদেশের উপাখ্যান এল, গেল। তাৎক্ষণিক কয়েকটি সপ্তাহের জন্য এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে আবেগ নাড়া খেয়েছিল। পূর্ববঙ্গের নদীনালা, নৌকো আর মোটরলঞ্চ, রেলজংশন, আর ক্বচিৎ কদাচিৎ চোখে-পড়া অর্ধমনস্ক অর্ধনির্মিত রাজপথ, মফস্বল শহর আর তার স্কুলকলেজপার্ক—মাত্র কয়েকটা ছোট্ট মুহূর্তের জন্য পুরোনো স্মৃতি নড়ে উঠেছিল, প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল নিজের জন্মভূমি আর স্বদেশে, সাহস আর বীরত্বের সেই দিনগুলোয় ঘটেছিল এক পরজীবী পুনর্বাঁচন।

এমন চিকিৎসা বেশিদিন চলে না। চলেনি। এই বয়োবৃদ্ধরা সংগতিহীন ; তাঁদের কুঞ্চিত মুখে দারিদ্র্য আর হতাশার অপছাপ, এখন তাঁদের কোনোই স্থানাঙ্ক নেই। ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে বেরিয়ে-আসা যে-ভারতের স্বাধীনতা এ-সপ্তাহে সিকি শতাব্দী অতিক্রম করেছে বলে ধরে নেওয়া হল, সেই স্বাধীন ভারতবর্ষ তাঁদের কাছে এক অজ্ঞাত দেশ। কোনো ধ্বংসোন্মুখ বস্তিতে দোদুল্যমান ও জড়াজড়ি-করা কোন খুপরিতে, চারপাশে বৃষ্টির জল ঝরছে, ঝিম ধরে আছে জঞ্জাল আবর্জনা বিষ্ঠার দুর্গন্ধ, বাতাসে একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব, পুষ্টিহীন, অধিকাংশ ছেলেপুলেই বখে-যাওয়া, নড়বড়ে ক্যাঁচকেঁচে তক্তপোশে কুঁকড়ে বসে তাঁরা পড়েন উৎকট অদ্ভুত সব খবর। আমরা কেবল একটি উদাহরণ চোখে দেখি। এক ভদ্রলোক, যিনি ওই কিছুদিন আগেও মহীশূরের (কর্নাটকের) অর্থমন্ত্রী ছিলেন, দাবি করেছেন বিয়ারের উৎপাদন বাড়াবার জন্য এক ত্বরিত কর্মসূচি চাই, আর চাই এই বিয়ারের ওপর থেকে আবগারির মাশুল প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে আনা। বিয়ার—এই

ভদ্রলোক বলেছেন—জনসাধারণের পানীয়, আর এর উৎপাদন বাড়াবার জন্য এক্ষুনি সব ব্যবস্থা নেয়া চাই। কিংবা শুনুন আরেকটা খবরের টুকরো, গত মাসে বোম্বাই থেকে উৎপন্ন। এক কলেজের ছেলেমেয়েরা ধর্মঘট করেছে; ছেলেদের দাবি তাদের ড্রেনপাইপ পাৎলুন পরার অধিকার দিতে হবে, আর মেয়েরা পরতে চায় মিনিস্কার্ট, যত খাটো হয় তত ভালো। এইসব উত্তেজক খবরগুলো যখন পাপড়ি মেলে, পর্যটন ও নাগরিক বিমানদপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করে বসেন, রাজধানীর বিমানবন্দরকে উন্নত করে তোলার এক ফিউচারিস্ট প্রকল্পঃ ঝকঝকে আর ফিটফাট সব সুবিধে, গম্বুজের পর গম্বুজ, অ্যালুমিনিয়ামের চাঁদোয়া, একটার ওপর আরেকটা চাপানো ষড়্‌ভুজাকার সব স্বপ্ন, পরিশীলিত সর্বাধুনিক সব রেখার বিন্যাস—সব কিনা বাকমিনিস্টার ফুলারের হৃদয়ে আনন্দ জোগাবার জন্য, যিনি, বস্তুত, এর নির্মাণ তদারক করবেন।

নয়াদিল্লির আনুষ্ঠানিক মঞ্চে তাঁরা যখন অবতীর্ণ হবেন, কিঞ্চিৎ টলোমলো পায়ে, হৃদয়ে শঙ্কা আর কৌতূহলের মিশ্র অনুভূতি—কারু ইচ্ছে হতে পারে এইসব যুদ্ধজীর্ণ রাজনৈতিক কর্মীদের দু-একজনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিগেস করতেঃ দয়া করে বলুন না, এই কি সেই স্বাধীনতা, সেই সমাজতন্ত্র, যার স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন? এই কি সেই, এই কি সেই মুখশ্রী যা একদিন জলে ভাসিয়েছিল হাজার জাহাজ…

৩

এ-দেশ তাঁর অভাব বোধ করবে না

ফুলের কোনো সমারোহ ছিল না। বাঙালিরা দুর্গাপুজোর মহোৎসব নিয়ে শশব্যস্ত। পুজোর মধ্যেই একদিন শেষ রাতে নির্মলকুমার বসুর মৃত্যু হল—শান্ত, চুপচাপ, যেন কোনো গহ্য ব্যাপার। নির্মলকুমার বসু রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান তীব্র অপছন্দ করতেন। পণ্ডিতিয়ানা তাঁকে সশঙ্ক করে তুলত। কোনো অনুষ্ঠানের কথা উঠলেই তিনি সবেগে প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি ঘৃণা করতেন পদমর্যাদার হাঁফধরা আড়ষ্টতা—তা সে রাজনীতিকদের মধ্যেই হোক অথবা বিদগ্ধ মণ্ডলীর মধ্যেই হোক। কখনোই তিনি নিজেকে জাহির করতেন না—তাঁর পাণ্ডিত্য তিনি ধারণ করতেন অনায়াসে, সহজভাবে। এমন-কি মৃত্যুর পরেও তিনি খবরকাগজে ফলাও করে প্রচারিত হতে পারেননি। সভ্য মানুষ নামক দুর্লভ প্রজাতির অন্যতম নির্মলকুমার বসু দৃশ্যান্তরিত হলেন সন্তর্পণে, অগোচরে।

এদিকে, ভাঁড়েরা সি-আই-এ ও অন্যান্য অন্তঃসারশূন্য প্রসঙ্গে অনর্গল চিল্লাতে-চিল্লাতে মঞ্চে নেচে বেড়াচ্ছে। সংস্কৃতির সারমর্ম আর ভারতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ-বিন্যাস নিয়ে বড়ো-বড়ো বুলি ঝাড়ছে সন্দেহ-জনক যত নমুনা। মূল্যবোধ নির্ধারিত করে দিচ্ছে দিব্যদ্রষ্টার উর্দি-পরা ভণ্ডপণ্ডিতেরা। রূপোর রাশিই স্থির করে দিচ্ছে পাণ্ডিত্যের পরিমাণ। কিন্তু নির্মলকুমার বসু ছিলেন প্রকাণ্ড সভ্য মানুষ। এমন-কি তাঁর মৃত্যুর পরেও যখন শিক্ষাসংস্কৃতির জগতে তাঁকে নিয়ে খুব একটা উচ্চ-বাচ্য হল না, তখনই প্রতিফলিত হল গত পঁচিশ বছরে এ-দেশ বর্বরতার কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। খবরকাগজগুলো তাদের

বিবেক সাফ রাখার জন্য মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে দু-একটা ছোটোখাটো অনুচ্ছেদ সাজিয়েই খালাশ। রাজনীতিকেরা, বলাই বাহুল্য, থোড়াই পরোয়া করেন।

কী ছিলেন নির্মলকুমার? নৃতাত্ত্বিক? তা যদি হয়েও থাকেন, বিশুদ্ধ নৃতাত্ত্বিক ছিলেন কি? না কি ছিলেন তেমন-কিছু, যাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ্? কিন্তু যেহেতু তাঁর ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানগুলির পশ্চাৎপট, আর যেহেতু তিনি নরত্বারোপনির্ভর সমাজের অধ্যয়নেও অনবরত উৎসাহ দিতেন, ভৌত নৃতত্ত্ববিদ্রাও কি তাঁকে তাঁদেরই একজন বলে মনে করতে পারেন না? একবার তাঁর রচনাবলির পাতা ওলটান: দেখতে পাবেন তাঁকে সংকীর্ণ অর্থে নৃতত্ত্ববিদ্ বলাটা অর্থহীন মনে হচ্ছে। তাঁকে কি একজন সমাজতাত্ত্বিক বলে বর্ণনা করবেন না আপনি—অভিধাটির সবচেয়ে ব্যাপক, উদার ও বিশদ অর্থে? নির্মলকুমার বসু কোনোদিনই গতানুগতিক বাঁধাধরা ধ্যানধারণাকে মানেননি। সমাজ-তত্ত্বের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তিনি অনেকদূরে চলে গিয়েছিলেন: শিল্প আর ধর্ম, ভাস্কর্য আর সংগীতচিন্তা, দর্শন আর ভাষাবিদ্যা, কিংবা এমন-কি সাধারণ স্তরেও জনবিন্যাস বা নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্বন্ধে খবর রাখতেন তিনি, আলোচনা করতেন। তাঁর ছাত্ররা আসত কলা ও বিজ্ঞানের প্রায় ডজনখানেক ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগ থেকে। প্রত্যেকের জন্যই সময় দিতেন তিনি, তাদের সাফল্য ও কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করতেন; আর তাদের প্রত্যেকেই আবার সগর্বে স্বীকার করত এই উত্তরাধিকার।

কিন্তু গণ্ডিবদ্ধ সাম্প্রদায়িক বিদ্যাভিমানকে ঘৃণা করতেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অনায়াসেই তিনি চলে গিয়েছিলেন অ্যান্থ্রপলজিক্যাল সার্ভে অভ ইণ্ডিয়ায়—যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁরই সৃষ্টি, যাকে তিনি সযত্নে ও সপ্রেমে লালন করেছেন। মানুষকে ভালো না-বাসলে নৃতত্ত্বের কোনো সমীক্ষা বা অনুসন্ধানই চলে না। মানুষ সম্বন্ধে নির্মলকুমারের আগ্রহ ছিল। মানুষ—সে কেবল কোনো সংগ্রহশালা বা শারীরতত্ত্বের নিদর্শন মাত্রই নয়; সেই মানুষ সজীব—সে চিন্তাভাবনা ও আবেগ-অনুভূতির আধার

ও প্রকাশক—সেই মানুষ, যে সংরাগে উদ্দীপ্ত হয়, শোকে অভিভূত। কিন্তু সর্বগ্রাহী চিন্তা তাঁকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছিল মানুষের ইতিহাসের ধারা খতিয়ে দেখতে—যে-মানুষ পার্থিব, এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের বলি। বস্তুত তিনি নিজেই ছিলেন এক বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন: গান্ধির ঘনিষ্ঠ শিষ্য, কিন্তু তুচ্ছ ও সাধারণ মর্তমানবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে যাঁর আটকাত না; ছিলেন কংগ্রেসী, অথচ মার্ক্সবাদীদের তিনি অচ্ছুৎ বলে মনে করতেন না। সংস্কৃতির নৃতত্ত্বে আগ্রহী এই ব্যক্তি জানতেন উপজাতি, গিরিজন বা অন্ত্যজদের জাত-পাতের সব তত্ত্ব ও তথ্য, কিন্তু তার মধ্যে ছিল দৃষ্টির সেই সমগ্রতা যা মেনে নিতে পারত যে জাতিভেদ-তত্ত্বকে অনেক সময়েই অর্থ-নৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কর্মজীবনে এককালে তিনি সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তপশীলী জাতি-উপজাতির কমিশনার হিসেবে কাজ করার জন্য। কিন্তু দলের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও, তাঁকে এই সত্যটি উচ্চারণ করা থেকে ব্যাহত করা যায়নি যে এইসব জাতি-উপজাতির প্রতি দয়াদাক্ষিণ্যের ভেক ধরে সরকারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের বড় শত্রু হয়ে উঠেছে, কিংবা এইসব তপশীলী জাতি-উপজাতির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যায়াম কোনো-কোনো আত্মোন্নয়ন-কারী পেশাদার সুযোগসন্ধানীর দফতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মলকুমার বসু বেশিদিন সরকারী কাজ করতে পারেননি, কিন্তু সেটা সরকারেরই কলঙ্কচিহ্ন, তাঁর নয়।

এই আশ্চর্য মানুষটির আগ্রহের বিশালতা ও বৈচিত্র্য আমাদের অভিভূত করে। মনুর সংহিতা আর অনুশাসন খুঁটিয়ে দেখায় তাঁর আগ্রহ ছিল; উড়িষ্যার মন্দিরের নয়নাভিরাম সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে তিনি মগ্ন ছিলেন; নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপজাতিদের ব্যবহাররীতি তাঁকে ততটাই অধিকার করে বসেছিল যতটা করেছিল বিহারের মুণ্ডা রমণীদের নৃত্যছন্দ। কখনো তাঁর সমীক্ষার প্রতিবেদন হত না ছাঁচে-ফেলা অথবা তাতে থাকত না কোনো গৎবাঁধা পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত। অহিংসার নীতি তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল, কিন্তু কলকাতার বিশাল মেট্রোপলিসের

দুঃসহ ও নিষ্পেষক দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য আর সামাজিক সংগঠনগুলির ভাঙচুর তাঁকে সেইজন্য অহরহ কম খোঁচায়নি ; বুভুক্ষু মানুষ যে হত্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, এটা তাঁর কাছে মনোবিকার বলে মনে হয়নি। হিন্দু সংস্কৃতির মূল ধারকগুলোয় তাঁর আস্থা ছিল, তৎসত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার করতে তাঁর বাধত না যে আমাদের বিজ্ঞানচর্চার নিজস্ব কোনো ঐতিহ্য নেই, আর তাই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাসতত্ত্ব থেকে আমাদের অনেককিছুই গ্রহণ করতে হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে আমাদের সমস্ত দায় ও সমস্ত অঙ্গীকার হল মানবজাতির মুক্তি। কিন্তু এই উৎকাঙ্ক্ষায় গোঁড়ামির কোনো চিহ্ন ছিল না ; মানুষের মুক্তি নির্মলকুমার তক্ষুনি স্বীকার করে নিতেন—এ-কথার ব্যাখ্যা হতে পারে অনেক রকম—আর বহুবিচিত্র পথেই সেই মুক্তিকে তরান্বিত করা সম্ভব।

বছর দুই আগে, তাঁর সত্তর বছরের জন্মদিনে, তাঁর কয়েকজন গুণমুগ্ধ একসঙ্গে মিলে তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিন উদ্‌যাপনের জন্য কলকাতার সাংস্কৃতিক আলেখ্য বিষয়ে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। শ্রীসুরজিৎ সিংহ সযত্নে এই আলোচনাচক্রের সব প্রবন্ধ ও বিচার-বিবেচনাকে একটি বিশিষ্ট পুস্তকে সংগ্রথিত করেছেন ('কালচারাল প্রোফাইল অভ ক্যালকাটা', ইণ্ডিয়ান অ্যান্‌থ্রপলজিক্যাল সোসাইটি)। যাঁরা নির্মলকুমার বসুর গুণমুগ্ধ, যাঁরা তাঁকে ভালোবাসতেন, তিনি স্বয়ং যাঁদের ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন, তাঁরাই দেখতে পাবেন নির্মলকুমারের অনেক ধারণা ও বিবেচনা এই গ্রন্থে কেমন সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল বৈচিত্র্যে ; তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষাগুলোয় দেখা যেত এক অস্থির তাড়নার প্রকাশ : একত্ববাদের শৃঙ্খল ভেঙে ব্যাপক ও বিস্তৃত বহুত্ববাদের স্বাগত সম্ভাষণ। এই বইতেও তেমনি অন্য অনেকের সঙ্গেই আবিষ্কার করা যায় মৃণাল সেন ও মহিম রুদ্রকে—যাঁরা লিখেছেন কলকাতার শিল্পী, ভাস্কর, চলচ্চিত্রনির্মাতা, সংগীতজ্ঞ ও নৃত্যবিদদের সৃষ্টিশীলতা আর হতাশা ও বাধাবিপত্তি বিষয়ে। পেশাদার নৃতাত্ত্বিকেরা আলোচনা করছেন কলকাতার উপভাষাগুলির সংঘর্ষ ও ভাষাতাত্ত্বিক

বৈচিত্র্য সম্বন্ধে : অন্যরা আলোচনা করেছেন কলকাতার বিশাল সামাজিক পটে আন্তর্সম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি বিষয়ে। সম্পাদকের রচিত একটি প্রবন্ধ ছিল কালীমন্দির সম্বন্ধে, যেটা সন্দেহ নেই নির্মলকুমার নিজেই বিস্তর তারিফ করতেন। আরো অনেকের আলোচনার বিষয়ঃ কলকাতার আলোকপ্রাপ্তরা, কলকাতার গুণ্ডা ও মস্তান, কলকাতার পাগল, কলকাতার বিজ্ঞানী, কলকাতার পরগাছা অর্থাৎ সদাগরি আপিসের বড়ো চাকুরেরা। কলকাতার আড্ডার এক চিরচেনা প্রতিবেদন আছে— যে-সম্বন্ধে নির্মলকুমারের ছিল উজ্জ্বল ও অন্তহীন অনুরক্তি। আর আছে কলকাতার সমস্যাগুলোর পরিচায়ক। আর সর্বোপরি, এই বইতে আছে, স্বয়ং নির্মলকুমারের বিদায়ী অভিভাষণ—তাঁর মূল্যবোধের যা অপরিহার্য সারাংশ, তাঁর বিনতির ও সৌজন্যের, সেইসঙ্গে আবার তাঁর যথাযথ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে এখানে, জ্ঞানের চর্চায় তাঁর গৌরব-বোধ আর জ্ঞানীগুণীদের পরবর্তী প্রজন্মদের উদ্দেশে তাঁর আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা।

তাঁর অভাব এ-দেশ বোধ করবে না; রাজনীতিকেরা মুখ বাঁকিয়ে তাঁর মৃত্যুকে বর্ণনা করবেন এই বলে যে 'যাক, বাঁচা গেল'; তিনি তো, বস্তুত, বহু ভণ্ডামিরই সাক্ষী ছিলেন। কোনো মহান মানুষ কিন্তু মহান মানুষই, তিনি তা-ই থেকে যান চিরকাল, কোনো ফলক না বসালেও তা-ই থাকেন। ভারত যদি এখনো টলোমলোভাবে একটু একটু করে এগোয়, তবে সে রাজনীতিকরা সত্ত্বেও, তাদের ছাড়াই, শুধু নির্মলকুমার বসুর মতো মানুষদের জন্য, যারা ছোটো ছোটো এক একটি দ্বীপের মতো, নিজেদের মধ্যে লালন করেছেন সেই সংস্কৃতিকে যা এখনও ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মোটা খদ্দরের কুর্তা আর ধুতি পরনে, পায়ে বেমানান টেনিস জুতো—ভ্রমণপিয়াসী সদাচঞ্চল এই মানুষটিকে আর আশপাশে দেখা যাবে না, কিন্তু যে ভাগ্যবান দীনাতিদীনদের সঙ্গে তাঁর চেনা হয়েছিল, তারা সযত্নে, সাবধানে তাঁর বিপুল স্নেহের স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকবে।

৪
একটি চেনা মেয়ে

পূর্ববঙ্গে একটি গ্রামে তার ছেলেবেলার কথা তার ভালো মনে পড়ে না। ঢাকা ফরিদপুর অথবা মন আনচান করা নামের সেই বাখরগঞ্জ এর মধ্যে কোথাও ছিল সেই গ্রাম, ঠিক কোথায় তা আমাদের নাই বা জানা থাকল। তাদের পরিবার ছিল যে-কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের মতোই—ভাগচাষী দিয়ে চাষ করান কয়েক বিঘা ধানী জমি, মাছ ভর্তি দু-একটি পুকুর, আম ও কাঁঠালগাছ ঠাসা বাগান; বাবার বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ায় মন নেই, বাড়িতে নানাধরনের কয়েকজন কাকা, দু-একজন মুখরা পিসি, মা বেশির ভাগ সময়ই হয় রান্নাঘরে, নয় আঁতুড়ে, ভাইদের কারো সময় ঘুড়ি ওড়ানোতে কাটে, ওরই মধ্যে আবার একজন কি দুজন লেখাপড়ায় খুব ভালো। এইরকম বেশ কয়েক হাজার পরিবার যে-দুনিয়াকে চিনত, তার অবসান হল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে। এখানে স্মৃতি কিছুটা অস্বচ্ছ, হয়তো তার কারণ, মনে করা মানেই সেই শারীরিক ও মানসিক কষ্টের পুনরাবৃত্তি। পালিয়ে আসার সেই আতঙ্কিত সিদ্ধান্ত, সামান্য বিষয়সম্পত্তি সব পিছনে ফেলে আসা, তারপর কলকাতায় পৌঁছে নিকট বা দূর আত্মীয়দের অনিচ্ছুক দাক্ষিণ্য, ছোটোখাটো আমলাদের করুণাভিক্ষার গর্ব, যার শেষ ধরা যাক গড়িয়া অঞ্চলের কোনো-এক কলোনিতে। বাবা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম কিনা, তা নিয়ে সব সময়েই কিছুটা সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ আর রইল না। মা-র সামান্য গয়নাগাঁটি দ্রুত অদৃশ্য হতে লাগল, অবশেষে ধনাত্মক ঋণাত্মকে রূপান্তর নিল। ভাইদের কেউ বখে গেল, কপাল ভালো থাকলে রাজনীতির ছোঁয়া লেগে ব্যর্থতাবোধ থেকে কারো আংশিক উত্তরণ হল। লেখাপড়ায় যারা ভাল ছিল,

অভাবের জন্য তাদেরও পড়া শেষ হল না। এখন সদাগরি অফিসে কেরানি, একজন বুঝি মহাকরণে বেয়ারাগিরি করছে। যার কপাল সবচেয়ে ভালো ছিল কোনো আত্মীয়ের সাহায্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিতে পেরেছিল সে, তারপর আবার কলোনির সোয়া দুইখানা ঘরের চৌহদ্দিতেই ফিরে এসেছে, গত বছর তাকে ছাঁটাই করা হয়।

কিন্তু বোনটির কথাই বলতে চাইছিলাম। তার বড় হওয়াটা যেন ভোজবাজির ব্যাপার। ঐ কঠিন রুক্ষ বছরগুলিতে তার দিকে কেউ কোনো নজর দেয়নি। যতদূর স্মৃতি যায়, বরাবরই সে নিজেকে দেখতে পায় ঘরের কাজে অভ্যস্ত, একটা ছেঁড়া, বিবর্ণ জামা পরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তার কপালে কখনও দুধ জোটেনি, মাছ হয়তো সপ্তাহে একবার, তাও নামে মাত্র, যখন পরিবারের মাথার ওপর দিয়ে একের পর এক ঝড় বয়ে চলেছে, তখন বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে অনাদৃত ছিল সে। অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর আর সবকিছুই দাঁড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই ; ভালবাসা, স্নেহ, মমতা সবই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মুখাপেক্ষী। পরিবারের সবচেয়ে ছোট হলেও তার জন্য ভাবার সময় কারো ছিল না। মধ্যবিত্ত জীবনের লোকদেখান ব্যাপারগুলো সরিয়ে নিলে এইসব পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের পদ্ধতি খুবই আনাড়ি, ভয়াবহ রকমের আনাড়ি। অন্তর্নিহিত কোনো স্তরে হয়তো অনুভূতিগুলো থেকে যায়, কিন্তু তার কোনো প্রকাশ হয় না, প্রকাশ করাটা অসামাজিক বলে গণ্য। কাজেই বোনটি বড় হয়ে উঠল স্নেহ মমতা বা ভবিষ্যতের কোনো আশ্বাস ছাড়াই। কলোনির লাগাও একটি মেয়েস্কুলে সে যাচ্ছিল, নানারকমের ব্যাঘাত, বইয়ের অভাব, ঠিকমত পরিচালনার অভাব, বাড়িতে পড়বার সময়ের অভাব এই সবকিছু সত্ত্বেও সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করল এবং কী আশ্চর্য, খুব ভালভাবে পাস করল। এরপর দু-বছর তিন মাইল দূরের এক মেয়ে কলেজে আর্টসে ইন্টারমিডিয়েট পড়া—খুবই কষ্টকর দুটো বছর, কারণ এর মধ্যে ওদের বাবা মারা গেলেন ; ভাইদের একজন কমুনিস্ট পার্টির এক যুবসংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাকে নিয়ে গেল জেলে, মায়ের গয়নার অবশিষ্টগুলি অদৃশ্য হল, টাকাপয়সার অভাবের

সঙ্গে তাল রেখে চলল উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, ধার করার রাস্তা বন্ধ, কারণ যে-প্রতিবেশীদের কাছে ধার মিলত তারাও সমান গরিব, আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছাড়া তাদের পক্ষেও ধার দেওয়া অসম্ভব। তবু এবারেও মেয়েটা ফার্স্ট ডিভিসনে গেল। কলেজের প্রিন্সিপালের মনটা ভাল, তিনি সকালে করার মত কয়েকটি টিউশনি ধরিয়ে দিলেন, তাতে গোটা পঞ্চাশ টাকা আসতে লাগল। বি. এ. পাস করা পর্যন্ত এই সময়টাই ছিল সবচেয়ে শক্ত। আরেক ভাই পুলিশের গুলিতে মারা গেল, মা ইতিমধ্যে স্থায়ীভাবে বাতে ভুগছেন, সামান্য যেটুকু রান্নাবান্না সেটাও তাঁর পক্ষে আর সামলান সম্ভব নয়। ভাড়া করা বাসায় সম্পূর্ণ প্রকাশ্য জীবন যাপন করতে একটা মেয়ের যা-যা অসুবিধা হবার কথা, সবই ভিড় করে আসে। কিন্তু এবারও সে পাস করে। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরের ভাইটি বাড়িতে কিছু টাকা পাঠাতে পারছে, কিন্তু সেটা অবান্তর। দায়িত্বের বোঝা একবার যে কাঁধে নিয়েছে, বরাবরের মত তাকেই আটকে যেতে হয়। কোনো প্রশ্নই ওঠেনি, মা শুদ্ধ সবাই ধরেই নিয়েছে যে বাড়তি যত টাকার প্রয়োজন, তা ঐ মেয়েই উদ্যোগী হয়ে জোগাড় করবে। খানিকটা টাইপিং জানলে নিম্নস্তরের কেরানির কাজের জন্য সে হয়ত চেষ্টা করতে পারত। টাইপ করতে সে জানে না, তাছাড়া পড়ানর চাকরিতেই তার বেশি আগ্রহ। কিন্তু স্কুলের চাকরির জন্য ট্রেনিং থাকা চাই। কাজেই সে আরো কয়েকটা টিউশনি জুটিয়ে নিল, বাড়ির রান্না তাড়াহুড়ো করে সেরে দিনে ক্লাস করে বাড়ি ফেরার পথেও আরেকটা টিউশন করতে লাগল। এতে অবশ্যই সুফলই ফলেছে। বি. টি. ডিগ্রি থাকায় সে এবার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে একটা চাকরি পেয়েছে। অর্থাৎ সবশুদ্ধ তার পরিবারের আয় বেড়েছে আরো দুশো পঞ্চাশ টাকা।

দুঃখের বিষয় স্কুলটা শহরের উত্তর প্রান্তে, দমদমে। কিন্তু কাঙালের আবার বাছাবাছি কিসের? মেয়েটি সকালে সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ওঠে। এক ভাই কাজে বেরোয় সোয়া ছটায়, কাজেই রান্নার পাট যেটুকুই থাক, তা ছটার মধ্যে শেষ হওয়া চাই। মা আর অন্য ভাইদের চা জলখাবার দিয়ে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হওয়া, ন-টার

মধ্যে দু-জায়গার টিউশনি সারতে হবে। কপাল ভাল যে দুটোই পাড়ার ভিতরে; কাজেই কোনোরকমে হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সে ভাত খেয়ে নেয়, মায়ের সব গোছগাছ করে রাখে, তারপর নিঃশব্দ পটুতায় হাত চালিয়ে অধিকাংশ বাসনমাজা সারে। এক দৌড়ে বাসস্টপ। বাসে উঠে একটা সীটে বসে থেকে এই প্রথম একটু হাঁফ ছাড়ার সময় পায় সে। শেয়ালদায় বাস বদলানো; এবারে ভিড় অনেক বেশি, প্রায়ই অর্ধেক রাস্তা দাঁড়িয়ে যেতে হয়। বাড়ি ছাড়ার পর প্রথম আধঘণ্টায় যেটুকু উদ্যম ফিরে এসেছিল, গরম ও ঠেলাঠেলিতে তা শুকিয়ে যায়। স্কুলে পৌঁছতে এগারোটা বেজে যায়, মানে পনেরো মিনিট লেট। অবশ্য হেডমিসট্রেস সবই বোঝেন, তাই প্রার্থনার সময়ে ওকে রেহাই দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর থেকে চলে নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। দুপুরের মাঝামাঝি আধঘণ্টার ছুটি বাদ দিলে চীৎকারের পালা সারাক্ষণ চালাতে হয়। তাছাড়া জনাত্রিশেক দশ না-পেরনো বাচ্চাকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে সামলানোটাই একটা ক্লান্তিকর কাজ। এতটা সময়ের মধ্যে তার খাবার জোটে হয়তো শুধু বাড়ি থেকে আনা একটা কলা, আর এক কাপ জলো চা। সাড়ে চারটের সময় আবার ঠেলাঠেলি করে বাস ধরে শেয়ালদা; এখানে তার দিনের তৃতীয় টিউশনি। কোনোদিন হয়তো ছাত্রীর মা চা আর অল্পকিছু জলখাবার দেন, কিন্তু সব দিন নয়। এইবার সন্ধ্যা নামছে; শেয়ালদা থেকে তরকারি ও অন্য দু-একটা টুকিটাকি কেনে সে। তারপর ক্লান্তি ধুলো ঘামে মাখামাখি হয়ে গড়িয়ার বাস ধরে। বাড়ি; হাত মুখ একটু ধুয়ে সকালের অসমাপ্ত কাজগুলো হাতে নিতে হয়। মাকে খাওয়ানো ভাইদের জন্য রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকা, পরদিন ক্লাসে পড়ানর রুটিন তৈরি করা, বছরের প্রতি সন্ধ্যায় হিসাব মেলানোর মর্মান্তিক অসম্ভব চেষ্টা, শেলাই-এর কাজ, গ্রীষ্মের ভোঁতা গুমোট গরম কিংবা শীতকালে উত্তুরে বাতাসের কাঁপুনি, অনেক রাত্রে নাম-কা-ওয়াস্তে খাওয়া, ঘুম, সর্বদুঃখহর ঘুম—যদি আসে; তারপর আবার আরেক দিন, হতাশার সঙ্গে আবার নতুন করে একক সংলাপ।

না, দিনের পর দিন এই প্রসঙ্গের কোনো ব্যতিক্রম হয় না। মেয়েটার আশা করার কিছু নেই, প্রতিবেশী বা সহকর্মীর কাছ থেকে কতটুকু ধার পাওয়া যেতে পারে সেই তাৎক্ষণিক অঙ্ক ছাড়া পরিকল্পনা করারও কিছু নেই। এভাবে সপ্তাহ কাটে, তারপরের সপ্তাহ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়িয়ে যায়। কাব্য বা সংগীতের স্থান তার জীবনে নেই। ভাইয়েরা বিকেলে বেরিয়ে যায়, সে তার মায়ের সঙ্গে বাড়িতেই থাকে। সিনেমা হয়তো সে শেষ দেখেছে বছর দেড়েক আগে। ভাইরা ময়দানে মিটিংএ যায়, মিছিলে যোগ দেয়; এই শ্লোগানের উৎসবের সঙ্গেও ওর সংযোগ পরোক্ষ। কয়েক মাস আগে সে একবার অন্য স্কুলশিক্ষকদের সঙ্গে রাজভবনের বাইরে অবস্থানে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু এ-রকম রোমাঞ্চকর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার জীবনে খুবই বিরল। ভাইয়েরা হয়ত ক্বচিৎ কখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চৌরঙ্গি বা বালিগঞ্জের রেস্তোরাঁয় পয়সা ওড়ায়। হয়তো সে পয়সা আসলে ঐ বোনেরই, কারণ পরিবারের প্রধান রোজগেরে লোক সে, আর পুরো মাইনেটাই সে সযত্নে মায়ের হাতে তুলে দেয়। কেউ জানতে চায় না তার ক-টা শাড়ি আছে, তার সাজগোজ বলতে একটা সস্তা মাথার তেল, ততোধিক সস্তা ফেস-ক্রীমের কৌটো, আর একটিন নামগোত্রহীন ট্যালকম পাউডার। তার শারীরিক মানচিত্র ঢাকপেটানর মত নয়, উনআশি পাউণ্ড, রক্তকণিকায় হেমোগ্লোবিনের অংশ শতকরা একাত্তর ভাগ মাত্র, প্লুরার প্রদাহ তার নিত্যসঙ্গী। বিয়ের প্রসঙ্গ অবান্তর; কলোনিতে রোমান্সের প্রথম ব্যাকুলতা সচরাচর মরতে দেরি করে না, তাছাড়া সে ধরনের চাপল্যের জন্যও দরকার একটু সুস্বাস্থ্যের আভা। না, এই বাঙালি মেয়ে কারো ঈপ্সিতা নয়। কোনই আশা নেই তার, আর ক-বছরের মধ্যেই সে পাকাপাকিভাবে আইবুড়োত্ব লাভ করবে, একটি নামহীন কবিতা ঠিক তেমনি সন্তর্পণে শুকিয়ে ঝরে যাবে, যেমনভাবে তা টিঁকে আছে। না কি নামে মাত্রই টিঁকে আছে?

এই তো গতমাসে, যখন বর্ষা এল, প্রায় ন-দিন ধরে কলোনির জল সরল না; জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যেটুকুও বা ছিল সব টৈটম্বুর, বস্তির

ঘরে মেঝের ওপর দু-আড়াই ফুট জল দাঁড়িয়ে গেল। মাকে তখন সরান গিয়েছিল কোনো সহানুভূতিশীল আত্মীয়ের বাড়িতে, কাপড়চোপড় ভরা একটা আস্ত ট্রাঙ্ক বরবাদ। এক ভাইয়ের হল নিউমোনিয়া; ওর নিজেরও বেশ জ্বর চলছিল; তবু রান্না করতে হবে। টাকা জোগাড় করতে হবে; জিনিসপত্রের দাম এমনিতেই যথেষ্ট। জল সরার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে যেন আগুন লাগল; চালের দর আগের মাসেও যা ছিল তার চাইতে অনেক বেড়ে গেল, ঐ ভাইটির পথ্যের জন্য একটু মাছ একান্ত দরকার; যে-হিসাব মিলতে চায় না, যে-হিসাব মেলানো অসাধ্য তার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা।

এই মেয়েটার দিকে তাকান। এ-রকম যে-কোনো একজন মেয়ের দিকে তাকান, কারণ এরা হাজারে-হাজারে রয়েছে। দয়া করে তাৎক্ষণিক চোখের জলও ফেলবেন না। ওর অস্তিত্বের এবং অপমৃত্যুর এই যে ট্র্যাজেডি, এতে কি কারো কিছু যায় আসে? যখন আমূল সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়, তখন এর শীর্ণ অস্তিত্বের অঙ্ক আমাদের হিসাবনিকাশের মধ্যে আমরা ধরি কি? ওর ছেলেবেলার কথা ও মনে করতে পারে না; অতীতের মোহে মুগ্ধ ওর মা যখন ঢাকা, ফরিদপুর বা বাখরগঞ্জে ওর ঠাকুরদার সাড়ে এগারটি মৌজার জমিদারি নিয়ে হাহুতাশ করেন, তখন সৌভাগ্যবশত ওর কিছুই মনে হয় না। কেউ যদি তাকে কেবল নৈতিক সমর্থনও জানাত, সে হয়ত আজও মধ্যবিত্ত জীবনের আধা-ভদ্র পরিবেশের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারত। একদিন হয়তো বর্তমান সমাজের ভিত্তি পর্যন্ত উপড়ে আসবে, কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করে থাকতে বলা নির্দয়তা মাত্র। বরঞ্চ তার বেরিয়ে আসাটাই সমাজ পরিবর্তনের সপক্ষে একটা বড় আঘাত হতে পারত। যারা সবুরে মেওয়া ফলার কথা বলে তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন, তাদের প্রাপ্য ধিক্কার। ওর মত মেয়েদের জন্য এখনই কিছু করা দরকার। ওদের ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এগুলোও হয়ত তাৎক্ষণিক আবেগ ছাড়া কিছুই নয়। আমরা কি ওর মায়ের প্রতি কটূক্তি করব, ভাইদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করব? ধরে নেওয়া যাক, অনিচ্ছায় হলেও মেয়েটাকে ওরা মুক্তি দিল। তাকে

তার নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করে নিতে দিল, ওরা তখন কি করবে? কিভাবে চালাবে? এর উত্তর কি আমাদের হাতে আছে? কিন্তু অন্যদিকে, ওই মেয়ের দিকে তাকানর মুখই কি আমাদের আছে?

৫

মাদার কারেজ

'মাদার কারেজের গান' বোঝার জন্য বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌কে টেনে আনার কোনো দরকার নেই। বুকের পাটা কাকে বলে যদি দেখতে চান, এই চৌহদ্দির মধ্যেও এখনও তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। বিবিধ আশাভঙ্গ সত্ত্বেও প্রায় রোজই এখানে ওখানে দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সাহসের ছোটখাটো দ্বীপ গজিয়ে ওঠে। যদি একটা সকাল বা বিকাল ফাঁকা পাওয়া যায়, শহরতলি থেকে একটু ঘুরে এলে মন্দ লাগবে না, এই সেদিনও যা পূর্ব পাকিস্তান বলে পরিচিত ছিল, সেখান থেকে আসা শরণার্থীদের ভিড়ে ভর্তি শহরতলির ক্যাম্প ও কলোনিগুলি। দারিদ্র্য সীমার নিম্নবর্তী এই দুনিয়া গত পঁচিশ বছরে বেড়েছে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। কারণ যাই হোক, এদের গল্প সনাতন ব্যর্থতার গল্প, পাঞ্জাবে যা ঘটেছে তার উল্টোপিঠের দেখা মিলবে এখানে। এইসব কলোনি আর হতদরিদ্র বসতিগুলি আজও খুব নিচুস্তরের এক ধরনের সৃজনশীলতার উদাহরণ; যে-রকম সৃজনশীলতা পাওয়া যায় স্থাবর সহিষ্ণুতা, আর দৈন্য এবং নোংরামি থেকে জাত হতাশার মধ্যে। জীবন এখানে আদিম ও রুক্ষ; দৈনিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর। এখানে বাস করছে এমন একদল লোক যারা সীমান্তের ওধারে তাদের সবকিছু ফেলে এসে পঁচিশ বছরের ইতস্তত পরিভ্রমণেও আর নতুন করে কোথাও শিকড় গাড়তে পারেনি। উল্টে তাদের বিরুদ্ধে নালিশের বোঝা জমছে, যে তারা পশ্চিমবঙ্গের সংকটাপন্ন অর্থনীতিকে আরো নিচে টেনে নামাচ্ছে। কোথাও-কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে কৃতকার্যতার উদাহরণ। উদ্বাস্তু-শিবিরের একটি ছেলে আচমকা পরীক্ষায় দারুণ ভাল করে, আর্থিক-

সাহায্য ও বৃত্তি পেয়ে, ভাল চাকরি বা প্রশাসনিক কাজের ভার নিয়ে সে তার বাপ-মা ভাইবোনের সঙ্গে ক্যাম্প থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। একটি মেয়ে হঠাৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক দক্ষতার প্রমাণ দেয়, কিংবা কোনো চিত্রপরিচালক তাকে আবিষ্কার করার ফলে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে সেও তার পরিবারবর্গ নিয়ে কলোনি ছেড়ে গেছে। কিন্তু এক বিরাট অংশেরই কাহিনীটা নির্জলা দারিদ্র্যের। সরকারি খয়রাতি বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কোনোটাই কোনো অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। দারিদ্র্যের ওপর পুঞ্জীভূত হয়েছে দারিদ্র্য; বেকারি ও মূলধনের অভাব একটা অন্যটাকে জোরদার করেছে। বস্তিতে থাকতে থাকতে বস্তিসুলভ মানসিকতা বেড়ে উঠেছে। জীবনধারণের সুউপায় না-থাকার ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয় ক্রমশ প্রকট। আশ্চর্য হবার কী আছে, যদি কলকাতার অপরাধজগতের বাড়-বাড়ন্ত হয়ে থাকে এইসব কলোনি থেকে প্রচুর পরিমাণে আনকোরা শিক্ষানবিশ পেয়ে। উদ্বাস্তু কলোনির ছেলেদের কাছে স্কুলের অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী; তারপর অচিরেই ওয়াগানব্রেকিং, ছুরি চালান, পেটো ছোঁড়া এবং ছিনতাইয়ে হাতেখড়ি। যখন সুদিন ছিল, তখন তাদের মুখে মাওবাদী শ্লোগান শোনা গেছে; হয়তো তার কারণ, তাদের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একধরনের নকশাল কর্মধারার আপাত সাদৃশ্য। আইনশৃঙ্খলার রক্ষকদের প্রলোভন কিংবা শাসানিতে প্রথম তারাই ভুলেছিল, এবং দলে দলে যোগ দিয়েছিল তথাকথিত নগররক্ষীবাহিনীতে, যে-বাহিনীকে পোষাই হয়েছিল কলকাতা ও তার আশেপাশে বামপন্থী রাজনীতির জোয়ার ঠেকানোর জন্য। আবার এই রাজ্যে কংগ্রেস পার্টির পুনরুজ্জীবনের যারা ধ্বজাবাহক, সেই লুম্পেন গোষ্ঠীগুলির সবচাইতে কট্টর অংশ এসেছে এইসব উদ্বাস্তু কলোনি আর বসতি থেকেই; এরা সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত, খালিপেটে নৈতিকতা বেমানানও বটে। নগদের আশায় এরা যে-কোন নিশান বইতে, যে-কোন মাথা ফাটাতে, যে-কোন ধর্মঘট ভাঙতে রাজি। টাকার ঝনৎকার এদের মনে অভাবনীয় উন্মাদনা জাগাতে পারে।

বংশাবলির খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এইসব তরুণদের অনেকেই

এসেছে তেমন পরিবার থেকে, যারা একসময়ে পূর্ববঙ্গের ভূস্বামীশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। অর্থাৎ এরা একটি উচ্চবর্ণীয় ডাকাতগোষ্ঠীর বংশধর। তিরিশ বছরেরও কম সময়ে ভূম্যধিকারীর উদ্ধত আভিজাত্য সমাজের নিম্নতম গাদে পরিণত হয়েছে। প্রক্রিয়াটা ধীরে-ধীরে ঘটেছে, কিন্তু ঘটেছে অমোঘভাবে। বছরের পর বছর। একটু-একটু করে সঞ্চয় এবং আয় কমেছে ; একটু একটু করে জীবনযাত্রার মান ক্ষয় পেয়েছে, দারিদ্র্য আরো ঘনিষ্ঠ বাস্তবে পরিণত ; বংশানুক্রমিক প্রথাগুলি দিনযাপনের প্রয়োজনে লোপ পেয়ে গেছে। সঞ্চয়ের সামান্য অংশই সীমান্তের ওপার থেকে আনা গিয়েছিল ; মূলধন ভাঙিয়ে খাওয়ার সুযোগই ছিল কম। পড়ে-পাওয়া জমিদারি ছাড়া কোনো বিকল্প পেশাতেও কারও দক্ষতা ছিল না। অন্য জীবিকা অলভ্য ; কাজেই কিছুদিন বাদে ছেলেরা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হল, মেয়েরা খানিকটা মাথা ঠিক রেখেছিল, তারা তবু এটা-সেটা করে মাসের শেষে খানিকটা বাড়তি টাকা বাড়িতে আনতে পারে। আজ এটা প্রায় একটা ছকে-বাঁধা গল্প, আক্ষরিক অর্থে ই হাজার-হাজার পরিবারের ক্ষেত্রে যা সত্য।

দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটাকে মহত্ত্বের গাথা হিসাবে দেখান যায়—বিনামেঘে বজ্রপাত হয়ে যাওয়ার পরে একটা জাতি কীরকম সাহসিকতার সঙ্গে অদৃষ্টবিপর্যয়ের মোকাবিলা করেছে ; মিথ্যা আত্মসম্মানবোধ শিকেয় তুলে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের সন্তানসন্ততি পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থার ভুয়োদর্শনজাত সিদ্ধান্তগুলিকে কীভাবে মেনে নিল। আবার এই পুরো ঘটনাকে অমোঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ বলেও বর্ণনা করা যায় ; সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ বংশধরদের ওপর ইতিহাসই প্রতিশোধ নেয় ; তাদের রক্তচোষা পূর্বপুরুষদের দোষক্রটির প্রতিফলই তাদের আজকের দুর্দশা।

তবু, দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক-না কেন, এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের পাশাপাশি যে অসামান্য সাহস অনেক সময় দেখা যায়, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। উদ্বাস্তু কলোনির অধিবাসী সত্তর-আশি বছর বয়সের একজন বৃদ্ধাকে ধরুন। গত দু-কুড়ি বছর ধরে

তাঁর বিস্ময়বিমূঢ় চোখের ওপর ইতিহাস দ্রুতগতিতে অভিনীত হয়েছে। ত্রিশের দশকের শেষে বা চল্লিশের দশকের প্রথমে তিনি হয়ত ছিলেন কোন ভূস্বামীর সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী, ময়মনসিংহ, ঢাকা বা বরিশালে দশ-বিশটি মৌজা জুড়ে যাঁর জমিদারি ছিল। জীবন ছিল নিস্তরঙ্গ এবং মহিমান্বিত, টাকা আসত অনায়াসে নিয়মিতভাবে; বছর ভরে দোলদুর্গোৎসবের পালা চলত। গৃহদেবতা পারিবারিক গয়নাগাঁটির পাশাপাশি চারদিকে এক অমোঘ আভা বিকিরণ করতেন। পাইক-বরকন্দাজ এবং প্রভাবশালী বন্ধুর অভাব ছিল না। জমিদারের ঈষম্মাত্র বিরাগের কারণ হলেই ঘাড়ে মাথা থাকত না। ব্রিটিশদের তখন পর্যন্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ, আর জমিদার তো তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।

অতঃপর মুসলিম লীগের প্রবেশ। ঝঞ্চাকুল ১৯৪৭ সাল। তারই প্রচণ্ড আলোড়নে একেবারে সব ধূলিসাৎ হল। জমি, গয়নাগাঁটি ও অন্যান্য সঞ্চয় সবই গেল। স্বামীর কপাল ভাল, তিনি আগেই মারা যান। কিন্তু এই মহিলা বেঁচে রইলেন, ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। ঘটনার গতি দ্রুততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হল, ছেলে-মেয়ে ও নাতিনাতনিদের হাত ধরে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাড়লেন। তারপর ক্রম-বর্ধমান দুর্দশার প্রতিটি পর্যায়ের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। প্রতিটি পর্যায়কেই আগেরটি থেকে আলাদা করা যায়। কলকাতায় আসার পর কিছুদিন আত্মীয়স্বজনের কাছে থাকা, শহরের মাঝখানে কোনো ভাড়াবাড়ি বা ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়া, সঞ্চয়ের উৎস শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের আয়তন ক্রমে ছোট হয়ে আসে। ইতিমধ্যে ছেলেরা চাকরি জোগাড় করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, বর্তমান আয় এসে দাঁড়িয়েছে শূন্যের কোঠায়। যেটুকু সম্বল ছিল, তা নিঃশেষ হলে তারা শহরতলিতে বাসা নেয়। তারপর আর সেটুকুও সংগতি থাকে না। উচ্চবংশীয় ভূস্বামীর পরিবার আভিজাত্যের গর্ব সংবরণ করে উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়ে ওঠে। অন্যদের মতোই সামান্য একটু জমি দখল করে তার ওপর খানিকটা পাকা একটা ঘর তোলে।

তারপর থেকেই পরিবর্তনটা আর মাত্রাগত না থেকে গুণগত হয়ে দাঁড়ায়। সমষ্টির মধ্যে মিশে যাবার দুর্দৈবটা একবার মেনে নিতে পারলে জমিদারের সন্তান-সন্ততি তাদের বংশগৌরব ভুলে উদ্বাস্তুসমাজের অবিভেদ্য অংশে পরিণত হতে পারে। একই ধরনের দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে যাবার ফলে একটা বন্ধন গড়ে ওঠে। নাতি বখে গেছে; মেয়ে হয়তো বেশ্যাবৃত্তি ধরেছে। কিন্তু ঐ মহিমময়ী মহিলা সব সয়ে বেঁচে আছেন। প্রাসাদের স্মৃতিকে ঘাড় ধরে ঠেলে সরিয়ে ভাঙাঘরের দম আটকানো পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। বিপর্যয়গুলি ক্রমেই আরো বেশি ক্লেশকর হচ্ছে, কিন্তু তার ঠেলা সামলানোটাই তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। তাঁর মুখে দার্শনিক প্রশান্তি। আড়ালে নিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু নরম করে কথা বলুন। ক্রমশ ভিক্ষাবৃত্তির দিকে গড়িয়ে যাওয়া ছাড়া স্বাধীনতার কাছ থেকে তিনি কিছু পাননি। পরিবারের মধ্যে তাঁর ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি; তবু সাহসিকতার উৎস তাঁর ভেতরে। পরিবারের অন্য যে-কোনো লোকের তুলনায় তিনি অনেক সহজে গেছেন ইতিহাসের নির্মম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কথা বললে দেখবেন, তাঁর চেতনায় তিক্ততা নেই। যা দেখেছেন সবই আত্মস্থ করে নিয়েছেন। অনাহার, নোংরামি ও শীতে তিনি জর্জরিত। অলৌকিকের দিন ফুরিয়েছে, তিনি জানেন; এই অভাবের মধ্যেই তাঁর শেষ স্তিমিত দিনগুলি কাটবে। তাই হোক; নালিশ নেই; বিশ্বাসও তিনি হারাননি। এই মাদার কারেজের সঙ্গে কথা বললে আপনার হয়তো বিস্ময়ের খোরাকও জুটতে পারে। শুনবেন, তাঁর নাতি অশিক্ষিত বর্বর, তাঁর দুঃখ সেখানে নয়; তাঁর দুঃখ যে সে সাধারণ অপরাধীতে পরিণত; দারিদ্র্য নয়, দারিদ্র্যজনিত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধেই তাঁর নালিশ। তিনি বলেন, নাতিদের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য বর্জন করার সাহস থাকা উচিত ছিল, গায়ে খেটে সৎপথে জীবনধারণ করা উচিত ছিল। তা নয়, তারা ওয়াগনভাঙা ও চাকু চালানর দলে ভিড়েছে। তিনি স্বীকার করেন, তাদের বংশগত সম্পদ্ তিনি তাদের জন্য বাঁচাতে পারেননি, এটা ট্র্যাজেডি নয়। ট্র্যাজেডি এই যে তাঁর সাহসিকতার

উত্তরাধিকার তারা পেল না। তার নিজের নাতি-নাতনি ভীরুদের পথ ধরল ; শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যোগ না দিয়ে লুম্পেন দলে ভিড়ল। তাঁর প্রশ্ন, একি তাঁরই ব্যর্থতা, না সমাজের ? এই প্রশ্ন থাকবে, যতদিন-না এক সন্ধ্যায় তাঁর সাহসী হৃদয় স্তব্ধ হয়ে যায়।

৬

ইন্দ্র লোহারের কাহিনী

একটি সত্যিকারের গল্প বলছি। প্রত্যেক যুগেরই অঙ্গীকৃত কিছু নীতিকথা থাকে: আজকের যুগের স্বীকৃত নীতি সামান্য মানুষকে রক্ষা করা, তার হিতসাধন, প্রশাসন ও আইনের শক্তিকে এমনভাবে কাজে লাগানো যাতে শেষবিচারে পাল্লা সবসময়ই তারই দিকে ঝুঁকে পড়ে। অথচ বাস্তবের মসৃণ গায়ে এ-সব কি এতটুকুও আঁচড় কাটতে পেরেছে? সামান্য এক ভাগচাষী ইন্দ্র লোহারের এই গল্প বরং উল্টো কথাই বলবে।

ভাগচাষী—ঐ অঞ্চলে বর্গাদার বলেই তারা পরিচিত। ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনে তাদের বিশেষ অধিকারগুলি যথেষ্ট বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভাব্য ফাঁকি আটকানোর জন্য খুবই সম্প্রতি—১৯৩৮ এবং ১৯৫৫ সালে—আইনটিকে দু-বার সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আইনে জমির মালিকের বখরা বেঁধে রাখার ব্যাপারে পরিষ্কার ছক পাওয়া যায়; ভাগচাষীর জমির দখল রাখার সপক্ষেও খুব সুষ্ঠু নির্দেশ দেওয়া আছে। আইন অনুযায়ী, লাঙল, বলদ, সার ও বীজ যেখানে মালিকের, সেখানে বর্গাদার দিয়ে চাষ-করানো জমির ফসলে বর্গাদার ও মালিকের মধ্যে আধাআধি ভাগ হবে। এছাড়া সবসময়ই যথাক্রমে তিনের চার ও একের চার এই হিসাবে ভাগ হবে। আইনে বর্গাদারকে জমির ওপর স্থায়ী স্বত্বও দেওয়া হয়েছে। একমাত্র যদি মালিক প্রমাণ দাখিল করতে পারে যে সে নিজেই চাষ করবে এবং সংশ্লিষ্ট জমি সমেত তার নিজে চাষ করা জমির পরিমাণ যদি সাড়ে সাত একরের বেশি না-হয়, শুধু তবেই বর্গাদারের জন্য দুই একর রেখে সে বাকি জমি থেকে বর্গাদারকে তুলতে পারে। বর্গাদার

যে জমি চষে তাতে এখন তাকে বংশানুক্রমিক স্বত্বও দেওয়া হয়েছে; খাজনা উশুল না-হলেও নিরাপদ। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়ে, নির্দিষ্ট কয়েকটি কিস্তিতে সে যদি বাকি খাজনা দিয়ে দিতে পারে তাহলে উচ্ছেদের আদেশ কার্যকরী করা যাবে না।

১৯৫৫ সালে রাজ্যে যখন রাষ্ট্রপতির শাসন চালু ছিল তখন এই আইনটির গায়ে আরো কিছু সাজসজ্জা চড়ানো হয়। সর্বশেষ এই আইনের প্রগতিশীল চরিত্র নয়াদিল্লীকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল। এমন-কি দেশের অধীশ্বরী তো কোনো-এক প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই আইনটিকে সমাজবিপ্লবের উদাহরণ হিসাবে সারাবিশ্বের সামনে ঢাক বাজিয়ে প্রচার করেছিলেন।

যা-হোক, এবার ইন্দ্র লোহারের গল্পে ফিরে আসা যাক। জেলা বাঁকুড়া, থানা বিষ্ণুপুর, গ্রামের নাম ভোরা; টালা মৌজায় ৪.৯৭ একর মাপের নয় নম্বর প্লটটি ইন্দ্র চাষ করত। বিভূতিভূষণ মণ্ডলের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর কাছ থেকে পাট্টা নিয়ে মৌখিক চুক্তি অনুসারে কুড়ি বছর ধরে সে এই জমি চাষ করছিল। মেয়ের নামের আড়ালে কিন্তু মণ্ডলই ছিল জমির আসল মালিক। দশ বছর আগে শেষ সংশোধিত বিলিবন্দোবস্তের সময়ে বর্গাদার হিসাবে ইন্দ্র লোহার নিজের নাম রেকর্ড করায়নি। তার সহজ কারণ মণ্ডলের সেটা পছন্দ হত না। ইন্দ্র ছিল বশংবদ একজন ভাগচাষী; সর্বদাই জোতদারের পক্ষে থেকেছে, বামপন্থী দলগুলির গলাবাজি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। আইন অনুযায়ী যেখানে তার শতকরা চল্লিশ ভাগ ফসল দেবার কথা, সেখানে বরাবরই সে মণ্ডলকে পঞ্চান্ন ভাগ দিয়ে এসেছে। বাইরের জগতের ঝড়ঝঞ্ঝা তার কিনারা আঁকড়ে টিঁকে থাকায় কোনো তফাৎ ঘটায়নি। দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে ধুলোয় মিশিয়ে এক ভীত প্রভুভক্ত বর্গাদারই সে রয়ে গিয়েছিল।

ইন্দ্রের দুর্ভাগ্য, ১৯৫৫এর গোড়ায় বিভূতি মণ্ডল মারা যায়। পুরানো জমানার জায়গায় এল নতুন জমানা। অন্নপূর্ণা দেবীর বেনামি মালিকানায় এবার ইন্দ্রের জমির আসল স্বত্বাধিকারী হল মণ্ডলের ছেলে

শচীনন্দন। গণ্ডগোলের সূত্রপাত এখানে। শচীনন্দন পুঁজিবাদী খামারের কথা শুনেছে, আই. আর. ধানে সোনা ফলে এ-কথাও কেউ তাকে বলে থাকবে। ১৯৫৫এর আমন গোলায় ওঠবার পর সে ইন্দ্রকে ডেকে জমি ছেড়ে দিতে বলে। ইন্দ্র হাতে-পায়ে ধরে, শতকরা পঞ্চান্ন ভাগেরও বেশি ফসল মালিকের হাতে তুলে দিতে সে রাজি। কিন্তু মৌখিক চুক্তি মৌখিক চুক্তিই; শচীনন্দনকে একটুও টলানো যায় না। দেবতারা যাকে মারেন, তার মাথা আগে খারাপ করে দিয়ে তবে মারেন। ইন্দ্রকেও পাগলামিতে পেল; সে গ্রামের দু-একজন রাজনৈতিক কর্মীকে গিয়ে ধরল, সংশোধিত আইনের কথা বলে তাকে কোর্টে যাবার পরামর্শ দেওয়া হল। সেই মতো এই গরিব বর্গাদার বিষ্ণুপুরের এস. ডি. ও.-র আদালতে ফৌজদারি আইনের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক নালিশ দায়ের করল, আবেদন করল যে জমির বেনামি মালিক তাকে তুলে দেবার চেষ্টা করছে। হাকিম আবেদনটি গ্রাহ্য করলেন এবং জুনিয়র ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অফিসারকে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিলেন। তদন্তে কিছুই ফল পাওয়া গেল না। শচীনন্দন একাধিক পালটা প্রতিবেদন পাঠাল, ইন্দ্রের কাছ থেকেও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরো প্রতিবেদন গেল। হাকিম এবার কৃষি প্রসারের ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় অফিসারকে আবার তদন্ত করার আদেশ দেন; তাঁর বিবরণে প্রকাশ পেল, যদিও অধিকার সংক্রান্ত দলিলে ইন্দ্রের নাম নেই, তাহলেও সে যে বর্গাদার এই দাবির সমর্থনে অনস্বীকার্য প্রমাণ রয়েছে, ওদিকে ১৯৫৫-এর ফেব্রুয়ারি প্রায় শেষ। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের দিন শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে। কাজেই ম্যাজিস্ট্রেট মামলাগুলির শুনানি মুলতুবি রাখাই স্থির করলেন।

নির্বাচন হল। ছল, বল বা কৌশল যারই প্রয়োগ ঘটে থাকুক, বামপন্থী দলগুলির সম্পূর্ণ পরাভব হল। এখানেও পুরোনো জমানার জায়গায় নয়া জমানা কায়েম হল। ১৮ই এপ্রিল সকালে পুলিশ ইন্দ্র লোহারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩২ বস্তা ধান, তিন কাহন খড়, অনির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের আঁটি বাজেয়াপ্ত করল। পরে এক তদন্তে প্রকাশ পায় যে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য পুলিশকে কোনো বিশেষ

মামলার অজুহাতও দেখাতে হয়নি, আদালতের পরোয়ানাও লাগেনি। এমন-কি পুলিশ ফাঁড়ির খাতাতেও এই ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। বস্তুত যা ঘটেছিল তা প্রকৃতির প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্বাচন শেষ, জোতদারদের রক্ষকরা পুরোদস্তুর ক্ষমতায় ফিরে এসেছে, যে বদমাস বর্গাদার মালিকের নামে মামলা ঠোকার সাহস রাখে তাকে যথাযোগ্য শিক্ষা দেওয়াটা নিশ্চয়ই পুলিশ ফাঁড়ির অধিনায়কের কাছে অবশ্যকর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। এস. ডি. ও. এই খবর পেয়ে পুলিশের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠান। ইতিমধ্যে শচীনন্দন স্থানীয় মুনসেফের আদালতে মালিকানা স্বত্ব নিয়ে একটি মামলা রুজু করে এবং এস. ডি. ও.-র আদালতে আনীত মামলার বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞার জন্য আর্জি জানায়। মুনসেফটি আর্জি মঞ্জুর করতে দেরি করেননি। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এর পরের ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। ২২শে মে ভোরে একদল গুণ্ডা ইন্দ্র লোহারের বাড়ি চড়াও হয়ে ইন্দ্র ও তার বাড়ির অন্যান্য লোককে বেদম পিটুনি লাগায় ও বাকি ধান লুঠ করে; ইন্দ্রকে নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে। এর পরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে ইন্দ্রের মামলার শুনানি যখন শুরু হল তখন জমির মালিক এই মামলার ওপর মুনসেফের নিষেধাজ্ঞার প্রামাণ্য প্রতিলিপি সেখানে দাখিল করল। প্রত্যক্ষভাবে হাকিমের গায়ে লাগায় তিনি এক আদেশ জারি করে জানান যে এই নিষেধাজ্ঞা বিধি বহির্ভূত এবং তাঁর আদালতের আধিপত্যে হস্তক্ষেপের শামিল। মুনসেফটিও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি সরাসরি হাইকোর্টে গিয়ে ইন্দ্র লোহার, তার উকিল ও ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনলেন। শোনা যায় ধর্মের কল নড়তে সময় লাগে—এক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরকম ঘটল। কলকাতার হাইকোর্টে নাকি বর্তমানে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে; তবু মুনসেফের আবেদন সত্বর গ্রাহ্য হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আগস্ট মাসেই এস. ডি. ও., লোহার ও তার উকিলকে ফৌজদারি মামলায় ফেলা হয়। অক্টোবরে বিষ্ণুপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এস. সাহা হাইকোর্টের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ইন্দ্র এবং তার উকিলও

তাই করেছিল। লড়াই এখানেই শেষ। গুণ্ডারা যখন বাড়ি চড়াও হয়েছিল তখন ইন্দ্র যে আঘাতগুলি পায় তার ফলে এর আগেই সে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, এখন তার জমি গেছে, তার ধানের সঞ্চয় গেছে, সরল বিশ্বাসে দেশের আইনের ওপর নির্ভর করার সাহসটুকুও গেছে। এই হতভাগ্য লোকটা তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকুই শিখেছে যে আইন এই সমাজে ধনীর রক্ষাকবচ; গরিব লোকের ঐ আশ্রয় খোঁজার কোনো এক্তিয়ার নেই।

ঘটনাটি গালগল্প নয়, জনশ্রুতিও নয়। যোজনা কমিশন নিয়োজিত ভূমিসম্বন্ধ সম্পর্কিত টাস্‌ক ফোর্স এবং জাতীয় কৃষি কমিশনের ভূমিসংস্কার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের পক্ষে রাজ্য সরকারের একদল ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পেশ করা একটি বিবরণে ইন্দ্র লোহারের গল্পটি দেওয়া হয়েছে। ঐ বিবরণীতে গল্পটির ওপর যবনিকাপাত করা হয়েছে এইভাবে : 'যখন আহত অবস্থায় সে হাসপাতালে ভর্তি হয়, তখনও ইন্দ্রের ভাগ্য ছিল অনির্দিষ্ট। এখন আর তা নেই। জোতদারের দ্বারা নির্যাতিত আর ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত সর্বস্বান্ত, পুলিশের তাড়নায় নাজেহাল ইন্দ্র লোহারকে দেওয়ানী আদালত যথোপযুক্ত স্থানে তার আইনসংগত দাবি পেশ করতে দেয়নি, বরং আদালতের "সম্মান" ভূলুণ্ঠিত করার দায়ে পশ্চিমবঙ্গের ফোর্ট উইলিয়ামস্থিত আদালতে তাকে টেনে আনা হয়েছিল। এইভাবে ন্যায্য অধিকারের দাবিতে লড়াই করার ইচ্ছাও সে হারিয়েছে। যে-অধিকারগুলির ধারণা আইনের মধ্যে মূর্ত তা আদায় করার সাহস দেখাতে গিয়ে সে অত্যন্ত বেশি দাম দিয়েছে। ইন্দ্র আজ পঙ্গু ও দুর্বল, পরাজিত এবং হতাশ্বাস, ক্ষমতাসীনের মহিমা তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তার জমিও আজ তার হাতছাড়া।'

আইন করে আদালত ও আমলাতন্ত্রের সম্মিলিত একপেশে মানসিকতাকে টপকে যাওয়া যায় না। সমাজব্যবস্থাই যে গলদে ভরা এটা বারবার বললে বাঁধাবুলির মতো শোনায় কিন্তু কেউ কি অস্বীকার করতে পারে যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের যাবতীয় অন্তর্নিহিত

তত্ত্ব, আদালতের সমস্ত রায় ও প্রাক্তন নজির এবং প্রশাসনের চিরাচরিত ধারা ও কর্মপদ্ধতি সমাজের ওপরওয়ালা শ্রেণীকেই মদৎ দেয়। সমানে সমানেই দোস্তি চলে। সম্পন্ন শ্রেণী থেকে আসা বিচারক বা পুলিশ আইনের অর্থকে তার জাতভাইদের স্বার্থেই কাজে লাগায়। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যায় হাজারে হাজারে ইন্দ্র লোহার রয়েছে। গালভরা সমাজতান্ত্রিক কথা আছে এবং থাকবে, কিন্তু বাস্তবের তাতে একচুলও অদলবদল হয় না। কৃষকদের নিজেদের যদি কোনো জীবন্ত, সংহত আন্দোলন থাকত, যাতে নিচ থেকে আঘাত হানা যায়, আদালত ও প্রশাসনের ওপর আগাগোড়া চাপ সৃষ্টি করা যায় ও পুলিশের মনে জনগণের ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্থ ভীতি সঞ্চার করা যায়, তাহলেও হয়তো অবস্থা একটু অন্যরকম হত। কিন্তু এই দেশ ইদানীং যে সাজানো বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গেল তাতে এইসব আশাই এখনকার মত ধূলিসাৎ হয়েছে, যে রাজনৈতিক কর্মীরা ইন্দ্রকে আদালতে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল তারা আর নেই, হয় পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে গেছে, নয়তো পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জোতদারদের গুণ্ডার হাতে তারা খতম হয়েছে। এদেশের ‘ইন্দ্র লোহার’দের মনের কথা যাই হোক ইতিহাসের স্রোত উল্টোদিকে বওয়ার জন্য তাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

৭

জন্মিলে মরিতে হবে

সময়টা পড়েছে এমন, যে খুঁত ধরাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে ; আবেগপ্রবণতার সঙ্গে উপহাস্যতার তফাৎ ক্রমেই কমে আসছে। আজকের নিবন্ধটি তবু স্যাঁতসেঁতে আবেগকেই উৎসর্গ করলাম। যদি আপনার এতে বিবমিষা হয়, না-হয় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

মৃণাল সেনের 'কলকাতা ঃ ৭১'-এর শেষ দৃশ্যটিতে দম আটকে আসে। কারণ সেই দৃশ্য সাধারণ বাস্তবতার জগতে কি ঘটতে পারে আর না-পারে সে বিষয়ে আমাদের চলতি ধারণাগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কলকাতার ময়দানে কুয়াশা ঢাকা ভোরের প্রকাণ্ড বিস্তার ; অজ্ঞাতপরিচয় মেশিনগানধারীরা হংসপদিক কুচকাওয়াজ করতে করতে ভাবালু চোখের একটি অসহায় তরুণকে গুলি করে পেড়ে ফেলে। পাখিরা নীরব ; তরুণটি যন্ত্রণায় মোচড়াতে মোচড়াতে মারা যায়, গুলির শব্দও বোধহয় হৃদয়হীন মহানগরীর আপাত ঔদাস্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, কারণ ঐ তরুণটি কে, আর কুচকাওয়াজরত মেশিনগানধারীরাই বা কারা, সেটা সকলেরই জানা। সকলেরই জানা, তবু অল্প লোকই তা নিয়ে কথা বলতে চায়। প্রশ্ন করবেন না ; মিথ্যা উত্তর এড়ানোর একমাত্র পথ সেটাই। মৃণাল সেনেরও কতগুলি অসুবিধা আছে। তাঁরও একটু আড়াল দরকার। যে-ধরনের ছবি তিনি তুলতে চান, সে-রকম ছবি তোলা যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেইজন্যই। সুতরাং হত্যাকারীদের পরিচয় উহ্যই থাকে।

তবু ঐ ছবিটা কোনো রূপক মাত্র নয়, ঐ বিশেষ দৃশ্যটি নয় প্রতীকী। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রশাসকদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন তাঁরা স্বীকার করবেন যে,

১৯৫৫ সালের চতুর্থ মাস থেকেই পুলিশ অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করে, দেখামাত্র তাদের খতম করার পরোয়ানা পেয়ে গেছে। মৃতরা গল্প বলতে পারে না, তাছাড়া এ-সব হত্যার সাক্ষ্যপ্রমাণ বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত। 'অবাঞ্ছিত' কারা তার সংজ্ঞা ঠিক হয় ক্ষমতাসীনদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। আর, একবার সেটা ঠিক হয়ে গেলে পুলিশ প্রকৃত অর্থেই শহরের পথে-পথে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার অভিযানে বেরোতে পারে। 'আত্মরক্ষার্থে' এই কথার মধ্যে যে হাস্যকর আক্ষরিকতা আছে, তা মেনে চলার দরকার নেই : তল্লাশি পরোয়ানা এবং সাক্ষীসাবুদের ঝামেলা অবান্তর—ও-নিয়মটা ছিল ব্রিটিশ আমলে ; 'অবাঞ্ছিত' বলে চিহ্নিত তরুণদের ঝটিতি খতম করা সোজা হয়ে গেছে।

গত সপ্তাহে রাজ্যসভার একজন সদস্য আর্তস্বরে বলেছিলেন ; ব্রিটিশ আমলে যদিও তিনি সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত ছিলেন, তবু রাস্তায় আচমকা পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলবে আর পরে বলবে 'সংঘর্ষ' হয়েছিল, এ ভয় তখন তাঁকে করতে হয়নি। কিন্তু এ-শহরে ইদানীং এক ভাইপোর কপালে ঠিক এইটাই ঘটেছে। একজন মন্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেন, বলেন ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াইয়ে আমরা সবাই একসাথে ছিলাম, ওটা ঠিকই ছিল। কিন্তু আজ পরিস্থিতি অন্য, কারণ শাসনভার আমাদের হাতে ; এই রাষ্ট্রতন্ত্রকে এমন-কি আমাদের ভাইপো-ভাইঝিরাও যদি ভেতর থেকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, তাহলে তো আমাদের 'একটা-কিছু' করতে হবে। 'একটা-কিছু' বলতে মন্ত্রীমশাই স্পষ্টতই খোলা আকাশের নিচে নিরস্ত্র তরুণতরুণীদের সোজাসুজি গুলি করে হত্যার কথাটাই একটু রেখেঢেকে বোঝাতে চেয়েছেন। ব্রিটিশরা হয়তো 'একটা-কিছু' নিয়ে দোনামনা করতে পারত ; আমরা কেন করব? নিজেদের ভাইপো-ভাইঝিদের বেলায় আইনের অনুশাসন বাদ দিয়েও চলা যায়।

যে ধনী কৃষক চল্লিশ টাকা কুইন্টাল দরে উৎপাদিত গম খুচরো-বিক্রেতার কাছে একশো টাকা দরে বিক্রি করে, সে নাশকতামূলক কাজ করছে না। যে পাইকার ধনী কৃষককে প্রচুর ঘুষ দিয়ে ব্যবস্থা করে নেয়,

ভাবে যে তার সুবিধার্থে দাম আকাশ-ছোঁয়া না হলে ফসল বাজারে ছাড়া হবে না, তার কাজটাও অন্তর্ঘাতী নয় ; একটু বেচাল হয়ে যাচ্ছে মাত্র ; তার জন্য কিছু তিরস্কার প্রাপ্য ; কোনো রাজনৈতিক দলের তহবিলে,চাঁদা দিয়ে তাকে একটু প্রায়শ্চিত্ত করানো যায়। চূড়ান্তরকম ধনী দেনদার যদি আবার এক গেলাসের ইয়ার হয়, তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান স্বইচ্ছায় তার জন্য সুদের হার কমিয়ে দিতে পারেন, এবং মার্জিন ও জামানতের নিয়মকানুনগুলো ভুলে যেতে পারেন, তাঁর কোনো শাস্তির প্রশ্নই ওঠে না ; তিনি তো নাশকতামূলক কাজ করছেন না, বরং উপরি-কাঠামোকে আরো জোরদার হতে সাহায্য করছেন। যে শিল্পপতি অধীনস্থদের দেয় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের অংশ তাদের মাইনে থেকে কেটে রাখেন, কিন্তু সেটা যথাস্থানে জমা দেবার কথা বেমালুম ভুলে যান, তাঁর ব্যবহারটা দুর্ভাগ্যজনক ঠিকই, কিন্তু তাঁকে বিনাবিচারে গুলি করার প্রস্তাবে সরকার শিউরে উঠবে ; তাঁর বিরুদ্ধে বড় জোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। যে টাকার কুমির রফতানির চালান কম ও আমদানির চালান বেশি করে দেখিয়ে কালোবাজারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, তার কাজটা তামাশা মাত্র ; যদি পারেন রাজ্যসভার আগামী দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে তাকে একটা পার্টি টিকিট দিয়ে দেবেন। যে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রশাসক উদ্বাস্তুদের জন্য পাঠানো ত্রাণসামগ্রী কালোবাজারে বেচে দেয়, কিংবা বাঁ হাতের ব্যাপারে সাহায্যকারী সন্দেহজনক ব্যক্তিদের কাছে দুর্মূল্য সার ও ইস্পাত বিলিয়ে দিয়ে জাতীয় অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ করে, তাকে সতর্ক করা বা অন্যত্র বদলি করে দেওয়াই যথেষ্ট। সে তো আর কোনো-একটা বামপন্থী দলের অনুগামী ক্ষুদে কেরানি নয় যে, তাকে সরানোর জন্য সংবিধানের ৩১১ নম্বর অনুচ্ছেদের ২নং ধারা টেনে আনতে হবে ; সে দেশের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না। কোনো ব্যবসায়ী যদি ভোজ্য তেলে বিষাক্ত ভেজাল বা চালে কাঁকর মেশাতে গিয়ে ধরাও পড়ে, তবু ভবিষ্যতে সৎ ব্যবহার করার শপথ করেই ছাড়া পেতে পারে ; কল্পনার দৌড় যত দূরই যাক তাকে অন্তর্ঘাতক বলা চলে না ; তার কোনো অগ্নিশুদ্ধির দরকার নেই। যে রাজনৈতিক নেতা ক্ষমতায় থাকার সুযোগে লাইসেন্স ও

অন্যান্য দাক্ষিণ্য বিতরণ করে দু-চার কোটি টাকা কামান, আর যে মুখ্যমন্ত্রী সংসদ সদস্যা পত্নীর রাজধানীতে থাকার অসুবিধা দূর করার জন্য সরকারি টাকায় একটা আস্ত অতিথিভবনের ব্যবস্থা করেন, তাঁরা দোষী নন; তাঁরা প্রচলিত প্রথা মেনে চলছেন মাত্র। জোতদার যদি গণ্ডাখানেক হরিজন নারী ও শিশুকে যথেচ্ছভাবে হত্যা না করে জলগ্রহণ করতে না পারে, তার জন্য আইনের গয়ংগচ্ছ চাকা তার নিজস্ব গতিতে ঘুরে আসুক না; সামান্য ব্যাপারে মাথা গরম করে লাভ কী। জোতদারের লোকেরা ভাগচাষীকে তার ক্ষেত থেকে মেরে তাড়াক, তার বালবাচ্চা উপোস দিক, সেজন্য অধৈর্য হওয়া চলবে না, আমরা যে সমাজবিপ্লবের জন্য লড়াই করছি, সে তো আর একদিনে আসার নয়। সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হোক, তাদের ঘরবাড়ি ভূমিসাৎ করা হোক, তাদের সম্পত্তি লুঠ হয়ে যাক; ওপর ওপর কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হবে, তারা জামিনও পাবে, কিন্তু অপরাধীদের আরো বেশি কঠোর শাস্তি দাবি করা যাবে না; তাদের গুলি করার তো প্রশ্নই নেই। টাকার কুমিরেরা আয় গোপন করে, কর ফাঁকি দেয়, সরকারি আইনকানুনকে কাঁচকলা দেখায়। তাদের শাস্তি দেবার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নেই—তারা তো নাশকতামূলক কাজ করছে না, তাদের গুলি করা হবে কেন? ঠগ, গুণ্ডা, মুনাফাখোর, ফাটকাবাজ, তছরূপকারী এবং আরো নিকৃষ্ট বদমাশরা কেউই সমাজব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক নয়; প্রজাপীড়ক জোতদার বিপজ্জনক নয়, জমি দখলকারী নয়, সরকারি তহবিল থেকে যে টাকা সরায় সেও নয়। যে-কোনো চোর-ছ্যাঁচড়ই যথাবিধি আইনের আশ্রয় পেতে পারে, আইনানুগ ব্যবস্থা দাবি করতে পারে। জোচ্চুরি বা স্বজনপোষণ, বা গরিবের সর্বস্ব অপহরণ এই সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর নয়, কর্তৃপক্ষ যে সৌধের ওপর সতর্ক পাহারা রাখছেন, তা তো এর ফলে ধ্বংস হচ্ছে না; এগুলোকে প্রায় সম্মানজনক পেশাই বলা যেতে পারে।

মূল্যবোধ জিনিসটা আপেক্ষিক। যে কালোবাজারে টাকা করেছে, সে সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনোভাবেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে না; তার অপরাধে সমাজের যারা মাথা তাদের জীবনযাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে আদৌ

ব্যাহত হয় না ; যথাযোগ্য ব্যবস্থাসাপেক্ষে শেষোক্তরা এবং ঐ মুনাফাখোরের লাভ থেকে কিছুটা অংশ নিজেরা ভোগ করতে পারে ; শাসনতন্ত্র যে-সামাজিক ভিত্তির ওপর খাড়া আছে, তার প্রতি সুযোগ্য সম্মান যতক্ষণ দেখানো হচ্ছে, ততক্ষণ খুন করলেও রেহাই আছে, অথবা—যা আসলে একই কথা—খুনও যদি আপনি করেন, দেশের সংবিধান প্রশাসনিক বাড়াবাড়ির হাত থেকে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করবে। কিন্তু যে-মুহূর্তে মৃণাল সেনের সেই তরুণটির মতো আপনি বিপজ্জনক চিন্তাকে মনে স্থান দিতে শুরু করবেন, তখনই ঐ রক্ষাকবচের গুণ চলে যাবে। শাসকশ্রেণীকে বোঝানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই যে, এ-ধরনের বিপজ্জনক চিন্তা শুদ্ধতম দেশপ্রেমেরই নিদর্শন। বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতির পটভূমিতে সংবেদনশীল তরুণতরুণীরা ভারতরক্ষা আইন, মিসা, এবং স্বরাষ্ট্রদপ্তরকে অগ্রাহ্য করে বল্গাহীন স্বপ্ন দেখবেই, আর খাপছাড়া উদ্ভট চিন্তাও করবেই। একটা ধারণা আছে, যে (দেশপ্রেমের সারবস্তু) হল সাহস এবং আদর্শপ্রীতির জন্য শৌখিন জীবনের মোহ ত্যাগ করার মতো মনোবল। ১৯৪৭ সালের আগে, আমাদের এই দেশেও তা-ই ছিল দেশপ্রেমের সংজ্ঞা।

ঐ বিপজ্জনক ছেলেমেয়েগুলোকে বাদ দিয়ে এমন একদল লোকের নাম করার চেষ্টা করুন তো যারা রাজনৈতিক নেতাদের বহুল প্রচারিত আত্মবিসর্জনের আদর্শ কাজের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। মন্ত্রী তথা রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে রাস্তা মেরামতের কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের ওভারসীয়ার পর্যন্ত সব জায়গাতেই আত্মসেবাই ধর্ম। শাসকশ্রেণী বিগত বছরগুলি ধরে যে নৈতিক বিধি গড়ে তুলেছেন, তাতে গাঁজাখোর, নিষ্কর্মা বা গুণ্ডা যা খুশি আপনি হতে পারেন, কিন্তু আর যাই হোক, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তন করার অসম্ভব স্বপ্ন দেখাটাকে পেশা করে তুলবেন না।

সমসাময়িক ভারতবর্ষের বিয়োগান্ত কাহিনীর মাত্রা এটাই। জন্মিলে মরিতে হবে। এই যে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা নতুন সমাজসৃষ্টির আশায় সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত এবং তা করছেও, এ-দেশে এদের মতো তরতাজা

জীবন্ত আর কে আছে? সুতরাং তাদের মরতে হবে খোলা আকাশের তলায়, পুলিশের সঙ্গে সাজানো সংঘর্ষে কুকুরের মতো গুলি খেয়ে। আর যাদের প্রাণটুকু কোনোরকমে বেঁচেছে, তারা বন্দী হয়ে থাকবে, মিসায় না-হোক, বিবিধ উদ্ভট অভিযোগে, সে অভিযোগগুলি স্পষ্টতঃই পরে সাজানো হয়েছে।

আমাদের এই বিরাট গণতন্ত্রে কারাপ্রাচীরের আড়ালে অপেক্ষমাণ ভাইপোভাইঝিরা সংখ্যায় কত? ত্রিশ হাজার, চল্লিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার? আর সমাজসেবী যাতে অন্তর্ঘাতের কবলে না-পড়ে এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য কতজনকে কারাকক্ষের ভিতরে ও বাইরে বিনা বিচারে গুলি করে মারা হয়েছে? এ-সব নিয়ে কেন ভাবছেন? ওরা তো স্বপ্ন দেখত, ওদের কপালে আর কী থাকবে? আর, তাদের যে-মুহূর্তে খতম করা হচ্ছে, সে-মুহূর্তে অসাধু মানুষেরা কেউ কেউ ২৬শে জানুয়ারি ও ১৫ই আগষ্ট উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হবেন। চোরছ্যাঁচড় হলে কি হয়, সমাজব্যবস্থাকে তাঁরাই তো আরো সমৃদ্ধ করে তুলছেন।

৮

এক ঐতিহাসিক সমান্তর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রেসিডেন্ট কুলিজের রাজত্বকাল; এটা সেই সময় যখন অষ্টাদশ অ্যামেণ্ডমেন্ট (সংশোধনী) সরকারিভাবে মদ তৈরি ও বেচা নিষেধ করে দিয়েছে। শিকাগো, বুধবার, ২০ অক্টোবর, ১৯২৬। হোটেল শেরম্যান: মেয়রের সদর দপ্তর অর্থাৎ সিটি হল থেকে ঢিল ছুঁড়লে হোটেলে পড়ে; রাস্তার ওপাশে পুলিশের বড় কর্তার আফিস। এক বিখ্যাত শান্তি সম্মেলন বসেছে। সভাপতির আসনে ম্যাক্সি আইজেন, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মস্তান শিরোমণি, লেক মিসিগানের মেছোহাটার সব ফিরিওলারা তাকে প্রণামী না-দিয়ে পার পায় না, আর শিকাগোর অপরাধজগতে একজন 'বুদ্ধিজীবী' বলে যার বিরাট নামডাক। এই সেদিন অব্দি তার আঁতাৎ ছিল আইরিশ গুণ্ডাদলের সাথে। কিন্তু আইরিশদের ভূতপূর্ব সর্দার মালঞ্চ-মালিক ডিওন ও'বানিয়ন এই সেদিন চিৎপটাং শুয়ে পড়েছে তার কফিনে, বন্দুকবাজটি জানেনই তো কে হতে পারে, আর সাবধানতা যেহেতু সাহসেরই শ্রেষ্ঠ অংশ, ম্যাক্সি ক্রমেই শান্তিনির্মাতার এই নতুন ভূমিকাটাকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে। হোটেল শেরমানের ল্যাভেণ্ডার রুমের এই অধিবেশনে যারা যোগ দিতে এসেছে, তাদের মধ্যে আছে আলফঁস ক্যাপোন, লোক-দেখানো একটা ব্যবসা আছে বটে তার—পুরানো আসবাব বিক্রি করার (যদিও একবার তার পেশা কী জানতে চাইলে সে গ্র্যাণ্ড জুরির মুখের ওপর খেঁকিয়ে উঠেছিলো: 'বিশেষত এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর না-দেবার সাংবিধানিক অধিকার আমার আছে'), এমনিতে সবাই তাকে অ্যাল ক্যাপোন বলেই চেনে, সুবার ধারণা মাফিয়ার নাপোলি গোষ্ঠীর সেই

হচ্ছে মাথা, এখন অবশ্য সে, প্রশ্নাতীত ভাবে, যতদূর চোখ যায় ততদূর অব্দি অঞ্চলটার সর্বেসর্বা, রাজাধিরাজ; তার পাশেই বসে আছে তার জিগরি দোস্ত আর শাগরেদ আন্তোনিয়ো লোম্বার্দি, ভয়াবহ য়ুনিওনে সিসিলিয়ানার কর্তা, শিকাগোর মাফিয়ার এটাই সর্বজন পরিচিত নাম। লোম্বার্দির পাশেই বসে আছে জ্যাক গুজিক, ক্যাপোনের মদ চোলাই ও বিক্রির সিণ্ডিকেট ও গণিকালয়গুলোর ম্যানেজার; তার পাশে বসে আছে র‍্যাল্‌ফ শেনডন, ক্যাপোনের বিয়ারের আড়ত ও বেআইনি চোলাই কারখানার খোদ কর্তা। টেবিলের অন্যপাশে বসে আছে জর্জ 'বাগ্‌স' (ছারপোকা) মোরান, স্বনামধন্য চোর ও বন্দুকবাজ, আর ভিনসেণ্ট ('ফন্দিবাজ') ক্রুচ্চি, পয়লা নম্বর রতনচোর আর নির্বাচনের কারচুপিতে বিশেষজ্ঞ; উত্তরদিকের গুণ্ডাদলের তারাই বিদ্যমান প্রতিনিধি —বাকিদের ১৯২৪ থেকেই অ্যাল ক্যাপোন একেবারে নিয়ম করে পর-পর খতম করেছে। তার পাশে, ডান থেকে বামে, বসে আছে আইরিশ গুণ্ডাদের প্রতিনিধি: উইলিয়াম স্কিডমোর, সে জেলখানার কয়েদীদের গুলি-বন্দুক চালান দেয় আর জজসাহেবদের 'ঠিকঠাক' করে দেয়; ক্রিস্টিয়ান পি. বার্মি বর্‌টুশ, সুপরিচিত ডাকাত আর সিন্দুকতোড় এবং জ্যাক জুটা, তাদের প্রধান অস্ত্রবিশেষজ্ঞ। জেল্লাদার তারকাদের মধ্যে কেবল পোলদেশী জো সাল্‌টিস আসেনি—দক্ষিণ পশ্চিম শহরতলির বিয়ার বেচার ঘাৎঘোৎ সব তারই দখলে; অনিবার্যকারণেই আজ সে গরহাজির: পুলিসের সঙ্গে এক পরিতাপজনক ভুল বোঝাবুঝির ফলে সাময়িকভাবে সে জেলখানায় বসে আছে।

মেছোহাটার মস্তান ম্যাক্সি কিন্তু তার এই নতুন ভূমিকা বেশ উপভোগ করছিলো: একে শান্তিনির্মাতা, তায় সকলের বেরাদর-কনফেসার। অতীত—টেবিলের চারপাশে যারা বসেছিল তাদের সে প্লুতস্বরে বোঝালো—সে অতীতেই। তাই হওয়া উচিত। আইরিশ, নাপোলিশাখা, সিসিলিশাখা আর পোলরা ১৯২২ থেকে অন্তর্কলহের ফলে সবশুদ্ধ দুশোরও বেশি প্রাণ হারিয়েছে। এই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ-অঞ্চলে কার সার্বভৌম কর্তৃত্ব থাকবে, সেটা ঠিক করা। আসলে

তো শিকাগো আর তার উপকণ্ঠগুলোকে কয়েকটা তল্লাটে ভাগ করে দিলেই হয়, স্পষ্টাস্পষ্টি সব এলাকা, যেখানে জারিজুরি খাটবে শুধু একজনের, প্রত্যেক এলাকার জন্য একজন করে দণ্ডমুণ্ডের মালিক; এক কথায়, তারই হাতে তল্লাটটার সনদ থাকবে, সে সেখানে, সবকিছু চালাতে পারবে, আর সবকিছু মানে সবকিছুঃ মাল চোলাই, মাল বিক্রি, বেশ্যাবৃত্তি, কোকেন আফিমের ব্যবসা, নির্বাচনের সময় বিভীষিকা, জজসাহেব ঠিক-করা, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদি-ইত্যাদি। মুশকিল হয়েছে যে অহংএ অহংএ বিরোধ বেধেছে আর বেশ কয়েক বছর ধরে খতম অভিযান চলেছে। আদি নাপোলিবাসী অ্যাল ক্যাপোন এতদিনে প্রধান পাণ্ডা হিসেবে উদিত হয়েছেন; আইরিশরা তো প্রায় বিলকুল সাফ; সিসিলিশাখার দশাও তথৈবচ; পোলদের হালও একইরকম—তাদের নেতা সাল্‌টিস তো কেবলই পিছু হঠছে আর পালাচ্ছে। যথেষ্ট কথাটির মানে—ম্যাক্সি অকাট্য যুক্তি খাড়া করল—যথেষ্টই হওয়া উচিত। এদিকে নিজেদের মধ্যে দলাদলি আর খুনোখুনি সব গুণ্ডার মুখে চুনকালি লেপে দিচ্ছে। রাজনীতিকরা, আইন-প্রণেতারা, বিচারপতিরা—যারা সবাই এদের কাছ থেকে মাইনে নেয়—নেহাৎই সাধারণ মানুষ আর মিছেমিছি ওয়াশিংটনের ফেডারেল সরকারের কাছে নাজেহাল হচ্ছেন। এখন তাই আশু, এবং অবশ্য, কর্তব্য নিজেদের মধ্যে সব দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে নেয়া। ম্যাক্সি সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে এই শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ডেকেছে। ইতিমধ্যেই সে আইরিশ ও অন্য সবাইকে বুঝিয়ে বলেছে, সবাই এখন তোয়ালে ফেলে দিয়ে রিঙের বাইরে চলে আসতে উৎসুক। তারপরে সে লোম্বার্দিকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলেছে, আর লোম্বার্দি বলেছে ক্যাপোনকে। কয়েকটা লৌকিকতাবর্জিত, খোলামেলা প্রাথমিক সভা ডেকে স্থির করা হয়েছিলো আজকের এই বৃহৎ অধি-বেশনটির কর্মপ্রণালী। অবশেষে আজ ২০ অক্টোবর ১৯২৬ হোটেল শেরমানে এই প্লোনারি অধিবেশন ডাকা হয়েছে। একেই বলে গ্রহ-সম্মিলন: দু-একটি অনিবার্য গরহাজিরা বাদ দিলে পাতালপুরীর সব

ভাড়াটে গুণ্ডাই এখানে উপস্থিত। ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য—এই দুটি কথার বানান তারাই স্থির করে দেবে। কুক কাউন্টির দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের দুটো দলকেই তারা নিয়ন্ত্রণ করেঃ তারাই ইলিনয় রাজ্যের সেনেট সদস্য ও গভর্নরের নাম ঠিক করে দেয়; মেয়র বিগ বিল টমসন তাদেরই হুকুমের চাকর; পুলিশের কমিশনার সাহেব স্বয়ং অ্যাল ক্যাপোনের ইয়ার; আর নির্বাচনে কারচুপি করেই সব জজ ঠিক করা হয়। এখানে তারা জমায়েৎ হয়েছে এখন, ঠিক যেন ভিয়েনা কংগ্রেসেরই হুবহু নকল: এখন তারা শিকাগো আর কুক কাউন্টি ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবে, স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট একেকটা ভৌগোলিক এলাকায়, যেখানে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও সমাজের সংহিতার বদলে চাপিয়ে দেবে তাদের নিজেদের তৈরি-করা আইনকানুন, যৌথ কারবারের লাভের বখরা আর ফাটকা বাজারের শেয়ারের—সবই তারা ঠিক করবে এখন, ঠিক সেই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে, যেভাবে ধরুন সিদ্ধান্ত নেয় বড়ো-বড়ো ফাটকা কম্পানির পরিচালকেরা।

সভা শুরু হবার পর পাঁচ মিনিটও কাটেনি, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এখন অ্যাল ক্যাপোনই সর্বেসর্বা। সমবেত প্রতিনিধিরা হঠাৎ যেন যুগপৎ আতঙ্কে আর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গেল। আগে কে বা সায় দেবে ক্যাপোনেরে, তাই নিয়ে তাদের কাড়াকাড়িটা রীতিমতো করুণ দেখাল। অ্যাল ক্যাপোনই শান্তিচুক্তির মূল শর্তগুলো বলে দিলে; বেশির ভাগই বিনাবাক্যব্যয়ে গৃহীত হয়ে গেল। যদি কারু মনে ছোটোখাটো খোঁচখাঁচ থেকেও থাকে, সে-সব সে তার মনের মধ্যেই চেপে রেখে দিলে। কারণ অ্যাল ক্যাপোনই নিজেকে সার্বভৌম প্রভু বলে প্রতিষ্ঠা করেছে। উত্তরে তার সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত আর পশ্চিমেও তার ক্ষমতা তর্কাতীত। দক্ষিণ ভাগ, অর্থাৎ লুপ থেকে শিকাগো হাইট্স অব্দি তল্লাটটাও অনিবার্যভাবে তারই ভাগে পড়েছে। এখন যা সামান্য কাজ বাকি, তা শুধু জালটা গুটিয়ে আনা। পুলিশ আর মেয়র, সেনেটার আর জজসাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগের সব ব্যবস্থাই তার দখলে। ফলে এটা তো অবশ্যম্ভাবীই যে সমাবেশে অ্যাল ক্যাপোন যা বলবে তা-ই

হবে। শান্তিসনদের শর্তগুলো মাত্র পাঁচটি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হল; যথা: ক) সাধারণ যুদ্ধবিরতি, খ) খুনোখুনি মারপিটের ওপর আপৎকালীন নিষেধাজ্ঞা, গ) আগেকার যাবতীয় খুনজখম গোলাগুলিকে অতীতকাহিনী বলে ধরে নিতে হবে, ঘ) দলগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জন্য, অবাঞ্ছিতভাবে গায়ে পড়ে পুলিশ যে-সব গুজব বা বদনাম রটিয়েছিল, অথবা খবরকাগজ মারফৎ যে কাদা ছিটানো হয়েছিল, শান্তিচুক্তির আগেকার তারিখের যাবতীয় পুরানো টেলিগ্রাম, চিঠিপত্র বা অন্যান্য দলিলদস্তাবেজ—তাদের কোনোটিকেই পাত্তা দেয়া চলবে না, এবং শেষত, ঙ) এই চুক্তি থেকে এককোঁটা চুন খসলে, অথবা কোনো দলের কোনো এলেবেলে সদস্যের কোনো বৈরিমূলক ক্রিয়াকলাপ দেখলে দলের নেতাকেই তার জন্য দায়ী করা হবে এবং তাদের সম্বন্ধে সমাবেশকে জানাতে হবে, সমাবেশ তখন দায়ী নেতাকে বলে দেবে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে।

একবার শান্তিচুক্তির পঞ্চ-দফা মেনে নেয়া হতেই শান্তিসম্মেলন তক্ষুনি নিজেকে একটা সীমানির্ধারক অধিবেশনে রূপান্তরিত করে ফেলল। আলোচনা চলল রুদ্ধদ্বার। মোরান আর ড্রুচ্চিকে দেয়া হল শহরের উত্তর অঞ্চলের একটা মহল্লার ইজারা—৪২ আর ৪৩নং ওয়ার্ড। ম্যাডিশন স্ট্রিটের দক্ষিণে যাবতীয় জমিজমা, বিয়ার বেচার অধিকার, জুয়োর আড্ডা আর বেশ্যাবাড়িগুলো সব দেয়া হল অ্যাল ক্যাপোনকে, তাকেই এখন রীতিমাফিক সেই লুপ থেকে সিসেরো অব্দি দক্ষিণে খোঁয়াড় থেকে ইণ্ডিয়ানার সীমান্ত অব্দি এবং নিচের দিকটায় শিকাগো হাইট্‌স অব্দি সারা পশ্চিমের একচ্ছত্র অধিপতি বলে মেনে নেয়া হল। সিসিলিশাখা আটকে রইল শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম তল্লাটে তাদের নিজেদের বাড়ির পেছনটুকুতে। আপাতত আইরিশদের জন্য কিছুই রইল না: তাদের কিছুকাল অপেক্ষাধীন থাকতে হবে, একবার যদি অ্যাল ক্যাপোন তাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে যে তাদের বরাতে কিছু-একটা জুটে যাবে, এ কথা উহ্য রইল।

সভা শেষ হবার পর অতর্কিতে শিকাগোয় শান্তি অবতীর্ণ হল।

সে-বছর অক্টোবরের কুড়ি তারিখ অব্দি কুক কাউন্টিতে সবশুদ্ধু বাষট্টিটি খুন হয়েছিল। সেইদিন থেকে ৩০ ডিসেম্বর অব্দি—কেবল কোথাকার কোন্ চালচুলোহীন উজবুক ছাড়া, সে আবার কোনো দলেরই লোক নয়, সে ১৯ ডিসেম্বর খতম হয়েছিল—শিকাগো শহরে আর একটাও খুন হয়নি। পরবর্তীকালে ইতিহাসে এই সাময়িক বিরতি পরিচিত হয়েছিল 'সত্তর দিবসের শান্তি' হিসেবে।

ঐতিহাসিক সমান্তরটি অপ্রতিরোধ্য। এ-মাসের গোড়ার দিকে সঠিক বলতে গেলে ৭ জুন তারিখে, কলকাতায় এক প্রতিনিধি সম্মেলনের শেষে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে একটি বাইশ-দফা শান্তিচুক্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাইশটি দফার সঙ্গে, ৪৭ বছর আগে হোটেল শেরমানের সভার পর বিভিন্ন দলের মধ্যে যে পাঁচ দফা যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছিল, তার কী আশ্চর্য গা-ছমছমে মিল। অতীত অতীতই, অতীতের খুনখারাপির প্রতিশোধ নেবার জন্য আর কোনো রক্তারক্তি ঘটানো হবে না ; পুলিশ আর বিপক্ষ দলের উশকানি-নিপুণ দালালদের ফাঁদে আর পা দেয়া চলবে না ; যদি এই চুক্তির কোনো নির্দেশ কোনো উপদলের কোনো সদস্য লঙ্ঘন করে, তাহলে কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাছে নালিশ করতে হবে—এই কমিটিতে সব উপদলেরই প্রতিনিধি থাকবে, এবং তারাই চূড়ান্ত রায় দেবে। যদিও খবর কাগজে এ-তথ্য বেরোয়নি, অধিবেশনে এটা ঠিক করা হয়েছে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলো বিভিন্ন উপদলের কাছে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেয়া হবে—কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রত্যেকের অধিকারের সীমা বেঁধে দেবে। অদূর ভবিষ্যতে কমিটির গোপন বৈঠক বসবে।

শিকাগোর লোকের কপাল ভালো ছিল ; সত্তর দিন ধরে তারা একটানা, অবাধে, নির্বিবাদে, শান্তি উপভোগ করতে পেরেছিল। কলকাতা অধিবেশনে যে অস্বস্তিকর শান্তি চাবকে ঠিক করা হল, তার আয়ু অতটা দীর্ঘ হবে কিনা, অথবা দল-উপদলগুলো তার আগে ছুরিছোরা বার করে মেতে উঠবে কিনা—এখনও তা বোঝার উপায় নেই। শিকাগোর গুণ্ডারা কে কোথায় বে-আইনি মদ তৈরি করবে বা বেচবে,

কার কোন্ তল্লাটে অবাধে খুন-রাহাজানি-ছিনতাই চালাবার অধিকার আছে, কে কোথায় লোককে ভয় দেখিয়ে টাকা পিটবে, কে কোথায় কোকেন আফিম চরস বেচবে, কে রাজনীতিকদের বদমায়েশ বানাবে বা নির্বাচনে কারচুপি করবে, সভা ডেকে তাই ঠিক করেছিল। এখানে, অনুমান হয়, যা নিয়ে চুলোচুলি হচ্ছিল সেটা উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায়, চাল পাচারের অধিকার; উত্তর প্রদেশ থেকে সর্ষে এনে তেলকলগুলোকে দেবার লাভটা কে পিটবে, সরকারি চাকরির নতুন রংরুটদের নামধাম বলবার অধিকার কার, কার ভাগে বর্তাবে বেকারদের চটপট চাকরি দেবার অথবা জরুরি উৎপাদন কর্মসূচির পরিকল্পনাটির বিপুল তহবিল, আর দলের অর্থসচিব যে চাঁদা তুলবেন, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে কার—এ-সবই ছিল এখানে বিবাদটির উপলক্ষ। আরো-সব দাবি ও অধিকারের ব্যাপার আছে অবশ্য; যেমন, বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা চালাবার একচেটে অধিকার দলের ছাত্রশাখার কোন্ উপদলের ওপর থাকবে, অথবা কেই বা গণটোকাটুকির ব্যবস্থা করার দক্ষিণা পাবে; কিংবা যুবশাখার কোন্ অংশ বারোইয়ারি পূজো উপলক্ষে লোকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক চাঁদা তোলার ভার পাবে, ইত্যাদি। গুজবে প্রকাশ যে এক উপদল নাকি ২৪ পরগনা আর নদীয়া জেলার উদ্বাস্তু কলোনিগুলোর মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা চালাবার অধিকার চেয়েছে। এটা অবশ্য এখনও অসমর্থিত তথ্য; তাছাড়া, গুজবে কান দেবেন না, গুজব যে শুধু জনগণের নৈতিক বলের পক্ষে হানিকর, তা-ই নয়, সে আবার দেশে সমাজতন্ত্র এগিয়ে আনা আর গরিবি হঠানোর শুভকাজকে পেছিয়ে দেয়।

৯
কমল বসুর মুক্তিলাভ

এই-যে দেখুন কমল বসুকে, প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র, সাকিন ১১ সূর্যকুমার চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ; পেশা : ৩৭ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-স্থিত চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের সমাজকল্যাণ কর্মী ; বেতন ও অন্যান্য ভাতাসহ মাসিক উপার্জন সাকুল্যে ৩৪৩ টাকা ৪৫ পয়সা ; ভারতের নাগরিক ; বসু স্বয়ং, তাঁর স্ত্রী এবং দু-বছরের শিশুসহ পরিবারটির তিনিই কর্তা।

৮ জানুয়ারি ১৯৫৫-এর সকাল অব্দি কমল বসু নেহাৎই সাধারণ ছা-পোষা মানুষ, আইনশৃঙ্খলার রক্ষকদের সঙ্গে তাঁর কখনো কোনো সংঘর্ষ হয়নি ; কখনো তার নামে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরোয়নি, অথবা কোনো মামলা নিয়ে পুলিশ তাঁকে কখনো জেরা বা জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। সেই দুর্ভাগা সকাল থেকে অবশ্য সবকিছুই পালটে গেল, কমল বসু তাঁর স্বাধীনতা হারালেন ; তাঁকে গ্রেফতার করা হল দুটি ফৌজদারি মামলার সূত্রে। মোকদ্দমা নং টি/৪৫৪/৭২ তাং ১৯ অক্টোবর ১৯৫৫ এবং মোকদ্দমা নং টি/৫/৭৩ তাং ৭ জানুয়ারি ১৯৫৫ ; দুটি মামলাই দায়ের করেছেন কলকাতার ভবানীপুর থানার ও. সি.। কমল বসুকে যথারীতি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হল, তিনি দুটি মামলারই বয়ান শুনে তাঁকে জামিনে অব্যাহতি দিলেন। কমল বসু, কিন্তু যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেলেন—অর্থাৎ হাজতে—কারণ জামিননামা জমা দেবার আগেই টালিগঞ্জ থানা তাঁর বিরুদ্ধে আরো দুটি ফৌজদারি মামলা নিয়ে হাজির : মোকদ্দমা নং ইউ/সি ৬৪৭ তাং ১৯ অক্টোবর ১৯৫৫, এবং মোকদ্দমা নং ইউ/সি ৬৫০ তাং ২০ অক্টোবর ১৯৫৫। আবারও এক

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জামিনের আরজি পেশ করা হল। জামিন মঞ্জুর হল, আবার টাটকা জামিননামা পেশ করার পর, পুলিশদের মধ্যে ভাই-বেরাদারি যেমন হয়েই থাকে, এবার নারকেলডাঙা থানার অকুস্থলে অনুপ্রবেশ : নারকেলডাঙা থানার ও. সি-র নির্দেশে তাঁকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল, হুকুমনামা পি এস পি (৩)-২৫৭ তাং ২৪ জানুয়ারি ১৯৫৫-এর বলে।

গণতন্ত্রের শত্রুরা বিবিধ অপপ্রচার করলে কী হবে, আমাদের দেশে ন্যায়বিচারের রথচক্র কিন্তু অক্লান্ত ও নিরন্তর গড়িয়েই চলে। এই তিনটি পূর্বোক্ত থানার অতীব-পরিশ্রমী কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশরা যেহেতু কোনো প্রমাণই উপস্থাপিত করতে পারলেন না—অর্থাৎ ভবানীপুর (কলকাতা মধ্য-দক্ষিণ), টালিগঞ্জ (নগর দক্ষিণ) এবং নারকেলডাঙা (কলকাতা উত্তর-পশ্চিম)—কমল বসু তাঁর বিরুদ্ধে রুজু-করা পাঁচ-পাচটি মামলা থেকেই বেকসুর খালাশ পেলেন। তাঁকে কিন্তু তাই বলে হাজত থেকে ছাড়া হল না, কারণ কলকাতার পুলিশ কমিশনার ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন যে তিনি তাঁর বিশেষ বিবেচনা প্রয়োগ করবেন : হুকুমনামা ৪৯ (এম) তাং ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ প্রদত্ত অধিকার বলে 'এই ব্যক্তি (কমল বসু) যাতে কোনোক্রমে শৃঙ্খলা রক্ষার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার কাজ করতে না পারে', এই উদ্দেশ্যে উপধারা (১) (ক) (২) যুগপৎ উপধারা (২) ও ১৭ ক ধারা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবিধি (মিসা), ১৯৫৫ (বিধি ২৬, ১৯৫৫), কমিশনার ফরমান পাঠালেন যে কমল বসুকে হাজতেই থাকতে হবে। ৩নং ধারার উপধারা (৩)-এর শর্ত অনুযায়ী পরে রাজ্যসরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, গোয়েন্দাশাখা (নং ২৮০৩ এইচ-এস, তাং ৭ মার্চ ১৯৫৫) মারফৎ অনুমোদন পাঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কমিশনারের নির্দেশ মঞ্জুর করলেন।

দেশের সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী হেবিয়াস করপাসের (কয়েদীকে সশরীরে আদালতে হাজির করে তাকে কয়েদ করার কারণ দর্শাবার নিয়মপত্র) পরোয়ানায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র এবং তাঁর সহ-বিচারপতিদের এজলাশে একটি আরজি

পেশ করা হল। ফৌজদারি আদালতের অনন্যসাধারণ মৌলিক ও আদিম এক্তিয়ারে যখন সশরীর হাজিরার আরজি বিবেচনা করা হচ্ছে, তখন অধিকন্তু ন দোষায়-ই শুধু নয় অধিকন্তু প্রমোদায় এই আর্যবাক্য অনুযায়ী পুলিশ কমল বসুকে নগরীর অতিরিক্ত চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করে আরো-একটা মামলা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ঃ নং এ ১১৯, তাং ১৫ মার্চ ১৯৫৫। এই মামলাতেও কমল বসুর জামিন মঞ্জুর করা হল ঃ কিন্তু যেহেতু তিনি মিসায় আটক আছেন, সেক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য, অতিরিক্ত চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের মঞ্জুর-করা জামিন কাজে খাটাবার কোনো কথাই ওঠে না ঃ কমল বসু কলকাতার জমকালো কারাগার প্রেসিডেনসি জেলে পচতে লাগলেন।

এদিকে, ১৯৫৫, ১৯ এপ্রিল দেশের সুপ্রীম কোর্ট চাকার মধ্যে হঠাৎ একটা কীলক ঢুকিয়ে দিলে। শম্ভুনাথ সরকার বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অন্যান্য—এই মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট মিসার ১৭ (এ) ধারাটিতে এই বলে আঘাত হানল যে তা সংবিধানের ২২ (৭) (এ) বিধিটির অমান্য করেছে। ১৮ মে ১৯৫৫ কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ—এস. কে. ভট্টাচার্য ও এস. বসু—কলকাতার পুলিশ কমিশনার, কলকাতার প্রেসিডেনসি জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (গোয়েন্দা) দপ্তরের সরকারি সচিবকে নির্দেশ দিলেন সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমল বসুকে 'অবিলম্বে' মুক্তি দিতে। মাননীয় বিচারপতিরা নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই দিনই প্রেসিডেনসি জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্টকে এই আদেশ বিশেষ হরকরা মারফৎ পৌঁছে দিতে। বিশেষ হরকরা হুকুমনামাটি নিয়ে জেলের ফটকে এসে পৌঁছেছিলেন বিকেল ৫ টা ১০ মিনিটে; কিন্তু কমল বসুকে ছেড়ে দেয়া হল না, হাইকোর্টের হুকুম সেদিন আর পালন করা যাবে না ঃ কমল বসুকে, মসৃণভাবে বুঝিয়ে দেয়া হল, এর মধ্যেই নাকি রাতের জন্য হাজতে পাঠানো হয়ে গেছে।

১৯ মে ১৯৫৫-এর সকাল হল। পুলিশ কমল বসুকে প্রেসিডেনসি জেল থেকে বার করে নিয়ে অপেক্ষমাণ কালো ভ্যানে চাপিয়ে লর্ড সিন্‌হা

ব্যবস্থা করলেন, যাতে প্রতিবাদী হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্বরাষ্ট্র (গোয়েন্দা) দপ্তরের সহকারী সচিব, কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোয় যে-তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে, মহামান্য আদালতে সে-সব পেশ করা হল, সেইসঙ্গেই এই অনুনয় করা হল যে পুলিশ বিশ্বাসহন্তার মতো কাজ করছে, এবং তাদের উদ্দেশ্য যতদিন-সম্ভব বিনা বিচারে কমল বসুকে আটকে রাখা। আবেদনে বলা হল পুলিশ এবং অন্যান্য প্রতিবাদীদের পুরো অভিসন্ধিটাই হচ্ছে যে আবেদনকারীকে মামলার পর মামলায় জড়িয়ে রাখা, যাতে তিনি আদালতে জামিনের মঞ্জুরি পেলে বা বেকসুর খালাস পেলেও, তা কোনো কাজে না-আসে। এও বুঝিয়ে বলা হল যে কর্মপদ্ধতি একটি পরম্পরা মেনে চলেছে : পূর্ববর্তী মামলায় জামিন মঞ্জুর হবার পরেই, অতর্কিতে, আস্তিন থেকে আরেকটি মামলা বার করে আবেদনকারীকে আবার জড়ানো। সেই জন্যেই বসু বললেন, এ-বিশ্বাস তাঁর যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে কড়েয়া থানার মামলায় জামানত জমা দেবামাত্র—এই দীর্ঘ পর্যায়টিকে এখনো পর্যন্ত সেটাই সর্বশেষ মামলা—তিনি আবার কোনো নতুন দুষ্কর্মের অজুহাতে গ্রেফতার হয়ে যাবেন ; এমতাবস্থায় তিনি প্রার্থনা করছেন যে আবার যদি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, মহামান্য আদালত যেন তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিয়ে রাখেন।

আবেদনটি শুনলেন মাননীয় বিচারপতি এন. সি. তালুকদার এবং এ. এন. ব্যানার্জি। গ্রেফতার ও পুনর্‌গ্রেফতারের এই মহাকাব্যটি শোনবার পর মাননীয় বিচারপতিরা কৌঁশুলিকে পরামর্শ দিলেন যে বসু না-হয় আরো-একবার জামিন দিয়েই দেখুন : যেহেতু বিচারপতিগণ পুলিশের প্রতিনিধির কর্ণগোচর করেই কথাটি বলছিলেন, বসু হয়তো আবার নিজেকে—এবং পুলিশকে—আরো একটি সুযোগ দিয়ে মহামান্য হাইকোর্টে ফিরে আসতে পারবেন।

কমল বসু ও তাঁর কৌঁশুলি সশ্রদ্ধ চিত্তে মহামান্য আদালতের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। জুলাই ১৯৭৩-এ কড়েয়া থানার মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট

যে-জামিন দিয়েছিলেন, সেই জামিনের টাকা ১৪ মে ১৯৭৪এ জমা দেয়া হল। বসু জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেন, ষোল মাসের মধ্যে এই প্রথমবার তিনি একজন মুক্ত মানুষ। পুলিশ, সম্ভবত, এখনও অনুধাবন করার চেষ্টা করছে মাননীয় বিচারপতিদের রায়ের মর্মার্থ কী, এবং তাঁকে যেতে দিয়েছে।

এইভাবেই, আপাতত, শেষ হল কমল বসুর মুক্তিলাভের উপাখ্যান। কিন্তু কবে যে কী হয় কে বলতে পারে? এই সংবিধান অনুযায়ী জীবন ও বেঁচে-থাকা এতটাই দৈবনির্ভর হয়ে উঠেছে যে আমরা, ভারতের জনগণ—আমরা সশ্রদ্ধভাবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সব নাগরিক অধিকার দিতে চেয়েছিলুম ন্যায়বিচারে—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারে; চেয়েছিলুম চিন্তা, বাক্, মতবাদ, ধর্মবোধ সবকিছুর স্বাধীনতা, সকলের সমান অধিকার ও মর্যাদা, আর ব্যক্তির সম্মান ও জাতির ঐক্যবোধ; আমরাই ১৯৪৯ সালের ২৪ নভেম্বর আমাদের ব্যবস্থাপক সভা গঠিত করে এই সংবিধান রচনা করে তবেই তার হাতে নিজেদের সমর্পণ করেছি।

এই টুকরোটা যখন লেখা হচ্ছে, কমল বসু এখনও স্বাধীন আছেন—কিন্তু ডলি বেচারির উৎকণ্ঠার শেষ নেই। আমাদের এই মহান প্রজাতন্ত্রে, এই লেখাটা ছাপা হবার আগেই হয়তো তাঁর স্বামী আবার গ্রেফতার হয়ে যাবেন। এবার ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন্ ধারায়—৩০২, না ৩০৪, না কি ৪৭৬—ডলি তা জানেন না: কাশীপুর, না বড়োবাজার, না কি মুচিপাড়া থানার ও. সি.—কে এই অভিযোগ দায়ের করবেন, তাও তাঁর জানা নেই। ডলি বসু কোনোদিন ফ্রান্‌ৎস কাফকা পড়েননি, কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্বামী দুজনে মিলে এমন-সব উপাদান এখন জোগাতে পারেন যে এই অভিনব রচনার কাছে স্বয়ং কাফকাও ম্লান হয়ে যাবেন।

এদেশে যাঁরা জেলখানার বাইরে জীবন অতিবাহিত করতে চান, তাঁরা অবহিত হোন; স্বাধীনতা আসলে তা-ই, যা আপনার সরকার ও পুলিশ মাঝে-মাঝে আপনার ওপর ন্যস্ত করতে পছন্দ করবেন।

১০

ফ্যাশিবাদ চলবে না

খবরের কাগজ পড়েন না নাকি, মশাই, জানেন না এদেশে ফ্যাশিবাদ চলবে না? এখানে সব সুস্থবুদ্ধি মানুষই ফ্যাশিবাদের বিরোধী। সাফ করার জন্য বিখ্যাত পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মন্ত্রী তো বলেই দিয়েছেন যে ফ্যাশিবাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য তিনি চরম ত্যাগ স্বীকারেও রাজি: তিনি নিজেই পুরোদস্তুর ফ্যাশিস্ট বনে যাবেন। এবং অন্য যে ফ্যাশিস্টরা সরকারকে মিছিমিছি নিন্দা করতে সাহস পায়, পরিচিত উপায়ে তাদের দমন করবেন। ফ্যাশিবাদ চলবে না।

ফ্যাশিবাদ চলবে না। সংবাদপত্রগুলিতে রোজই খবর বেরোয়, দেশের চরিদিকে সভাসমাবেশে গণতন্ত্রের অগ্রদূতেরা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন, ফ্যাশিস্টদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন: এর বেশি আর এগিয়ো না। দেশবাসীর বিবেক জেগে উঠেছে, ফ্যাশিবাদ আর অগ্রসর হতে পারবে না। বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্তরে সংগঠন চলেছে: শিক্ষক, ছাত্র, মজদুর, কিষান, বিজ্ঞানী, কারিগর, কবি—যে নামই করুন, সবাই ফ্যাশিবাদের বিপক্ষে। ইদানীং রাজধানীতে আইনজীবীরা এগিয়ে এসেছিলেন। এক তুমুল সমাবেশে ঐ পেশার সদস্যরা ঘোষণা করলেন যে তাঁরা ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে, এবং গণতন্ত্র ও প্রগতির দলে। প্রধানমন্ত্রী সেখানে ভাষণ দিলেন। তাছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশের জনৈক ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি, যিনি এখন ল-কমিশনের সভাপতিও বটে, এবং সুপ্রীম কোর্ট ও দিল্লি হাইকোর্টের বৃত্তিভোগী একদল বিচারক। যে যার সারিতে চলে আসুন, আমাদের দলে যারা থাকবে না তারাই আমাদের বিপক্ষে, আমাদের দলে যারা থাকবে না, তারাই ফ্যাশিস্ট।

ফ্যাশিবাদ চলবে না। ব্যাপার যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে কিছুদিন অপেক্ষা করলেই দেখবেন পুলিশদের প্রগতিশীল অংশও ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সভা ডাকছে।

কলকাতার দক্ষিণ-প্রান্তে টালিগঞ্জ এলাকায় একটি ছোট্ট গলি বাবুরাম ঘোষ রোড। শহরের অন্য যে-কোনো নোংরা গলির মতোই সেখানে বস্তি, ভরে ওঠা ড্রেন, মানুষ ও জন্তুর মলমূত্রের দুর্গন্ধ, রাস্তাগুলির জীর্ণদশা, ফুটপাথ নেই বললেই হয়, সারি-সারি ঘিঞ্জি পাকা বাড়ি, ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। এরকম প্রত্যেক বাড়িই ছোটো ছোটো খুপরিতে ভাগ করে ভাড়া দেওয়া, সেগুলি আলোবাতাসহীন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা কিছুই নেই, বারো ঘরের একটি নামেমাত্র উঠোন, তাও সেখানে সারাবছর উই আর আরশোলার বাসা। যে নড়বড়ে, চলিষ্ণু দারিদ্র্য-সীমার কথা অর্থনীতিবিদ্‌রা বলে থাকেন, মুদ্রাস্ফীতির দরুন তার কী হাল হয়েছে যদি দেখতে চান, তাহলে নাকে রুমাল চেপে এ-রকম একটি এলাকা ঘুরে দেখতে পারেন। যে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ এইসব বাড়ির বাসিন্দা, তারা জীবনযুদ্ধে কেবলই হারছে; দাম বাড়ে, কিন্তু সদাশয় সর্বজ্ঞ সরকার বাহাদুর এদের বেতন একই জায়গায় স্থাণু করে রেখে দেন, ফলে তারা এক পা দু-পা করে অপুষ্টি ও অনাহারের দিকে চলেছে। এই তাদের ভাগ্য; ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক অধঃপতন তাদের মেনে নিতে হচ্ছে। ষাটের দশকে এইরকম কোনো-কোনো গৃহস্থ—বেশির ভাগই যাঁদের সরকারি বা বেসরকারি অফিসের কেরানি—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঢুকে বেতন বাড়ানোর লড়াইএ যোগ দেবার দুঃসাহস দেখান। আজ ফ্যাশিবাদ আর চলবে না বলে সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডারা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া পণ্ডিতেরা তাঁদের বুঝিয়েছেন, তাঁদের দাবিদাওয়াগুলি অর্থনৈতিক স্তরেই সীমিত, কেননা এমন-কি তাঁরাও দেশের সর্বাধিক সুবিধাসম্পন্ন শতকরা দুই ভাগ মানুষের দলে পড়েন।

এই জ্ঞানলাভের পরও বাবুরাম ঘোষ রোডের ওই ঘুপচি বাড়িগুলির মধ্যে যদি অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তবে তার কোনো ক্ষমা

নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অর্থনীতিবিদ্‌দের ভুল প্রমাণিত করে বাবুরাম ঘোষ রোডের ওপরেও প্রাণের অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে। ঐ অন্ধকার ঘিঞ্জি দম-আটকানো খোপগুলির মধ্যে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন সদানন্দ রায়চৌধুরী ; আদি নিবাস পূর্ববঙ্গ, জমিদার বংশের সন্তান, যদিও আজ বিষয়সম্পত্তি বলতে সামন্ততান্ত্রিক অতীতের নিদর্শন খেতাবটিই কেবল অবশিষ্ট আছে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, পশ্চিমবঙ্গের অ্যাকাউট্যাণ্ট জেনারেলের অফিসে একজন কেরানি সদানন্দবাবু অনেকদিন হল উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে ছেঁটে কেটে রাখতে শিখে গেছেন। কেরানি তো কেরানিই। তার আবার স্বপ্ন দেখা কিসের ? তাঁকে রোজ বিকেলে নিরীহভাবে বাড়ি ফিরতে হবে। নিঃশব্দে ক্ষয়ে যাওয়ার শিক্ষা নিতে হবে। তবু প্রাণের অঙ্কুর মাথা চাড়া দেয়। সদানন্দবাবুর পরিবারটি ছোটো। স্ত্রী আর দুটি কিশোর ছেলে, প্রদীপ ও প্রবীর। দুটিই বুদ্ধিমান, চটপটে, প্রাণবন্ত ছেলে। অপুষ্টি আর বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা তাদের ঠেকাতে পারে না, প্রাণের অঙ্কুর সতেজ হয়। ছেলেরা বড়ো হবার সঙ্গে-সঙ্গে পরীক্ষায় ভালো করে, প্রতিবেশীদের ভালোবাসা আকর্ষণ করে।

ছেলে দুটি বড়ো হল। বড়ো ছেলে প্রদীপ কঠিন প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জায়গা পেল। ছোটো প্রবীর আরো ভালো করল, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি পেয়ে বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকার সুযোগ পেল সে। সদানন্দ ও তাঁর স্ত্রীর এই সবকিছুর জন্য কৃতার্থ বোধ করারই কথা। একজন কেরানির অবশ্য বেশি স্বপ্ন দেখা উচিত নয়। তবু দুটি ছেলেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কাজেই বাবুরাম ঘোষ রোডের সীমিত আকাশ ছাপিয়ে আশার আলো ফুটে উঠছিল।

কিন্তু এখানেই গোল বাধল। পরিপার্শ্ব থেকেই বিবেক গজায়। প্রদীপ ও প্রবীরের মত বুদ্ধিমান, সজাগ, মেধাবী দুটি ছেলের পক্ষে পরিপার্শ্বকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। যাদের বয়স কম, অনুভূতিকে তারা অবজ্ঞা করতে পারে না। সমাজের বাস্তবতা মাঝে

এসে দাঁড়ায়, এবং কাহিনীর বাকিটা এতই পরিচিত যে বস্তাপচা বাঁধা বুলির অংশ বলে মনে হতে পারে। সংক্ষেপে, ওদের ছাত্রজীবনে আকস্মিক ছেদ পড়ে, তিনবছরের কিছু বেশি হল দুই ভাইকেই পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। এ. জি. বেঙ্গলের আপার ডিভিশন ক্লার্ক সদানন্দ রায়চৌধুরীর স্বপ্ন এই-মাঝপথেই শেষ হল। সদানন্দবাবু ও তাঁর পরিবার ব্যতিক্রম নন। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ছোট শহরের দরিদ্র এলাকা ও কলোনিগুলিতে খোঁজ নিলে এঁদের মত হাজার-হাজার মা বাপ পাওয়া যাবে যাঁদের স্বপ্ন এইভাবে মাঝপথে ভেঙে গেছে ; এদের গুণে শেষ করা যাবে না। আমাদের বই-পড়া অর্থনীতিবিদ্‌রা বলবেন, যে-সব হতভাগ্য কেরানি সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, তারা নিছক অর্থনীতি-ভিত্তিক মনোভাবেরই একটা ধরনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, এটা তারই যোগ্য প্রতিফল। এদের ওপর অযথা সহানুভূতি খরচ করবেন না, ইতিহাসকে তার নির্দিষ্ট পথে চলতে দিন।

হ্যাঁ, নৈর্ব্যক্তিক হওয়া দরকার, প্রদীপ ও প্রবীরকে তো আলাদাভাবে দেখা যাবে না, হাজার-হাজার তরুণ কলেজের ছাত্রকে গত পাঁচ বছরে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, তারা বিনাবিচারে বন্দী হয়ে আছে। না-হলে এদেশে গণতন্ত্রের কোনো নিরাপত্তা থাকত না। এইসব তরুণদের মধ্যে খুব অল্পজনের নামেই খোলা আদালতে মামলা দায়ের করা আছে। সদানন্দের ছেলে দুটিরও একই দশা হল। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী ঘটনাগুলি ঘটল একটু অন্যভাবে, এই কারণেই এই পাদটীকার কিছু পরোক্ষ প্রয়োজন ছিল। বড় ভাই প্রদীপ গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন পরেই রহস্যজনকভাবে পুলিশ হেফাজতে মারা যায়। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে তাকে দিনের পর দিন জেরা করা হচ্ছিল। হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটল, শোনা যায় গুরুতর আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের ফলে। আমাদের দেশপ্রেমিক পুলিশের কাছে কোনো প্রশ্ন করবেন না। তাহলে আপনাকে মিথ্যে কথাও শুনতে হবে না। দুষ্ট লোকে বলে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জেরা করার একটি পর্যায়ে তার শরীরের ওপর একটি শক্ত কাঠের তক্তা রেখে স্পেশাল ব্রাঞ্চের মুশকো জোয়ানরা একের পর এক তাতে চড়ে

উদ্দাম নাচ নাচে। উপর্যুপরি ছ-সাতবার এই দাওয়াই প্রয়োগ করা হয়, প্রতিবার প্রায় পাঁচ মিনিটকাল ধরে নৃত্য চলে। সারারাত চললেও কিছু বলার ছিল না, কিন্তু তার দরকার হয়নি। একই সূত্র থেকে জানা যায়, প্রদীপের পাঁজরা এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একেই বোধহয় তাণ্ডব নৃত্য বলে।

যাক, যা হবার হয়ে গেছে। আমাদের প্রগতিশীল ফ্যাশিবিরোধী সরকারের হেফাজতে থাকাকালীন দুর্ঘটনায় প্রদীপের মৃত্যু ঘটেছে। সদানন্দ ও তাঁর স্ত্রীর কিন্তু আরো একটি ছেলে তখনও ছিলো ; প্রেসিডেনসি কলেজের বৃত্তিভোগী ছাত্র প্রবীরকে গ্রেফতারের পর প্রেসিডেনসি জেলে রাখা হয়, আদালতের সামনে তাকে কোনোদিনই হাজির করার সম্ভাবনা ছিল না। কয়েক সপ্তাহ আগে আরো কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে তাকে হাওড়া জেলে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ওরা মে, শনিবারের ভোরবেলা সূর্য তখনও ওঠেনি, বাবুরাম ঘোষ রোডে তখনও বাসি ময়লার পাহাড় জমে আছে, গ্রীষ্মকালীন স্নিগ্ধ হাওয়া বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে হুগলি নদীর ওপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে, এই সময় হাওড়া জেল থেকে কয়েকবার গুলির শব্দ ভেসে এলো! প্রশ্ন করবেন না। তাহলেই আপনি ফ্যাশিবাদী। সরকারি গল্প এক এবং অপরিবর্তনীয় ; কয়েকজন 'উগ্রপন্থী' বন্দী পাহারাদারদের আক্রমণ করে পালানোর চেষ্টা করে। পাহারাদাররা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায়, প্রবীর রায়চৌধুরী সহ পাঁচজন বন্দী নিহত। বলা হচ্ছে পালানোর সময় রক্ষীরা তাকে গুলি করে, কিন্তু যারা তার মৃতদেহ দেখেছে তাদের জিগ্যেস করুন, প্রবীরের রগে, কপালে, শ্বাসনালীতে ও পেটে গুলির দাগ ছিল। তাছাড়া পুরো শরীরটা এমনভাবে ফুলে উঠেছিল যাতে সন্দেহ হয় যে তার উপর পুলিশি লাঠির প্রচণ্ড প্রহার পড়েছিল। লাঠির ঘা আগে পড়েছিল, না রিভলভারের গুলিই আগে লেগেছিল—এই ধাঁধার সমাধান পরেও করা যাবে। সমাধানটার অবশ্য কার্যকরী অর্থ কিছুই থাকবে না ; যাই ঘটে থাকুক, প্রবীর মারা গেছে।

যাহোক, ব্যাপারটার একটা ভালো দিকও আছে। সদানন্দবাবু ও

তাঁর স্ত্রীর দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ছেলেদের জন্য আর তাঁদের দুশ্চিন্তা করতে হবে না, তারা দুজনেই মারা গেছে; দেশপ্রেমিক, মহদাশয় সরকার বাহাদুর তাদের যোগ্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঈশ্বর যা দিয়েছিলেন, দেশের সরকারই তা নিয়েছেন। এভাবেই দায়িত্বের সঠিক বণ্টন হয়! যদি আপনার সন্তান থাকে, এমন সন্তান যাদের ঘিরে আপনার সব স্বপ্ন, যারা আপনার চোখের মণি, যাদের ব্যবহার সুন্দর, যারা মেধাবী এবং সংবেদনশীল, তাহলে তাদের নিরাপত্তার জন্য আপনার ফ্যাশিবিরোধী সরকারের হাতে তাদের তুলে দিন—যে-সরকার বেআইনি কাজ করেও না, করতে দেয়ও না। তাহলেই আর কোনোদিন আপনি তাদের দেখবেন না, আপনার জগতে শান্তি বিরাজ করবে।

ফ্যাশিবাদ চলবে না। রোজই বিবেকসম্পন্ন মানুষদের আয়োজিত আরো-একটি ফ্যাশিবিরোধী সম্মেলনের কথা কানে আসে। জাতীয় ল কমিশনের সভাপতি, সুপ্রীম কোর্ট ও দিল্লি হাইকোর্টের বিচারকরা জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা কোন্ পক্ষে থাকবেনঃ তারা ফ্যাশিবাদের বিরোধী, ফ্যাশিবাদ চলবে না। কিন্তু মনে করুন, সদানন্দবাবুর শোকে উন্মত্তপ্রায় স্ত্রী যদি একটি মানুষগাদাই ট্রেনে চড়ে রাজধানীতে গিয়ে হাজির হন, যদি সেপাইশান্ত্রীদের চোখ এড়িয়ে কোনোক্রমে ঐ ফ্যাশি-বিরোধী আইনজ্ঞদের জ্যোতিষ্কমণ্ডলে ঢুকে পড়েন এবং তাদের সামনে একটি চেয়ারে বসে টেবিলের ওপার থেকে নিষ্পলক চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাহলে এ-দেশে আইনের অনুশাসনের যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁরা কি করবেন? তাঁরা কি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন মুখে তাঁকে জানিয়ে দেবেন, যে তাঁর দুটি ছেলের কপালে যাই ঘটে থাকুক, ফ্যাশিবাদ চলবে না? সেটা তাঁরা পারবেন কি?

১১
সত্যমিথ্যা

মিথ্যা কথা দিয়ে আমরা যেন নিজেদের না-ভোলাই। ভাষার কোনো হেরফের হয় না, কারণ খবরগুলো সবসময়েই আসে একটা সূত্র থেকেই। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনজন ভয়ংকর 'চরমপন্থী' গুলিতে নিহত, বারোজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সীমান্তরক্ষীরা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছিল, তাতে পাঁচজন আহত হয়—তার মধ্যে তিনজন বাঁচেনি; দুজন জেল ভেঙে পালানোর সময় মারা পড়ে, পরিত্যক্ত বাড়িতে জনৈক চরমপন্থীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। দিনের পর দিন পুলিশের মুখপাত্রের কাছ থেকে এইসব খবর আসে সংবাদপত্রের অফিসে, দিনের পর দিন পত্রিকাগুলি বিশ্বস্তভাবে তার অনুসরণ করে। মৃতদেহের কাছ থেকে তো আর কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া যাবে না।

পুলিশ যাকে ঠাণ্ডামাথায় খুন করেছে, তাকে যদি 'চরমপন্থী' বলে বর্ণনা করা হয়, তাহলে সেটা তো বর্ণনামাত্র। আইনশৃঙ্খলার রক্ষকেরা আরো-একটি জীবনকে বাজেয়াপ্ত করে মৃতদেহটাকে একটা বদনাম দিয়েছে, এইটুকুই শুধু বলা চলে। শবটিকে 'চরমপন্থীর' শব বলাটাই যথেচ্ছ গুলি চালানোর একটা বিলম্বিত ওজর। ষাট কোটি মানুষের এই দেশে মানুষের প্রাণ একটা সস্তা জিনিস, প্রাতরাশের আগে দুটি, দুপুর পর্যন্ত গোটাচারেক, সূর্য ডোবার আগে আরো দু-তিনটে শরীরে গুলি চালান না। আত্মা ক্ষান্তি চায়। পুলিশের শিকার আমি না-হলেই হল, অন্য কেউ যদি হয়, তা নিয়ে মাথা ঘামানো আমি ছেড়ে দিই। যে কাচ্চাবাচ্চাগুলোর প্রাণ যাচ্ছে, তারা তো খুব ভালো কাজ করছিল না, আর তাছাড়া তাদের জন্মই হয়েছিল বাপ-মার অবিবেচনাবশত পনেরো

কুড়ি, পঁচিশ বছর আগে। জন্মদাতাদের নির্বুদ্ধিতার জবাবদিহি তো তাদেরই করতে হবে। কনিষ্ঠদের নিকেশ করার জোর মরশুম চলছে, সারাদেশটাই আজ একটা মশান। সরকারি তত্ত্বাবধানে যদি সবকিছু পরিচ্ছন্নভাবে সংগঠিত হয়, সে তো খুব ভালো কথা।

সাধারণ থেকে বিশেষে আসার জন্য দীর্ঘসূত্রিতার দরকার নেই। তবু দু-একটা জটিল ঘটনা আমাদের সময়ের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ না-থাকলে লজ্জার বিষয় হবে।

ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২০শে জুলাই। তেইশ বছরের প্রবীর দত্ত একটি বেকার যুবক। বাবা শয্যাশায়ী, মা লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনে চাকরি করেন, ছোটো ভাই স্কুলে পড়ে, বোনটি আরো ছোটো। খুবই পরিচিত একটি ছকে পড়ে এই পরিবারটি ; পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল তারা, মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, প্রত্যহ আরো চূড়ান্ত দুর্দশায় মজ্জমান, প্রতিটি সপ্তাহই ঘনায়মান অর্থনৈতিক সংকটের আরো একটি চরম পর্যায়, কাজকর্মে ঠাসা বিরাট এক শূন্যতা, হিসেব মেটানো যাচ্ছে না, আশার দিগন্ত সংকুচিত হয়ে আসছে, তিক্ততা উত্তাল। বড়ো ছেলে প্রবীরকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমন ভালো ছাত্র নয় সে, কলেজের খাতায় নাম থাকা একটা বাজে খরচ হত, তাছাড়া বিশেষ কিছু শেখানোও হয় না সেখানে ; পরীক্ষাগুলি তো উপহাসে পরিণত। সুতরাং প্রবীর যে-কোনো হাতের কাজও শেখেনি—তার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষীণ দাবিতে ইতস্তত চাকরির খোঁজ করে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুর বাবাদের কাছে জানতে যায় কোথাও ঢোকার সম্ভাবনা আছে কিনা, তাও নেহাৎ বিক্ষিপ্তভাবে, আশাভরে নয়, চাকরি নেই জেনেও খুঁজে যেতে হবে এইটেই তাকে পাখিপড়ানো করা হয়েছে বলে, এটা তার নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়াগুলির অন্তর্গত বলে। মনে মনে নিশ্চয়ই সে আবছা-ভাবে বুঝেছিল যে, সে পরিসংখ্যানের অন্তর্গত একটি তুচ্ছ বিন্দুমাত্র। শুধু কলকাতা শহরেই তার-মতো আরো লাখদুয়েক আছে, যারা চাকরি খুঁজছে, কিন্তু না আছে তাদের পেশাদারি শিক্ষা, না আছে কোনো সামাজিক, তথা রাজনৈতিক, যোগাযোগ। এইসব ছেলেদের দিন কাটে

ঘুরে ঘুরে। প্রায়ই উদ্দেশ্যহীন ঘোরা। সময় তাদের কাটতে চায় না। একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কেউ কেউ কবিতা লেখে, প্রায়ই তা জোলো আর বৈশিষ্ট্যহীন। প্রবীরও কবিতা লিখত। কেউ গান রচনা করে এবং গায়। প্রবীরও তা করত—কখনো কখনো। যারা কবিতাও লেখে না, গানও গায় না, তারা হেমামালিনী বা মৌসুমী চ্যাটার্জির সঙ্গে কাল্পনিক প্রমোদ বিহারে যাবে বলে ক্বচিৎ মা বা দিদির কাছ থেকে পয়সা আদায় করে; কিংবা চাকু চালানো রপ্ত করে যুব কংগ্রেসে ভিড়ে যায়। ঐ দরজাতেও ইদানীং বড়ো বেশি প্রবেশার্থীর ভিড়; এমন-কি অপরাধজগতেও শুধু দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই আছে। প্রবীর শহরের অপরিষ্কার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, প্রায়ই উদ্দেশ্যহীন-ভাবে। তার কোনো রাজনৈতিক মতামত ছিল কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে, তার কবিতা লেখার দুর্বল প্রচেষ্টাগুলি আবেগপ্রবণ, তাতে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের চিহ্নও নেই। ২০শে জুলাই ছিল শনিবার। প্রবীর সকাল সাড়ে ন-টায় ভাত খেয়ে মধ্য কলকাতার ভবানীপুরে তাদের ঘিঞ্জি দু-ঘরের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায়। সে হাঁটছিল। দিনটা ছিল শনিবার। যে অফিসগুলো ঐদিন পুরো বন্ধ না থাকে, সেগুলিও টিফিনের সময়ের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায়। শহরের ঠিক বুকের মাঝখানে, চৌরঙ্গি রোড যেখানে লেনিন সরণিতে গিয়ে পড়েছে, সেখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে, একদিন যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'এসপ্লানেড'; এখন সেখান দিয়ে শুধু ট্র্যামগুলো ঘুরে যায়। এই জায়গাটার এক কোণে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ একটু ঘেসো জমি আছে, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তার নাম ছিল কার্জন পার্ক; পরে সুরেন্দ্রনাথ পার্ক নাম হয়ে যায়। সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যে ছিলেন সেই বিখ্যাত বাগ্মী; স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ টোরি গভর্নর-জেনারেলের নামকে সাড়ম্বরে উৎখাত করা হয়েছিল এক বাঙালি বাক্যবাগীশের নাম দিয়ে। কিন্তু পুরোনো নাম থেকেই গেছে। গত ত্রিশ বছরে কার্জন পার্ক আয়তনে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ একচিলতে জমিতে বিধ্বস্ত বা বিধ্বস্ত নয় এমন-সব রকমের মানুষকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। হরেক রকম

পশারি, ছাত্র, তরুণ কলেজশিক্ষক, ভিখিরি, কুষ্ঠরোগী, বেশ্যা, জুয়াচোর, গাঁটকাটা, ঠগ, দালাল, ভেলকিওয়ালা, ঘরে ফেরার মুখে কেনাকাটায় ব্যস্ত কেরানি, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কবি, ডজন ডজন প্রেমিক প্রেমিকা—এরা জায়গাটাকে একটা চরিত্র দেয়, একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে, নিজস্ব রাজনীতি যুক্ত একটা সমাজ বসায়, সমতার একটা অভাবনীয় শৈলী গড়ে তোলে। কার্জন পার্কে সবই তাৎক্ষণিক, কিন্তু কী করে যেন সবকিছুই একটা পূর্বনির্ধারিত ছাঁদে পড়ে যাচ্ছে, এ-রকম প্রতীয়মান হয়। শেষ ট্র্যামগাড়িগুলো যখন গুমটিতে ফিরে আসতে থাকে, তখন ঐ ছাঁদ মিলিয়ে যায়। আবার পরদিন যেন জাদুমন্ত্রে তৈরি হয়ে ওঠে।

কার্জন পার্ক আকর্ষণ করে সম্ভাব্য নাট্যকারদেরও। কলকাতা নাটুকে দলের অফুরন্ত উৎসস্বরূপ। নাট্যলেখক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, শৌখিন কুশিলব ইত্যাদি। যারা প্রাণে অনেক আশা নিয়েও কখনোই হল ভাড়া করার মতো পয়সা জোটাতে পারে না, তারাই এই পার্কে এসে জমায়েৎ হয়। প্রত্যেক বিকেলেই তারা নাটক করে, শনিবারে ভিড়টা তাড়াতাড়ি জমে বলে সেদিন আরো উৎসাহের সঙ্গে করে। নাটকের বিষয় খুবই বিচিত্র—কিছু জোলো-সামাজিক, কিছু-বা হৈহৈ-করা বিপ্লবী নাটক। কেউ তাতে কিছু বলে না। রাজভবনের সীমানা জুড়ে অল্প কিছু দর্শক জড়ো হয়, তখন একটি মঞ্চ হাতে হাতে তৈরি হয়, অভিনেতারা অভিনয় করে, প্রম্পটাররা কথা জোগায়, নাট্যকার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখায়, দর্শকবৃন্দ হাততালি দেয়।

২০শে জুলাই শুধু শনিবারই ছিল না, ছিল ভিয়েৎনাম দিবসও। বিপ্লবী উৎসাহে টগবগানো একটি নাট্যসংস্থা ভিয়েৎনামী চাষীর বীরত্ব নিয়ে একটি নাটক দেখাচ্ছিল। ভিড় বাড়ছিল ; পূর্বকোণ থেকে কিছু লোক শ্লোগান দিতে দিতে নাটক যেদিকে হচ্ছে, সেদিকে অগ্রসরমাণ। কার্জন পার্কের চারপাশে পুলিশ সবসময়েই টহল দেয় ; সেদিনও দিচ্ছিল ; তাদের উপস্থিতি ধর্তব্যের মধ্যেই ; লাঠিগুলি রোজের মতোই চকচক করছিল। বিপ্লবী নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্য আগতপ্রায় ; শ্লোগানওয়ালারা

দর্শকদের বড়ো ভিড়টার কাছে এসে পড়েছে; বিকেল চারটে বাজে, প্রবীর দত্ত ঐ ভিড়ের মধ্যে থেকে দেখছিল আর শুনছিল; হঠাৎ যেন কিসের থেকে কী হয়ে গেল।

ঠিক কী যে ঘটেছিল তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়নি। কারণ পুলিশি নথিপত্র কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। পুলিশের বক্তব্য ভিড়ের মধ্যে তারা জনৈক বিপজ্জনক উগ্রপন্থীকে দেখতে পায় যার নামে একাধিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে, তাকে ধরার জন্যই নাকি তারা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। নাটকের উদ্যোক্তাদের মতে, জনসাধারণের কাছে বিপ্লবী পোস্টার-নাটিকা নিয়ে আসার প্রচেষ্টাকে চুরমার করে দেবার সরকারি ষড়যন্ত্রেরই এটা একটা চূড়ান্ত প্রকাশ। যাহোক, পুলিশ তেড়ে এল, একটা গণ্ডগোল শুরু হল, জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক দৌড়তে লাগল, যারা ট্র্যামে বাসে ওঠার চেষ্টা করছিল, বা কুড়ি সপ্তাহ ধরে যে-হলে 'ববি' সিনেমা দেখানো হচ্ছে, তার সামনে লাইন দিয়েছিল, তাদের অনেকে বলেছে পুলিশি লাঠিগুলোকে শূন্যে আন্দোলিত হতে এবং বহুবার ওঠানামা করতে তারা দেখেছে। যে-কথা পুলিশেও অস্বীকার করে না, তা হল এই, যে বহুসংখ্যক ছেলে গ্রেপ্তার হয়। এবং তাদের বেশ কয়েকজনকে ঘটনা চলাকালীন আঘাতের চিকিৎসা করানোর জন্য পুলিশ অথবা জনসাধারণেরই কেউ কেউ দেড় মাইল দূরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বাইরে প্রবীর দত্তর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। কয়েকজন পথচলতি লোক কার্জন পার্ক থেকে একটি গাড়ি করে তাকে নিয়ে এসেছিল। তার শরীরে বেশ কয়েকটা আঘাতের দাগ ছিল, তার মধ্যে খুলির পিছনদিকে একটি ক্ষতচিহ্ন তো খুবই গভীর। কোনো কোনো সূত্রে জানা গেছে, বাঁ হাতটা কব্জির কাছ থেকে নড়বোড়েভাবে ঝুলে ছিল। শীঘ্রই পুলিশ হাসপাতাল এলাকার মধ্যে চলে এল। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তাররা প্রবীরকে মৃত বলে সাব্যস্ত করার পরেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শবটিকে পাশের বাড়িতে অবস্থিত লাশকাটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

মৃতদেহ সনাক্ত করতে সময় লাগল। প্রবীরের মায়ের সঙ্গে যোগাযোগই করা গেল অনেক দেরিতে। তার আগে শহরের বিভিন্ন নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিরা হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁরা বারবার বলেন শবব্যবচ্ছেদ কোনো বেসরকারি ডাক্তারকে দিয়ে করানো হোক, বা নিদেনপক্ষে মেডিক্যাল কলেজেরই কোনো ডাক্তারকে দিয়ে; পুলিশের পরীক্ষককে শবব্যবচ্ছেদের সময় উপস্থিত থাকতে হবে এই সরকারি আইনের নড়চড় যদি নাও করা যায়, তবু পুলিশের সঙ্গে সংসর্গহীন একজন দ্বিতীয় ডাক্তারকেও সেখানে থাকতে দিতে হবে, এই দাবিও তাঁরা করেন। এই প্রস্তাবগুলির প্রত্যেকটিই খারিজ করা হয়। পুলিশের হেডকোয়ার্টার থেকে একটি হেঁয়ালিভরা বিবরণী সংবাদ-পত্রগুলির জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল; হ্যাঁ, যুবকটি মৃত; হ্যাঁ, যুবকের দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল; হ্যাঁ, তার একটি পাঁজরাও ভাঙা ছিল; কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের কারণই খুব প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। পুলিশ কার্জন পার্কে আদৌ লাঠি চালায়নি; যুবকটির শরীরে বেশির ভাগ আঘাতই লেগেছিল তার নিজের দোষে। পুলিশ ভিড়ের মধ্যে জনৈক উগ্রপন্থীকে দেখতে পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে যায়। গণ্ডগোলের মধ্যে পালাতে গিয়ে প্রবীর মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, আর তার ওপর দিয়ে অন্যরা মাড়িয়ে চলে গিয়েছিল; ঐ সময়েই তার পাঁজরা ভেঙে যায়। যুবকটির মৃত্যু নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক। কিন্তু তাকে 'অস্বাভাবিক' মৃত্যু বলা যায় না। ডামাডোলের মধ্যে যখন সে মাটিতে পড়ে যায়, তখন সাত ঘণ্টা আগে খাওয়া খাবার পেট থেকে উঠে আসে, দুর্ভাগ্য-বশত যেদিক দিয়ে ওঠার কথা সেদিক দিয়ে না উঠে তার শ্বাসনালীতে অবরোধ সৃষ্টি করে; মৃত্যুর কারণ এটাই। বলা হয় যে ব্যবচ্ছেদকারী সরকারি চিকিৎসকও এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করেছিলেন। ব্যবচ্ছেদের বিবরণ অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তবু প্রবীরের দেহ মা বা অন্য আত্মীয়স্বজনের হাতে দেওয়া হয়নি। এমন-কি বাড়িও নিতে দেওয়া হয়নি। পুলিশি অ্যাম্বুলেন্সে সোজা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়; সরাসরি পুলিশের

চোখের উপর শেষকৃত্য সমাধা করা হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তা সত্ত্বেও।

যাহোক, আমাদের পক্ষপাতশূন্য হতে হবে, তারতম্যের বোধ হারালে চলবে না। কর্তাদের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে শত শত মৃত্যু ঘটে। শহরের মাঝখানে ঝকঝকে দিনের আলোয় ঘটেছিল বলেই প্রবীরের মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত খবরটা অন্তত পাওয়া গেল। তাছাড়া, সব ভালো যার শেষ ভালো। প্রবীর মরেছে ; কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর মতো একটি বেকার কমল, কমল সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে অন্তত একটি বিন্দুর ঝামেলা। সকাল সাড়ে ন-টায় এক গরিব পরিবারের বেকার ছেলে যে সামান্য খাবার খেয়েছিল, সাত ঘণ্টা পরেও যে তা শ্বাসনালী দিয়ে উঠে এসেছিল, সেটা খুবই সুবিধাজনক। কলকাতার জীবনের মালমশলা হজম করা শক্ত ; কিন্তু তা ছাড়া চলেও না, পুলিশের গল্পগুলোও না-হলে গেলা অসম্ভব। আমরা মিথ্যে কথা দিয়ে নিজেদের যেন না-ভোলাই।

১২

ক্ষীণ আশার হাওয়া

একটা সভা, ডেকেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, একসঙ্গে মিলে, বেকারদের সমর্থনে তাদের পক্ষ থেকে একটা দাবিসনদ রচনা করবার জন্য। একটা দাবি ছিল এই যে নিজেদের গাফিলতির জন্য নয়, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য যারা কোনো কাজ পায়নি—তাদের একটা ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, তখন কিন্তু বলে দেয়া হয়নি এই ভাতা দেবার ব্যাপারটা কীভাবে সংগঠিত করতে হবে। হয়তো এই সিদ্ধান্ত আর দাবিসনদ দুটোই ছিল নিছকই কোনো গোঁজ। দ্রব্যমূল্য যত চড়তে থাকে, অসন্তোষ—গত কয়েক মাস তা চাপা ছিল—ততই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। এরই পাশাপাশি বামপন্থী দল-গুলো, যারা এতদিন প্রায় আত্মগোপন করে ছিল, জানেনই তো কেন, তারাও ধীরে-ধীরে আবার তাদের সহজাত রণং দেহি ভাব নতুন করে আবিষ্কার করছে। কিন্তু সভার বাগাড়ম্বর বা অলংকারের চেয়েও ঢের বেশি কৌতূহলোদ্দীপক ছিল অঙ্গ-উপাঙ্গের সংস্থান। জনসমাবেশ না হলে সভা কোনো সভাই হয় না। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে এই সভাটিতে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েৎ হয়েছিল। কোনো বামপন্থী সমাবেশে যোগ দেবার জন্য পাড়া-গাঁ বা মফস্বল শহর থেকে সহজে যে কেউ কলকাতা এসে হাজির হবে, আজকাল আর তা সম্ভব নয়। বিনা টিকিটে ভ্রমণ, বলাই বাহুল্য, কিছুতেই চলবে না, কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে যাদের হাতে টিকিট আছে, একবার যদি টের পাওয়া গেছে যে তারা বামপন্থী কোনো সভায় যোগ দিতে

যাচ্ছে, তবে মাঝের স্টেশনগুলোয় তাদের ঠেলেঠুলে গলাধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু ঠিক লোক হলেই, অর্থাৎ শাসকদলের কোনো নামজাদার সভায় যোগ দিতে আসছে জানতে পারলেই, শহরে ট্রাকে করে লোক আনতে দেয়া হয়। অন্য দলগুলোর বেলায়, ট্রাক ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এ ছাড়াও আছে টাকার প্রশ্ন। বামপন্থী দল-গুলোর বেলায়, অন্তত, এই মুহূর্তে, ঝলমলে দিনগুলো বিগত কাহিনী। প্রত্যেকটি পাই-পয়সা বারে-বারে গুনতে হয় তাদের, সামান্য একটু সংগতিকে কত বেশি দূর চালিয়ে নেয়া যায়, তারই দিকে নজর রাখতে হয়। আগে এই ধরনের সমাবেশে বাইরে থেকে যে জাঁক-জমক দেখা যেত, সে এখনও স্মৃতির সম্পত্তি। এতসব সমস্যা সত্ত্বেও, এই বিশেষ সভাটিতে কিন্তু জড়ো হয়েছিল হাজার-হাজার মানুষ। বিভিন্ন নাট্যদৃশ্য আর ভাবাবেগের এ এক আশ্চর্য সমাহার ; কেউ-কেউ ঝিকিয়ে উঠছে উৎসাহে, আবার তারই পাশাপাশি অন্য অনেকের মধ্যে একটা শান্ত নির্ভাবনার ছাপ, কারু মুখে যদি দেখা যায় মেলা বা প্রমোদ উৎসবের আলো তো তার পাশেই আবার কারু মুখে উৎকণ্ঠার গভীর কুঞ্চন আর ছায়া।

কোনো রাজনৈতিক সভায় জড়ো হয় নানা ধরনের মানুষ। লোকে দল বাঁধে মিছিলে, ওড়ে নিশান আর ফেস্টুন, চওড়া—কিংবা তত চওড়াও নয় সবসময়—রাস্তা ধরে সে সাপের নাচের ছন্দে এগোয়। লোক আসে, একা-একা হেঁটে, অথবা দু-জন তিনজন করে ছোটো-ছোটো দল বেঁধে, এই একজন অধ্যাপক, ঐ যে একজন সাংবাদিক কিংবা কোনো বেকার মিস্ত্রি। তরুণী গৃহবধূ, কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের ফোঁটা, সস্তা পাউডারের হালকা গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে কোনো স্কুলের ছেলের অত্যুৎসাহের ঘাম। তাছাড়া আপনি দেখতে পাবেন, ২৪ পরগনা, হুগলি কিংবা হাওড়া থেকে পালে-পালে এসেছে কারখানা-শ্রমিক অথবা খেতমজুর ; দূরে-দূরে, হয়তো আপনার চোখে পড়ে যাবে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া এক-আধজন সচ্ছল লোক, সে হয়তো এসেছে নিছকই কৌতূহলের বশে, আর নয়তো আবিষ্কার করে বসেছে যে চারপাশে যা ঘটছে তার সঙ্গে তারও কোনো

ভাবাবেগের বন্ধন আছে। কিন্তু সভাগুলো প্রধানত গরিবদেরই, খুব গরিবদের—সর্বহারা কিংবা যারা সর্বহারা হতে বসেছে, আর একটা বড়ো অংশ ছড়িয়ে আছে আশপাশে যাদের নিম্নমধ্যবিত্ত বলে চালানো যায়ঃ গায়ে শতচ্ছিন্ন পোশাক, প্রায় কারু গায়েই গরম কাপড় নেই, ছেঁড়া জুতো, ধুতির বা ব্লাউজের কোথাও হয়তো তালি লাগানো, জামায় বা শাড়িতে পানের পিকের দাগ। মাত্র তিন-চার ঘণ্টার জন্য তারা দখল করে নেয় ময়দানের বিশাল সমভূমি। সভাগুলো সবাইকে সমান করে আনে, গণতান্ত্রিক করে তোলে—কারণ সবাই বসে পড়ে মাঠে—এক হাঘরের পাশেই হয়তো বসেছে এমন-কেউ যে ঠিক ততটা গরিব নয়, তার পাশেই হয়তো একজন মোটামুটি সচ্ছল, আর তার পাশেই হয়তো পুরোপুরি সচ্ছল কেউ। হয়তো আপনার পাশেই বসে আছে পুলিশের এক খোচর, কিন্তু সেও বসেছে মাটিতে। একটা বেশ দিশি মেলা-মেলা উচ্ছল ভাব সবখানে। দূরের মঞ্চে বক্তৃতার পর বক্তৃতা হয়ে চলেছে। সকলেরই এক চোখ সাধারণত বক্তার দিকে, অন্য চোখ এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। খানিকটা উদ্ভটও বটে, কারণ যখন রূঢ় করাল কথাগুলো লাউডস্পিকার থেকে গমগম করে আছড়ে পড়ছে, বেশিরভাগ লোকই গভীর মন দিয়ে শোনে, কিন্তু ভিড় যেভাবে ব্যবহার করে তাতে রগড়ও আছে এক ধরনের। হয়তো মঞ্চ থেকে যে-কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে লোকে তা, অল্পবিস্তর, বিশ্বাসও করে। একচেটে পুঁজিবাদের অলুক্ষুণে শুঁড়গুলো কি করতে পারে সে বিষয়ে বক্তৃতার খানিকটা যদি না'ও বোঝে, তবু তারা, অন্তত আবছাভাবেও, জেনে যায় মঞ্চের ঐ সুহৃদ মানুষরা আবেগ-অনুভূতির দিক থেকে তাদেরই সঙ্গে আছেন, তাঁরাও এই সার্বজনীন আন্দোলনের অংশ। এইসব ভাষণের মধ্যে—তারা বুঝতে পারে—এ তাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষই তার স্বর খুঁজে পাচ্ছে। মঞ্চের উপরকার নেতারা তাদের যদি এখন সার বেঁধে কুচকাওয়াজ করে যেতে বলে, আন্দোলনের জন্য যদি একদিনের মাইনে দিয়ে দিতে বলে, কখনো যদি কোনো কর্মীকে খাদ্য ও আশ্রয় দিতে বলে, তাহলে তারা তক্ষুনি, বিনাবাক্যব্যয়ে, তা-ই করবে। তারা তো, আসলে, এই সভায় এসেছে

আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে, তারা শরিক হতে চায়, অংশীদার ; আর এই বিশাল জনসমাবেশের প্রত্যেকে পরস্পরকে আস্থার যে উষ্ণতা ও আন্তরিকতা জোগাতে পারে, তারই অংশীদার হয়ে ওঠে সবাই ; সত্যি বলতে, এ যেন একধরনের সামাজিক নিরাপত্তা।

অথচ, অন্য-একটা স্তরে, খানিকটা হালকা ভাবও আছে, যেটা প্রায় উচ্ছলতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বেশ কিছু লোক—যারা কিছু পয়সা দিতে পারে এজন্য—কিনে নেয় দলের সাহিত্য, অথবা পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো-কিছু পয়সা বার করে আনে ত্রাণ তহবিলের জন্য—কারণ মজুরদের এ-দল বা ও-দল হয় লকআউট নয়তো পুলিশি লাঞ্ছনার বলি হয়েছে। সেইসঙ্গে, তাদের কথা কিন্তু কিছুতেই ফুরোয় না, নিজেদের মধ্যে সাতকাহন বলাবলি করেই চলে। কলেজের ছাত্র বা স্কুল-শিক্ষকরা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানায়, একগাঁয়ের লোক কুশল শুধোয় অন্য কোনো গ্রাম বা এলাকার লোকের। তাদের মধ্যে কেউ কিনতে থাকে ভাজাভুজি, চিনেবাদাম চিবোয়, বড়া বা তেলেভাজা চাখে, এমন-কি কিনে নেয় গরম একভাঁড় চা অথবা ঠাণ্ডা কোনো পানীয়। ফিরিওলারা এঁকেবেঁকে সারাক্ষণ বসে-থাকা লোকজনদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আর ফলাও ব্যবসা চালিয়ে যায়। কোনো কোণায় আবার, যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, আপনি দেখতে পাবেন খুদে-খুদে একেকটা দল নিবিড়ভাবে বসে চটপট দু-হাত তাশ খেলে নিচ্ছে—ব্রিজ, বা এমন-কোনো খেলা যেটা অত চালিয়াতও নয়। হয়তো দেখতে পাবেন দলছুট এক ছেলে প্রাণের আনন্দে বাজিয়ে চলেছে হারমোনিকা, কিংবা কোনো বাচ্চা মেয়ে—মাথায় আঁটো-করে-বাঁধা ঝলমলে ফিতে—লাফিয়ে চলেছে, এক্কাদোক্কার চালে, আর নয়তো এইমাত্র শিখে-নেয়া কোনো শ্লোগানের তালে-তালে। তার পাশে বসেই তার দাদা হয়তো অবিশ্রাম টিপ্পনী কেটে যাচ্ছে হাত দশেক দূরের এক ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে, কিংবা হয়তো আপিসের কেচ্ছা শোনাচ্ছে কাউকে, অথবা দুজনেই বলাবলি করছে কোনো পরিচিত জনের কোনো-এক দুঃসংবাদ।

ছোটো-ছোটো একেকটা মানুষের দ্বীপ—যারা একসঙ্গে জড়ো হয়েছে

মাত্রই তিন-চার ঘণ্টার জন্য। এরাই পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত-অপসৃয়মাণ মধ্যবিত্ত আর মরো-মরো সর্বহারাদের মোটামুটি বিশ্বস্ত এক জগাখিচুড়ির প্রতিচ্ছবি। এদের গেঁথে রেখেছে একটাই সুতো, সে-ই এদের একসঙ্গে মিলিয়েছে আজ এই সন্ধেবেলায় ময়দানের শুকনো ঘাসের জমিতে—যখন তারা ভাগ করে নিচ্ছে এই অভিজ্ঞতা, দুঃসহ বর্তমান কি করে দুঃসহতর ভবিষ্যতে মিলিয়ে যাচ্ছে: এমন-এক ভবিষ্যৎ, যেখানে চাকরি দুর্লভ, খাদ্যবস্তু দুর্মূল্য, বাড়িভাড়া বিভীষিকা আর দৈনন্দিন জীবনযাপন এক অন্তহীন দুঃস্বপ্ন। কারু কাছে এই সমাবেশ তার নিজের বিশেষ দুঃখটিকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার সুযোগ—কারুর ছেলেমেয়ে হয়তো জেলে পচছে, অথবা মাস্তান বা পুলিশের হাতে খুন হয়েছে।

সন্দেহ নেই, অনেকেরই কাছে সমাবেশটি তার আদর্শকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার উপায়। যদিও, অবশ্য, তারা সভায় আসেনি সেই আদর্শকে চেঁচিয়ে জাহির করতে। তারা বক্তৃতা শোনে, যখন মনের মতো কোনো নেতা কথা বলতে শুরু করেন, ভক্তিভরে ঘন-ঘন হাততালি দেয়। কিন্তু বেশির ভাগই জানে এ-সব বক্তৃতায় কী কথা বলা হবে; বেশির ভাগ এটাও জানে সিদ্ধান্ত যা-ই নেয়া হোক-না কেন তার প্রয়োগ হয়তো তেমন ঘটবে না: এ-সব শুধু রুদ্ধ আবেগ বার করে দেবার একটা উপায়। তারা সভায় আসে প্রধানত পরস্পরের সঙ্গ ও সান্নিধ্য উপভোগ করতে, তারা যে একা নয় এই সত্যটা থেকে সাহস জোটাতে, আর এই বিশ্বাসে আসে, যে আকাশের একটা টুকরোর তলায়, ব্যক্তিরা যখন পরস্পরের কাছে চলে আসে, তক্ষুনি একটা রূপান্তর ঘটে যায়—একা মানুষ ঢুকে পড়ে গোষ্ঠী-অস্তিত্বের উদ্দীপনায়। হয়তো বেশ-কিছু লোক আসে এইজন্য যে তাদের জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব বড়ো বেশি, সেখানে অন্য স্বাদের উপলক্ষ ঘটে সামান্যই। তারা এটা ভাবে না নষ্ট করার মতো পয়সা তাদের আছে কি না; ট্রেনে বা ট্র্যামে বা বাসে করে সভায় আসতে গিয়ে যে-পয়সা খরচ হল, মাসের শেষে সেটা কতটা গায়ে লাগবে; কিংবা সভা থেকে বাড়ি ফেরবার পথে তারা জমিদার-জোতদারের ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে

মার খাবে কি না: তারা আসে, তবু, সব সত্ত্বেও, কেননা এটাই তাদের বাঁচার একমাত্র উপায়। এ-সব সভা গরিবদের প্রমোদ জোগায়, জোগায় জ্বরাতুর উত্তেজনার দুর্মূল্য ছ-সাত ঘণ্টা। তাতে তাই কোনো লজ্জা বা গ্লানি নেই যদি তারা কেবল এক কান দিয়ে ভাষণগুলো শোনে, তাদের বাকি-সব ইন্দ্রিয় উৎসুক শুষে নেয় চারপাশে যা-কিছু ঘটছে তার সব খুঁটিনাটি, তাদের ঘিরে কীভাবে নেমে এল আজকের এই সন্ধ্যা। এই-যে সারাক্ষণ তুচ্ছ-সব কথা বলে গেছে, তাতেও কোনো অপরাধবোধ নেই, কোনো অপরাধবোধ ছিল না যখন সে একভাঁড় চা বা একঠোঙা ঝালমুড়ি খেয়ে পয়সা ওড়াল, অথবা নেতারা যখন সামাজিক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন, তখন সে কেমন তাকিয়ে ছিল দু-সারি আগের ঝলমলে তরুণীটির দিকে।

এই ধরনের রাজনৈতিক সমাবেশের চরিত্র নিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে কোনো লাভ নেই। জীবনধারণ যখন গিয়ে প্রান্তিকসীমায় পৌঁছেছে, তখনও তো আপনার জীবনে একটু আলো চাই মাঝে-মাঝে, একটু দীপ্তির বিভা, আশার ক্ষীণ এক ঝলক। গরিবরা যেভাবে সবকিছুর মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পায়, তাতেই কিন্তু সবচেয়ে কম পুঁজি লাগে। সূর্য ডুবে-যাবার একটু পরেই নেতারা মঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়াবেন, ভিড় আস্তে-আস্তে ঝরে যাবে। কেউ-কেউ হয়তো আবারও মিছিল গড়বে, কিন্তু বেশির ভাগই ফিরে যাবে একা-একা, এলোমেলো। তারা মিলিয়ে যাবে রাতের অন্ধকারে, ডুবে যাবে প্রাত্যহিক বাঁচার দুর্বহ চিন্তায়—কিন্তু এই সভা থেকে কিছু অন্ন নিয়ে যাবে আনন্দের, পুষ্টির। মোড় পেরুলেই সত্যি সামাজিক বিপ্লব আসবে কিনা কে জানে, নেতারা আবোলতাবোল বা বাজে কথা বলছেন কিনা কে খোঁজ রাখে, এমন কি এই একদিন বাড়ি থেকে বেরুতে গিয়ে হয়তো সে-পয়সাটুকুও গেছে যাতে অন্তত কয়েকটা দিন চলত: কিন্তু, তবু, আপনি এই গরিব বেচারাদের জিগেস করুন, তারা বলবে কোনো দুঃখ বা খেদ নেই, বরং তারা এই সামান্য ক-টি পয়সার বিনিময়ে পেয়ে গেছে অনেক। আসুক পরের উপলক্ষ, অনায়াসেই আপনি ধরে নিতে পারেন, তারা আবার ফিরে আসবে: তারা তাদের ময়লা রুমাল

বা ছেঁড়া খবরকাগজটা অযত্নে লালিত নোংরা ঘাসে বিছিয়ে বসবে, মোটামুটি আয়েস করেই বসবে, কিনবে কিছু টাটকা মুড়ি বা চিনেবাদাম, আর অবিরাম চিবোবে সে-সব, যখন মঞ্চের নেতারা বর্ণনা করে যাবেন গত তেরো বছরে সে-কোন্ অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে দূরের কোনো-এক দেশে, যার নাম নাকি কুবা।

১৩

পাণ্ডববিবর্জিত

কলকাতার কাগজগুলো কি কান্নাকাটিই না জুড়েছে। আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থাগুলি নাকি প্রায় সবই এই শহরকে এড়িয়ে যাচ্ছে। তা তো হয় না, তাদের ফিরিয়ে আনতেই হবে। কয়েক বছর আগে যখন ওই অলপ্পেয়ে কম্যুনিস্টরা আরেকটু হলেই শহরটাকে দখল করে নিচ্ছিল, তখন যে বিমানসংস্থাগুলি কলকাতাকে প্রায় ত্যাগ করেছিল, সেটা হয়তো মন্দ করেনি। কিন্তু এখন তো আর কলকাতা সেই মহামারিগ্রস্ত শহর নেই; কম্যুনিস্টদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল আবহাওয়া আবার আমরা ফিরিয়ে আনছি; বড়ো ব্যবসাদাররা একজন দুজন করে ফিরে আসতে শুরু করেছে; শহরকে নতুন করে তোলার মহাযজ্ঞ শুরু হতে যাচ্ছে; হলদিয়া প্রকল্প আমাদের দোরগোড়ায়; কেন্দ্রের যদি সুবুদ্ধি হয় এবং ফরাক্কা থেকে জল অবাধে নিম্নমুখে আসতে থাকে, তাহলেই কলকাতা বন্দর আবার আগের মতো কর্মব্যস্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং বিদেশী বিমানদের ফিরিয়ে আনতেই হবে।

বড়ো মানুষের আশাভঙ্গের সঙ্গে কোনো আশাভঙ্গেরই তুলনা হয় না। এই দারিদ্র্য ও আবর্জনার শহরে লাখ পনেরো লোক শুধু খোলা আকাশের তলায় ঘুমোনোর একটু জায়গার জন্যই উঞ্ছবৃত্তি করে; এক-টুকরো খাবার বা কয়েক পয়সায় বিক্রি করার মতো বাতিল মালের খোঁজে বহু নারীপুরুষশিশুকে এখানে পূতিগন্ধী ময়লার স্তূপে হুমড়ি খেয়ে থাকতে দেখা যায়; এই শহরে আধ ঘণ্টার প্রবল বর্ষণে প্রধান সড়কগুলি জলের তলায় চলে যায়; যানবাহন অচল হবার ফলে

ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ যে-যেখানে আছে সেখানেই আটকে পড়ে। এই শহরে মানুষ কী ভাবে যাতায়াত করে দেখুন; পাবলিকবাসগুলি সাধ্যের তিনচারগুণ বোঝাই হয়ে চলে। যাত্রীরা যায় এ ওর গায়ের ওপর বসে, এ ওর পা মাড়িয়ে, দরজায়, বাসের পেছনে ও দু-পাশে ঝুলন্ত পিরামিড সৃষ্টি করে, অকল্পনীয় জায়গায় অবিশ্বাস্যভাবে অবলম্বন খুঁজে বার করে। অথবা শহরতলির ট্রেনগুলোকে ধরুন: ছাতের ওপর ভিড়, দু-পাশে ভিড়, রোজই একটা দুটো দুর্ঘটনা ঘটেছে, ঝুলে থাকা খোলা তার গায়ে লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কেউ প্রাণ দিচ্ছে, নয়তো চলতি অবস্থায় লোহার থামে ধাক্কা খেয়ে কারুর মাথা চৌচির হচ্ছে; চিন্তা করুন রোজ এই সার্বিক গয়ংগচ্ছতার ফলে, ধাক্কাধাক্কি, ব্রেকডাউন আর পকেটমারের উৎপাতে কী পরিমাণ হয়রানি হয় জনসাধারণের; রোজ একঘেয়েভাবে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে দুর্গন্ধ, ঘাম, মেজাজ খারাপ এবং সর্ববিষয়ে হতাশার এই অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এই সবকিছুই শিকেয় তোলা থাক, ঐ বড়োলোকদের আশা-ভঙ্গই খবরের কাগজগুলিকে অস্থির করে তুলছে। আন্তর্জাতিক বিমানগুলি কলকাতায় ফিরতে চাইছে না বলে এরা যেরকম খেপে উঠেছে, তাতে আঁচ করা যায় যে কাগজগুলো যাদের প্রতিভূ, এটাই তাদের ইদানীংকার প্রধান ব্যর্থতাবোধ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে উড়ন্ত মায়াবিনীদের এই অগস্ত্যযাত্রা কলকাতার ব্যবসায়ী ও একসিকিউটিভ কুলের বুকে বড়োই বেজেছে। আগে কলকাতার বিমানবন্দর থেকে সপ্তাহের যে-কোনো দিন সকালে অথবা বিকেলে সোজা চলে যাওয়া যেত ইউরোপ কিংবা দূরপ্রাচ্য অথবা আরো দূর। আজ আর তা হয় না; দুগ্ধবাহী গাড়িগুলি আর এখানে আসে না, প্রতিদিন নয়, প্রতি সকালে বা বিকেলে তো নয়ই; প্রায়ই প্লেন ধরার জন্য আপনাকে আগে যেতে হয় দিল্লি বা বোম্বাই। স্থানীয় উন্নাসিকদের এতে আঁতে যেমন ঘা লেগেছে তেমন আর কিছুতেই না। বিমান-সংস্থাগুলি তো তাদের দেখে শিখলেও পারে। দুঃস্বপ্নের শেষ হওয়ার পর তারা তো আবার ফিরে এসেছে কলকাতায়—তবে বিমানগুলিই বা আসে না কেন?

ঐ যে নারীপুরুষরা আরেকটি রুদ্ধশ্বাস দিনের শেষে বাড়ি ফেরার বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এবং লাইন ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, জিজ্ঞেস করুন বিমানগুলি ফিরুক বা না-ফিরুক, তাতে ওদের কিছু আসে যায় কি না। জিজ্ঞেস করুন ঐ দম-আটকানো ভিড়কে, অফিসের ঘণ্টায় যারা ট্র্যামে চড়ে চলছে, কিংবা শহরতলির ট্রেনের ছাদে কোনোক্রমে লটকে থেকে আশাভরে ঘরের দিকে যাচ্ছে। শুনতে ভালো লাগুক চাই না-লাগুক এখানেই রয়েছে সেই জনগণ যাদের পরিশ্রম এই শহরের অর্থনৈতিক ভিত্তি। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব পুরোপুরি স্বীকার না করলেও এই সরল সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো উপরিসৌধ বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না। কলকাতার শিল্পপতি শিল্পপরিচালক শ্রেণীর ধারণা কিন্তু অন্য। যে রাজস্থানবংশীয়েরা পশ্চিমবঙ্গের নরম মাটিতে কখনও স্বস্তি বোধ করতে পারেনি তাদের কথা আলাদা। ইংরেজ যারা অবশিষ্ট আছে তাদের কথাও থাক ; সম্রাটসুলভ অন্যমনস্কতায় এই যে শহর তারা একসময় গড়ে তুলেছিল, তার আত্মিক এবং আর্থিক জটিলতা থেকে নিজেদের ছাড়াতেই তারা গত পঁচিশ বছর ধরে ব্যস্ত। আমি বলছি সেই কালো সাহেবদের কথা, কারিগরি ও শিল্পসংস্থাগুলির উত্তরাধিকার ইংরেজরা যাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে ; রাজস্থানী সাম্যের স্বার্থে যারা নিজেদের বিবেক বিসর্জন দিয়েছে, সেইসব ব্যক্তিকেও এইসঙ্গে ধরুন ; এমন-কি যে জাত-বাঙালি শিল্পপতিরা বিভিন্ন সময়ে বস্ত্রশিল্প, হালকা এঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্‌ট্রনিকস্, ইস্পাত, ওষুধ ইত্যাদি ব্যবসায়ে হাত দিয়েছে তাদেরও ভুলবেন না। ব্যক্তিবিশেষে সামান্য বেশিকম হলেও ১৯৪৭ সাল থেকে এই লোকেরা পারিপার্শ্বিককে কোনো রেয়াৎ না করে এই শহরে থেকেছে, আমোদ-প্রমোদ ও যৌনক্রিয়ায় কাল কাটিয়েছে, ক্লাব ও পার্টি, গলফ্ ও ঘোড়দৌড় তাদের আত্মিক ভিত্তি। তাদের জীবন এক স্বতন্ত্র, অন্তর্গূঢ় জীবন : সাড়ে দশটায় আগের রাত্রের খোঁয়াড়ি সামলাতে সামলাতে অফিস যাত্রা, ১১টায় সুবেশা সেক্রেটারির বানানো কফি, অফিসের কাজে দু-একজনের সঙ্গে অর্ধমনস্ক সাক্ষাৎকার, দু-একটা

চিঠি ডিকটেশন দেওয়া : তারপর বারোটা বাজামাত্র শোফার-চালিত গাড়ি তলব করা হল, সাহেবরা পাড়ি দিলেন ক্লাবের মুখে, পানীয়ের পর চলল পানীয়, পরের চাকরি এবং পরস্ত্রীদের নিয়ে মুখরোচক গল্পগাছা, টিমেতেতালা মধ্যাহ্নভোজের পর তিনটে সোয়া-তিনটেয় গদাইলস্করি চালে তাঁরা ফিরলেন অফিসে। সাড়ে চারটের মধ্যে তাদের দিন শেষ হল। এবার কেউ যাবেন ঝটপট দু-এক হাত গল্‌ফ খেলে নিতে, কেউ বা বিলাসবহুল বাংলো কিংবা অ্যাপার্টমেণ্টে সামান্য বিশ্রামের খোঁজে, তারপর সন্ধ্যায় শুরু হবে দুরন্ত ককটেল ও পার্টির ক্লান্তিকর পালা।

না, এটা অতিরঞ্জন নয়, রঙ ফলিয়ে বলার ইচ্ছেও আমার নেই। শিল্পপতি ও শিল্পপরিচালক-শ্রেণীভুক্ত কয়েকশো লোক কলকাতায় আছে, বাঁচার সংজ্ঞা তাদের কাছে এ-ই ছিল, এই সংজ্ঞা অনুযায়ীই তারা বাঁচছিল—এবং এখনও বাঁচে। এ ধরনের জীবনযাত্রায় পড়াশুনো করা, চিন্তা করা অথবা কোনো সত্যিকারের কাজ করার সুযোগ খুবই কম ; সরকার বা লেবারের ঘাড়ে দোষ চাপানো আর মাঝে-মধ্যে বন্ধুগোষ্ঠীর আয়োজিত আড্ডায় করের দুঃসহ বোঝা নিয়ে আলোচনা—এ ছাড়া বাকি সময় কাটে একটা অবিরাম মত্ততার ঘোরে। কে যেন কবে এদের মাথায় ঢুকিয়েছিল যে এরাই ব্রিটিশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, এই হাস্যকর ধারণা এরা পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। ব্রিটিশ জীবনের বহিরঙ্গগুলি নকল করা কঠিন নয়—সেই ঋষভনিন্দিত স্বরক্ষেপ, সেই ক্লাবপ্রীতি, সেই কদাচিৎ পরস্পরের স্ত্রী হরণ, সেই টেনিস, গল্‌ফ ; শিকার সফর ; কিন্তু কেউ এদের বলেনি যে বণিকের মানদণ্ডকে সুকৌশলে রাজদণ্ডে পরিণত করতে ব্রিটিশদের হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছিল, এও কেউ বলেনি যে এই খাটুনির পরেও তারা ইতিহাসকে অতিক্রম করতে পারেনি। কলকাতার বক্সওয়ালাদের এমন-কি সদ্যসাক্ষরও বলা যায় না, তারা অতীতে যা ছিল, বর্তমানেও তাই আছে—একেবারে নির্জলা নিরক্ষর। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ধূসরতা, দারিদ্র্য ও আবর্জনায় পীড়িত কলকাতার বাস্তব জীবন, কারখানার মজুরদের আন্দোলনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ উন্মোচিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া—এর কোনো কিছুই

তাদের ছোঁয়নি। তাদের সুগভীর আস্তিক্য তাদের বুঝিয়েছিল যে এই সবই ক্ষণস্থায়ী। ঘেরাও-এর আমলে একটা নিষ্ঠুর ধাক্কা খেয়ে এই ভীত ও নষ্টবীর্য বক্সওয়ালারা সাহায্যের জন্য আর্ত চীৎকার শুরু করেছিল। এখন সেই বিভীষিকা দৃশ্যত শেষ; ব্যবহারে এবং ভাবভঙ্গিতে ওরা আবার ওদের পুরানো ধারায় ফিরে যাচ্ছে।

বোম্বাই বা আমেদাবাদে যে ব্যবসায়ী ও পেশাদারী শ্রেণী আছে তাদের সঙ্গে তুলনা করলেও এদের হীনতা বেরিয়ে আসে। এই দুই শহরে এই শ্রেণীর লোকেরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপার্শ্ব থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের একটি ভূমিকা আছে; আরো বড়ো ভূমিকা আছে নানা ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব-দরদী ক্রিয়াকর্মে। সবচেয়ে বড়োকথা তাদের বাঁচার ধরন সাধারণ মানুষের বাঁচার ধরন থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের বিলাসিতার একটা মাত্রাবোধ আছে, আছে অপেক্ষাকৃত অল্পবিত্তদের অনুভূতির প্রতি কিছুটা অন্তত বিবেচনা; তাছাড়া অত্যধিক স্বার্থপরতার বিপদ সম্বন্ধে তারা অন্তত কিছুটা ওয়াকিবহাল; এর কোনো-একটা গুণও তাদের কলকাতার জাতভাইদের মধ্যে এতটুকুও নেই।

কলকাতার উচ্চবিত্তদের বোধশূন্যতা খুব সামান্য ব্যাপারেও প্রকাশ পায়। কলকাতা ও আমেদাবাদের ম্যানেজমেণ্ট ইনস্টিটিউট দুটি একই সময়ে খোলা হয়েছিল। আমেদাবাদের ইনস্টিটিউটে আজ প্রধানত স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপরিচালক-শ্রেণীর দানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বিশাল বাড়ি ও তারই অনুরূপ প্রাঙ্গণ। কলকাতার ইনস্টিটিউট আজও ধার-করা জায়গায় কুঁকড়েমুকড়ে কোনোগতিকে টিঁকে আছে; ১৯৬৪ সালে সরকারি ব্যবস্থা অনুযায়ী বেশ কয়েকশো একর সমতল জমি এই সংস্থা প্রাঙ্গণ নির্মাণের জন্য পেয়েছিল। কিন্তু শিল্প ও ব্যবসা জগতের বড়ো নেতারা বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ঢালাতেও রাজি হন নি।

যখন এঁরা বলেন এই রাজ্যে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতাই কম, তখন এঁদের জিজ্ঞাসা করা উচিত: যে-শ্রেণী শিল্প পরিচালনা করে, তাদের

অক্ষমতা ও অযোগ্যতার ফলে উৎপাদনের যে ক্ষতি হয় তাকে শ্রমিকদের অযোগ্যতার কুফল থেকে কী-ভাবে আলাদা করা যাবে? খবরের কাগজগুলির স্বত্ব ও পরিচালনার ভার যাদের হাতে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও যারা প্রভুত্ব করে থাকে, তারা তো শ্রমিকদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য তাদের অপবাদ দেবেই; কিন্তু ইতিহাসই এর বিচার করবে, তার বেশি দেরি নেই।

এই তো সেদিন সরকার ঘটা করে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানির পরিচালনভার গ্রহণ করল। বেসরকারি সংস্থার মধ্যে আরও অনেকগুলিরই পরিচালনার মান সমান নিচু; কিছুদিন বাদে শ্রমিক বিক্ষোভের অজুহাতে আর কাজ চলবে না। এর অনেকগুলি আজ যদি সরকারের হাতে চলেও যায়, তাদের হৃতস্বাস্থ্য কী প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনা যাবে? যদি কেউ মনে করে যে শিল্প পরিচালনার ভার এখন যে-শ্রেণীর হাতে, তাদের এক-আধটুকু জায়গাবদল করে তাদের দিয়েই শিল্প পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো যাবে, তাহলে শুধু ভুলই হবে না, যা হবে তা আরো মারাত্মক। নীরদ সি. চৌধুরীর রোদে-ঝলসানো জাতির বর্ণনা যদি কোনো শ্রেণীকে মানায়, তাহলে তা কলকাতার এই কালো সাহেবকুল। উদ্ধার নয় সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, মায়াদয়া নয় দ্রুত অপসারণ এদের ন্যায্য পাওনা। দেশের এই অংশে এদের সংযোগে শিল্পের পুনরুজ্জীবন হবে, এটা একটা হাস্যকর কল্পনা; কথাগুলো শুনতে খুবই কটু; কিন্তু প্লেনগুলি কলকাতায় আর কখনো ফিরে আসবে না, তার জন্য ইতিহাসের আঁস্তাকুড় থেকে কান্নাকাটি করা ছাড়া এদের গত্যন্তর নেই।

১৪
একটি বিপ্লবী হাতঝাঁকুনি

দৌড়ে যারা জেতেনি, সাফল্য তাদের হাত ঝাঁকাচ্ছে? কলকাতার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে খদ্দের আজকাল নেই বললেই চলে, কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রোর বিমান, হ্যানয় থেকে ফেরবার পথে, থেমেছিল কিছুক্ষণ। অল্পক্ষণের বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও, তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য, ভোজবাজির মতো, ভিড় জুটে গেল। তার মধ্যে এমন-কিছু লোক আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাদের বলা হয় হুজুগে। তা তো হবেই। এই নগরী যে কিছুতেই যাকে বলা যায় তার বিপ্লবী হুরহংকার তথাকথিত পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারে না, কুবার নামে যে এখনও জাদু আছে। চে, সন্দেহ নেই, আরো লোক জমাতে পারতেন, তবে এই দুর্মূল্যের দিনে ফিদেলই বা কম কী?

বিভিন্ন বর্ণের বামপন্থী দলগুলোর জগাখিচুড়ি সন্নিবেশ—সে তো আছেই, তাছাড়াও কেউ কেউ আছে যারা আদৌ কিন্তু বাম নয়। আপস হল আপস! বিমান বন্দরের আধঘণ্টার ছোট্ট সময়টুকুর জন্য তাত্ত্বিক বিতর্ক বেমালুম ভুলে যাওয়া গেছে, সবাই সার বেঁধে দাঁড়ায় ফিদেলের অতীব ঝাঁকুনিযোগ্য হাতটির সন্ধানে: হাতটি বেশ বড়োসড়ো, বলশালী অথচ নমনীয়। তিনি পাস করে গেছেন, আমরা পাস করতে পারিনি। আমরা পারিনি, তিনি পেরেছেন, বিপ্লব কেবলই আমাদের হাত গলে বেরিয়ে যায়, তিনি নিজে একটি রচনা করেছেন, স্বয়ং। গত কয়েক বছরে তাঁর জৌলুশ অবশ্য একটু কমেছে, পরিস্থিতি কাস্ত্রোকে প্রায় বশম্বদ বানিয়ে ছেড়েছে, গত তিন-চার-পাঁচ বছর ধরে তিনি একটি বিশেষ মক্কাশরীফের দিকে ঝুঁকে আছেন। তা, কী আর করা, সবকিছুই মেনে

নিতে হয়, আলোর সঙ্গে একটু ছায়াও বা। বিপ্লবের এক রচয়িতা তিনি—যিনি কিনা সাফল্যের সঙ্গে এক বিরাশি শিক্কা কষিয়েছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। লেনিনকে আমরা কেউ চর্মচক্ষে দেখিনি, তাছাড়া তিনি তো পঞ্চাশ বছর হল মারা গেছেন; মাও সে তুং তো ভারতের মাটিতে পা-ই দেবেন না, দিলে আমাদের শাসকরা আতঙ্কে শিঁটিয়ে যাবে; ফিদেল কাস্ত্রোই একমাত্র বাকি লোক, যিনি নিজে নিজেই একটা বিপ্লব ঘটিয়েছেন, কারু কাছ থেকে একফোঁটা সাহায্য না-নিয়েই। আমাদের কালের খাঁটি নায়ক যদি কাউকে বলতে হয় তো তাঁকেই। সত্যি-যে, চে আমাদের আবেগের বনানীতে দাবানল জ্বালিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোন্ সুদূর বলিভিয়ায় চিহ্নবিহীন এক কবরে শুয়ে আছেন। এদিকে ফিদেল তো এখানে এসেই হাজির।

কাস্ত্রোর দৃঢ় বন্ধু হাতটিকে যখন তাঁরা ঝাঁকান, যখন তাঁর ঈষৎ হতচকিত মুখটি তাঁরা পড়ে দ্যাখেন, কলকাতার এই প্রতিহত বামপন্থীদের মনে কোন্ চিন্তা খেলে যায় তখন? প্রবীণ পরিশ্রমীদের এ বেশ একটা প্রতিনিধিমূলক সমাবেশ, আদর্শের জন্য এঁদের অনেকেই সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন, অথচ, লক্ষ্যকে আজও মনে হয় যেন প্রথম দিনের মতোই সুদূর। বিপ্লব ঘটায়, সে কোন্ অনুঘটক? কেমন করে শুরু হয় তৃণভূমিতে দাবানল? কাস্ত্রোর বাক্‌পটুতা, যে-কোনো লাতিন মানুষের মতোই, প্রায় স্ব-শাসিত; বিপ্লবেরও কি তবে কোনো স্ব-শাসিত বৈশিষ্ট্য আছে—সময় এলেই সে আপনা থেকেই ঘটে যায়? আপনি নিজে তবে বিপ্লব প্ররোচিত করতে পারেন না, ইতিহাসকে ত্বরান্বিত করতে পারেন না?

কারণ, বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে মনে হয় বিপ্লব বুঝি আপনার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে, এক্ষুনি ঢুকে পড়বে বলে হাঁক পাড়ছে। এই তিরিশ বছর পরেও আবার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে মন্বন্তরের। খাদ্যশস্য অপ্রতুল, দুর্মূল্য আর বিসদৃশ বণ্টনব্যবস্থার অধীন। বুভুক্ষুরা রোজ দলে দলে ঢুকে পড়ছে নগরীতে। সি. এম. ডি. এ. মারফৎ গত তিন বছরে নাকি প্রায় একশো কোটি টাকা কলকাতার উন্নয়নের খাতে ব্যয় করা

হয়েছেঃ তা কিন্তু একতিলও ভাঙন রোধ করেনি। কাজ জোটানো সুকঠিন; শহরের সত্তর ভাগ লোকের আদপেই কোনো উপার্জন নেই। পৌর ব্যবস্থাগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখোমুখি টলছে; কোনো শূওরের খোঁয়াড়কেও কলকাতার বস্তি লজ্জা দেবে। পরিবহণ ব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠেছে। লোকের—এমন-কি যারা এক-আধটু খাদ্য জোগাড় করতে পারে, তাদেরও, ক্যালোরি, আয়রন, খাদ্যপ্রাণ, প্রোটিনের অভাব কিছুতেই ঘোচে না। যদি সামাজিক নিপীড়ন, মুষ্টিমেয় কর্তৃক বহু মানুষের শোষণ—দশকের পর দশক ধরে যা চলে আসছে—বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারত, এ-তল্লাটে তবে তার কোনো অভাব থাকত না। তাহলে কোন্ সে বস্তু বাধা দিচ্ছে ইতিহাসের গতিকে, পেছিয়ে দিচ্ছে বিপ্লবের লগ্ন? সে কি এই তথ্য যে আপনি আরো-বৃহত্তর কোনো রাজনীতির অংশ, আর অংশ কখনোই সমগ্রের চেয়ে বড়ো হতে পারে না? না কি আপনার সাংগঠনিক ক্ষমতা কস্মিনকালেও দৃঢ়মূল পাতিবুর্জোয়া রীতিনীতি পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনি? না কি আপনি যা-কিছু করেছেন, বহু মানুষের আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, শত-শত শহীদ সত্ত্বেও, সে কেবল ছিল নিছকই একটি বিপ্লব-বিপ্লব খেলা, আন্দোলনকে কোনো দিনই ইস্পাতের ইন্দ্রজাল স্পর্শও করেনি? অথবা কোনো দিনই কোনো মিল ঘটেনি আপনার চিন্তার সঙ্গে কাজের? ফিদেলকে যখন তাঁরা অভিনন্দন জানান, কলকাতার প্রবীণ বামপন্থীরা নিশ্চয়ই মনে মনে হেঁয়ালিটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন? মানি যে, বিপ্লব কখনও আমদানি বা রপ্তানি করা যায় না, কিন্তু তবু, কী আপনারা শিখেছেন ফিদেলের সাফল্য থেকে, আর এ প্রশ্নও করা যাক, চে-র ব্যর্থতা থেকে? না কি এ নিছকই একটা কাকতালীয় ব্যাপার।

আর ফিদেল? তিনিই বা কী লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর ঐ রহস্যময় অর্ধ কৌতুকস্নিগ্ধ হাসির আড়ালে? যখন তিনি কলকাতায় নামেন, তখন, হয়তো অনিবার্যভাবেই লেনিনের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর মনে পড়ে যায়? তিনি কি নিজের মনে হাসেন? সে কি এইজন্যই যে লেনিন—পেছন ফিরে তাকালে এটাই মনে হয়—ভাবীকথক হিসেবে এমনি আকাট

প্রমাণিত হয়ে গেছেন? না কি অদৃষ্টের এই পরিহাসই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখে, যে তাঁকে এভাবে দু-বাহু বাড়ায়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কেবল বামপন্থীরাই নয়, বরং বুর্জোয়া, ঔপনিবেশিকদের দালাল কলকাতার সবচেয়ে জঘন্য পুঁজিবাদীরাও—এদিকে তাঁর বিমানকে সাংহাইতে কোনো উচ্ছল অভ্যর্থনাই জানানো হবে না? না কি এ-চিন্তায় তাঁর হাসি পায়নি, কষ্টই হচ্ছে? কলকাতার এই পরিত্যক্ত বিমানবন্দর থেকে কোন্ স্মৃতি নিয়ে তিনি ফিরে যাবেন? অনুন্নয়নের স্মৃতি তো নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কোন্ জাতের অনুন্নয়ন? বিস্তৃত বিশাল আখের খেতে জড়ো-হওয়া জনতার কাছে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর কি কোনো বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার থাকবে? সে কি হবে এই কথাই যে কেমন করে, কেন, কিছুলোক চিরকাল তাদের বিপ্লব থেকে বঞ্চিত হবে, যেহেতু তাদের নেতারা পুঁজিবাদী অপকর্মের শিকার হয়ে পড়ে, যেহেতু তারা কিছুতেই পাহাড়-পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়তে চায় না, যেহেতু পদ্ধতি এখনও নিখুঁত নয়, সুঠাম নয়? না কি তিনি আঁকড়ে ধরবেন লৌকিকতার রীতি, এই বিমানবন্দরে যেমন সুবোধ ভঙ্গি তাঁর, তেমনি থেকে যাবেন তিনি, কলকাতার অকথ্য দুর্দশার সব দায় চাপিয়ে দেবেন অতীতের ঘাড়ে, কোনো সুদূর সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের ওপর? তিনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, যে-দুর্দশা তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত হল তা কোনো পেছিয়ে পড়া বিলম্বিত—পারম্পর্যের ফলাফল, যে গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, না কি আর দু-ঘণ্টা পরেই তাঁকে মাদাম গান্ধির হাত ধরে ঝাঁকাতে হবে বলেই রাশ আলগা করার কোনো উপায়ই তাঁর হাতে নেই? তাঁর মনে কি এই চিন্তাটাই ভাসছে যে তাঁকে চিনি বিক্রি করতে হবে, এবং তার বিনিময়ে পেতেও হবে কিছু, যে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই চিনি তিনি শুধু কিছু-কিছু লোকের কাছেই বিক্রি করতে পারেন—সকলের কাছে নয়, অন্যদের কাছে নয়? না কি আবেগচালিত এই বঞ্চিতদেরও সম্মান করা উচিত? কলকাতার বামপন্থীদের পাঁচমিশেলি ভিড়ের কোন্ স্মৃতি তিনি বহন করে নিয়ে যাবেন? তিনি কি নিছকই আরেকজন ব্যঙ্গবাগীশ? কোনো অকল্পনীয় জনতার ভিড়ে সুরাটের

পার্শিদের মধ্যে, অলডাস হাক্সলির মতো লাগামছেঁড়া ব্যবহার করাটাই তাঁকে মানায় ? না কি তিনি সারবাঁধা এই লাজুক মানুষদের হাত পর-পর ঝাঁকিয়ে যান যখন, তাঁর কি মনে পড়ে যে তিনি কমরেডদের মধ্যে আছেন, কোম্পেনিয়েরোদের মধ্যে, এঁরা তাঁরই ভাই, একই সংগ্রামের সহযোদ্ধা ? কৌতূহলী জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে, তাঁর কি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের বিশ্বাস আরো সমর্থন পায়, অটুট হয় ? তিনি কি সেই অতিরিক্ত আশ্বাস পান যে কুবা বেঁচে থাকবে এমন-কি ভারতের জনগণের মধ্যেও ? কেউ একজন যখন চিলি আর সালভাদোর আইয়েন্দের কথা তোলে, তাঁর ভেতরটা কি ঝলসে ওঠেঃ ফ্যাসিবাদ চলবে না, চিলির করাল খবর সত্ত্বেও, আমরা শেষ অব্দি জিতবই ?

আধঘণ্টা হুড়মুড় করে কেটে যায়। ফিদেল তাঁর হাত আর পুরু চুরুট দিয়ে সেই চিরচেনা ভঙ্গিগুলো করেন। হুড়োহুড়ি বিদায়-সম্ভাষণের সে এক তালমানছেঁড়া ব্যস্ততা, ইংরেজিতে আর ইংরেজি থেকে বাংলাতে দোভাষির চটপট অনুবাদ, মুষলধারে অতিশয়োক্তির অলংকারের বর্ষণ—দু-তরফ থেকেই, তর্জমার তাড়াহুড়োয় কোথায় হারিয়ে যায়। হুজুগে স্তাবকরা এত খুশি কখনো বোধ করেনিঃ সুপুরুষ, ছ' ফুট লম্বা, সারা গায়ে লাল আভা, তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি ঝলমলে হেসেছেন, তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি হাত নেড়েছেন। ফিদেল হেঁটে যান বারান্দা দিয়ে, সিঁড়িতে পেঁছোন, উঠে পড়েন, ফিরে দাঁড়ান, আবার হাত নাড়েন, বিমানের আঁধার ভেতরটায় মিলিয়ে যান। বিমানের এঞ্জিন ঝগঝগ করে ওঠে, পেছনটা ওঠে, এই-যে উঠে পড়েছে আকাশে। মন্ত্রমুগ্ধ ভিড় কিছুক্ষণ হাত নেড়ে সাড়া দেয়, দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ, আর তারপর টুপটাপ খ'সে পড়ে। প্রশ্নটা তবু থেকেই যায়ঃ বিপ্লব কি আসন্ন ? সে-কোন্ জিনিস বিপ্লব ঘটায়, সফল করায় ? আপনি যখন গাড়ি করে শহরে ফেরেন, আপনার চোখে পড়ে যায় বুভুক্ষুরা খাদ্যের খোঁজে গ্রামগঞ্জ উজাড় করে ধুঁকতে-ধুঁকতে আসছে। তাদের অনেকেই—দু-একদিন সবুর করুন—মরবে। মাঝে-মাঝে তাদের মৃত্যুসংবাদ এলোমেলো বেরুবে খবরকাগজে ;

লোকসভার আলোচনায় এই মৃত্যুর কারণ দর্শানো হবে অনাহার নয়, অপুষ্টি। একবার মহোৎসব শেষ হয়ে গেলেই, বামপন্থীরা তাদের বিরামহীন আন্দোলনের আরেকটিকে বাজারে ছাড়বে। কিন্তু হেঁয়ালিটা থেকেই যাবে : এই বিপ্লবী হাত-ঝাঁকুনির মাশুল কী, লাভ কী? কেউ কি আদৌ জানে কেমন করে গড়ে তুলতে হয় বিপ্লব, তাকে স্পর্শসহ অবয়ব দিতে হয়? আমরা নাক শিঁটকোই আমাদের বিপ্লব করার দীন চেষ্টার উদ্দেশে, কিন্তু ফিদেলের সঙ্গে আধঘণ্টা সত্ত্বেও, আমাদের মধ্যে কে সেই সুভাগা আছেন যিনি এর চেয়ে শ্রেয়তর কোনো বিকল্প হঠাৎ কুড়িয়ে পাবেন?

১৫

কর্তার ভূত

মে দিবস কলকাতায় তথা পশ্চিমবাংলায় একটি সবেতন ছুটির দিন। বিকেলের দিকে শ্রমজীবী মানুষের অফুরন্ত মিছিল ময়দানে এসে জড়ো হয়ঃ নেতারা আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বভ্রাতৃত্ব উঁচুগলায় প্রচার করা হয়। কিন্তু কী একটা তবু খচখচ করে, নিদেন-পক্ষে একটা মৃদু অস্বস্তির ভাব। যে নেতারা ভাষণ দিচ্ছেন তাঁরা সবাই একটা বিশেষ পরিধির মানুষ। নামের তালিকা দেখুনঃ যে-কোনো বামপন্থী দলের ধ্বজাবাহকই তাঁরা হোন-না কেন, প্রত্যেকেই উচ্চবর্ণের, উচ্চবংশের হিন্দু। পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় বাম রাজনীতির গোটাত্রিশেক রকমফের পাওয়া যায়, কোনোটাই উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতার মন্ত্রণা ছাড়া বাঁচে না।

বিদ্রূপ হয়তো এখানে অসংগত, কারণ এটা রাজনৈতিক দলগুলির একটা সাধারণ ব্যাধি, শুধু বাম রাজনীতির বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু সেটাই আসল কথা। স্বতন্ত্র দলে যদি সমাজের উঁচুতলার চটকদার নায়ক-নায়িকাদের ভিড় হয়, তাহলে সেটা কোনো খবর নয়। যে রাজনৈতিক দল সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ এবং ধনিকগোষ্ঠী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্যান্য স্তরভেদের রক্ষক, তার নেতৃত্বকে সমাজের উঁচুতলার প্রভাবেই চালিত হতে হবে। কিন্তু যে-সব দল শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সশস্ত্র বিপ্লবের কথা প্রচার করে থাকে, তাদের মধ্যেও এই লক্ষণের স্থায়ী প্রাদুর্ভাব আমাদের বিচলিত করে। কারণগুলো অবশ্যই অনুসন্ধান করা যায়। এক সময়ে যাঁরা বামপন্থী নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা জাতীয় আন্দোলনেরও অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণীর

সন্তান, বড়ো জমিদারশ্রেণীর সন্তান। স্বাধীনতার পর জাতীয় আন্দোলন যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, তখন তাঁরা বাম রাজনীতির দিকে সরে আসেন। তাঁদের চিন্তাধারার বদল হয়, কিন্তু বংশানুক্রমিকতাকে তো পালটানো যায় না ; শ্রেণী ও বর্ণগত ভিত্তি অপরিবর্তনীয়। কাজেই আপনি তাঁদের নিয়ে ইতিমধ্যে ঠাট্টা করুন আর যাই করুন, তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনীতির ভাগ্য নির্ধারণ করছেন। মাঝে-মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে হয়তো শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত কেউ সামনের সারিতে আসতে পেরেছেন, কিন্তু বামপন্থী নেতৃত্বের আগাগোড়াই যে নামের তালিকা পাওয়া যায়, তার একটা নির্দিষ্ট চরিত্র আছে। দাশগুপ্ত ও লাহিড়ি থেকে শুরু করে মজুমদার ও চাটুজ্যে পর্যন্ত সবই নিখুঁত উচ্চবর্ণের পদবি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়া আর কিছুই নেই।

হয়তো এটা তেমন কিছু অসাধারণ নয়। মহারাষ্ট্র বা গুজরাট পর্যন্ত গেলেও একই দৃশ্য দেখা যাবে। বাঙালি পরিবেশে কিন্তু এটা আরো-এক অর্থ নিয়ে দেখা দেয়। উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু নামগুলির সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা পুরোনো নাড়ির যোগ আছে। খুব বেশি পেছনে যাবার দরকার নেই। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও হয়তো অমুক বাঙালি বামপন্থী নেতার বাবা কিংবা ঠাকুর্দা উত্তর বা পূর্ববঙ্গের কোনো সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। বংশধরটি সেই সামন্ততান্ত্রিক শিকড়গুলি ছিঁড়ে চলে এসেছেন। তাঁর দৈনন্দিন মানুষ হবার সঙ্গে যে মানসিকতা ও জীবনধারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তার স্মৃতির কাছ থেকেও বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু পরিবর্তনটা সম্পূর্ণ হয়েছে কি, কিছুই কি অবশিষ্ট নেই ? সামন্ততান্ত্রিকতার প্রধান নির্ভর ছিল অন্তঃকলহ। প্রভুর আত্মগরিমাই যার উৎস। গরিব অসহায় কৃষককে শোষণ করে অথবা দাঙ্গা এবং মামলার সাহায্যে অন্যান্য জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে জায়গির ও রাজস্ব বাড়ানোর পেছনে ছিল এই আত্মগরিমার প্রভাব। বিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর দাঙ্গাবাজিই ছিল অস্তিত্বের মূল নীতি। অসহিষ্ণুতাই ছিল আদর্শ ; আমারই অগ্রাধিকার, আর কারো নয়, টিঁকে থাকা আর লক্ষ্মীলাভ করায় আমারই দাবি আছে, অন্যেরা যদি নতি স্বীকার না-করে, তাদের

খতম করতে হবে। আবার অসহিষ্ণুতার অন্যপিঠ হল ঈর্ষা, সর্বগ্রাসী ঈর্ষা। যে ওপরে উঠেছে, তাকে ছলে বলে কৌশলে নিচে নামিয়ে আনতে হবে। আজকাল এধরনের পেছন থেকে ছুরি চালানোকে ভোঁতা পাতিবুর্জোয়া মনোবৃত্তির সঙ্গে এক করে দেখা হয়। কিন্তু এটা যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থারই উত্তরাধিকার, তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা সামন্ততান্ত্রিক অতীতকে অস্বীকার করে চলে আসি। সচেতনে হোক আর না-হোক, আমরা শ্রেণীমুক্ত হবার চেষ্টা করি, কিন্তু চেতনার প্রবাহে কোনোখানে কিছু-কিছু বাধা থেকে যায়। যতই-না কেন তাঁরা তৎপর হোন, বামপন্থী নেতারা তাঁদের এই আত্মম্ভরিতার উত্তরাধিকার থেকে মুক্তিটাকে প্রায় অসম্ভব বলে উপলব্ধি করেন। দু-রকমের ব্যর্থতা এর থেকে আসে: প্রথমত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে নেতৃত্ব দেয় কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক, কিছুটা বুর্জোয়া কয়েকটি চরিত্র, আর দ্বিতীয়ত, যেটা আরো বড়ো বিপদ, এই নেতারা পার্টির মধ্যে আমদানি করেন এমন সব বদ্ধমূল ধারণা আর আচার আচরণ, যা তাদের উত্তরাধিকারের অংশ। সামন্ততান্ত্রিক প্রথা অন্তঃকলহকে প্রশ্রয় দেয়, অসহিষ্ণুতাকে আদর্শ বানায়, সংকীর্ণ ঈর্ষাকে মহিমান্বিত করে। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বিপ্লবী পার্টিগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে তাকান। তাদের একটা প্রধান চরিত্রলক্ষণ কি পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা নয়? কে কার চেয়ে বেশি এগিয়ে গেল, সেই সম্ভাবনাজনিত বিদ্বেষ নয়? এই সোজাসুজি সত্যি কথাটা অবশ্য কেউই স্বীকার করবেন না। অসহিষ্ণুতা গোপন থাকবে কঠিন মতাদর্শগত বুলির তলায়, যা আসলে ব্যক্তিগত বিরোধ তাকে দুরপনেয় নৈর্ব্যক্তিক তফাৎ বলে দেখানো হবে। সাধারণ পাতি-বুর্জোয়া ঈর্ষাদ্বেষকে মতাদর্শ এবং রণকৌশলগত যৌক্তিকতার মুখোশে সজ্জিত করা হবে। একটা আদর্শ বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবেশে হেগেলিয় দ্বান্দ্বিকতার অন্তহীন উন্মোচন ঘটবে। অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষের সর্পগহ্বর থেকে বৈপরীত্য মাথা চাড়া দেবে। আবার দীর্ঘমেয়াদি টিঁকে থাকার খাতিরেই বিপ্লবী দলগুলিকে শাসকশ্রেণীর প্রতিটি আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বাধ্য হয়েই একজোট হতে হবে, তখন আবার

অনায়াসেই একধরনের মিল ঘটবে, তারপর আবার আসবে সংঘাতের পালা, পরস্পরকে গালপাড়া চলতে থাকবে, যতদিন না আবার সত্যি-সত্যি পালে বাঘ পড়ে। এইভাবেই চলবে, ভোরের সঙ্গে বিপ্লবের উদয় আর হবে না।

এই রীতিটাই থেকে গেছে, আর বারবারই পুনরাবর্তিত হয়। কেন্দ্রের শত্রুতা, আর বিভিন্ন শরিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ এবং সামগ্রিক নানা ভুলত্রুটি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়তো আজ পর্যন্ত টিঁকে যেতে পারত, এবং এ অঞ্চলের ইতিহাস যথার্থই অন্যরকম হত। কিন্তু যে পরিবর্তনশীল উপাদানটি নিয়ামক হিসেবে দেখা দিল তা হল পারস্পরিক ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সন্দেহ। যুক্তফ্রন্ট চালু রাখতে হলে বাম-দলগুলির যে-কোনো একটিকে পুরোভাগে আসতে হত। আর হয়তো সেই দলটি বেশি ক্ষমতা পেয়েই অন্য শরিকদের গ্রাস করার চেষ্টা করত। এটা হতে দেওয়া যায় না, বরং বিপ্লবী বামপন্থীদের সরকারের পতন ঘটুক। আজ এই দলগুলিকে প্রশ্ন করুন। কেউ ১৯৭০ সালে যুক্ত-ফ্রন্ট থেকে সরে আসার কারণ দেখাবেন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ। কেউ বা শরিক দলগুলির কোনো-একটির মধ্যে বৃহৎ দলসুলভ গোঁড়ামির লক্ষণ নিয়ে কথা বলবেন। আবার কারো নালিশ এই যে কোনো দলই রাজনৈতিক খেলার নিয়মগুলি মেনে চলছিলেন না ; কেউ-কেউ আবার একটি বক্তৃতা দেবেন, যার সারমর্ম, এই যে ঐ পর্যায়ে বামপন্থীকে নিষ্ফলা সংসদীয় রাজনীতির পচন থেকে উদ্ধার করার জন্যই যুক্তফ্রন্টের পতন প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা ছাড়া এগুলো আর কিছুই নয়। আসল চালিকাশক্তি ছিল ভয়—একটি দল পাছে অন্যান্য দলের চাইতে এগিয়ে যায়, সেই ভয়, আর ভয় থেকে ঈর্ষা ; সময় থাকতে সেই দলটিকে খতম করে দিতে হবে। সেই প্রচেষ্টা বস্তুত ১৯৭০ সালে বাম রাজনীতিকেই খতম করার প্রচেষ্টায় গিয়ে দাঁড়ায়, ১৯৭২ সাল পর্যন্তও একই ধারা চলতে থাকে। সবেমাত্র ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের পরেই বাইরের ঘটনার অসহনীয় চাপে পড়ে বিপ্লবীরা আবার একে অন্যের ভালো দিকগুলো দেখতে শুরু করেছেন।

আপনি যদি ভেবে থাকেন এই ব্যাধি কেবল সংসদীয় গণতন্ত্রের মোহমুগ্ধ, খানিকটা সামন্ততান্ত্রিক, খানিকটা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রোথিত বামদলগুলিরই, তাহলে আপনার ভুল শিগগিরই ভাঙবে। নকশাল আন্দোলন আজ চৌচির হয়ে গিয়ে যে একশো রকমের টুকরোতে পর্যবসিত হয়েছে, তার দিকে তাকানোই যথেষ্ট। পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাত্ত্বিক লেখা এখনো চোরাই রাস্তায় হাতে-হাতে ফেরে, অমুক গুপ্তস্থান থেকে বা অমুক জেলখানা থেকে। পত্রপত্রিকায় সে-সব ছাপানো হয়, আর, চিন্তাধারা এবং রণকৌশলের মৌলিক তফাৎ ছিল বলেই যে আন্দোলন টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়ার দরকার ছিল, এই ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে করা হয় সেখানে। সত্যিই কি তাই? ওপরের মুখোশ খুলে দিলে দেখবেন জগৎকাঁপানো রণকৌশলগত তত্ত্বের পেছনে রয়েছে অতি তুচ্ছ, কিন্তু অতিশয় স্থূল পাতিবুর্জোয়া অন্তঃকলহের বীভৎস চেহারা, সে অন্তঃকলহে আজ আর এমন-কি সামন্ততান্ত্রিক গরিমারও লেশ মাত্র নেই। কলহ-গুলির ভিত্তি যতটা তত্ত্বের ওপরে ততটাই পার্টির ভাঁড়ারের দখল নিয়ে, অথবা কার সাহায্যে কে জোগাড়যন্ত্র করে চীন বেড়াতে যেতে পারবে তাই নিয়ে। অথচ ব্যক্তিগত দিক থেকে বীরত্ব, আদর্শনিষ্ঠা ও হাসিমুখে কষ্টস্বীকার করার নিদর্শন একেবারেই বিরল নয়।

ইতিহাস নাকি এভাবেই তার নিজস্ব গতিতে চলে। যে দলগুলির বর্তমানে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, তারা নীতি ও রণকৌশলের দিক থেকে পেছিয়ে পড়া দলগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এগোবে। এই বক্তব্যে বিশ্বাস রেখে সেইমতো খেলা চালাতে পারলেই ভালো হত—কিন্তু সন্দেহ থেকে যায় যে কর্তার ভূত গোটা পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে চেপে বসে আছে এবং সেটা মূলত নেহাৎই সাধারণ গ্রাম্য লাঠালাঠির ভূত।

১৬

এই ভিড় শীর্ণ, কুঞ্চিত

একে বলুন এক বিশিষ্ট প্রতীক্ষা। শয়ে-শয়ে তরুণ-তরুণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ; তাদের নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭২ সালের পরীক্ষায় বসবার কথা। ক্যালেণ্ডার বলছে এখন জুলাই ১৯৭৩, কিন্তু এখনও ১৯৭২-এর পরীক্ষা হয়নি। কপালে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো বছরের একেবারে 'ঘ্যানঘেনে' শেষটায় গিয়ে পরীক্ষা নেবে। ফল বেরুবে, কপালে যদি থাকে, ১৯৭৪-এর মাঝামাঝি কোনো-এক সময়ে। এমনি চলেছে, বছরের পর বছর, প্রতি বছরের পরীক্ষা নিয়ে, ষেটের কোলে বেঁচে-বর্তে থাকলে দেখবেন এমনিই চলছে। তথাকথিত শিক্ষাজীবনের এই কিঞ্চিৎ প্রলম্বনে, জড়িত প্রতিটি পক্ষ—বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক—সকলেই মৌন সম্মতি জানিয়ে বসে আছে। পরীক্ষা নেয়া আর না-নেয়া, পরীক্ষায় পাস করা বা না-করা, তাড়াতাড়ি করে কাজ করা আর প্রাণান্তকর দেরি—এর সন্ধিস্থলে অনিঃশেষ মুহূর্ত আপনার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। কোনো ছায়াই নেমে আসে না এর মধ্যে, সময়ের ধারণাটাই হয়ে উঠেছে বিদেহী, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবকিছুই পরিণত হয়েছে চরম ঔদাসীন্যের এক নিদর্শনে।

কিংবা হয়নি হয়তো। হয়তো কিছু অতিবিচক্ষণ হিসেবনিকেশ বুঝিয়ে দিতে পারবে চলতি ক্রিয়াকলাপের প্রতীয়মান অর্থহীনতা মেনে নেবার সিদ্ধান্তটাকে। কে জানে, হয়তো এই বিশেষক্ষেত্রে, বিচারবিবেচনা করে দেখা গেছে যে কিঞ্চিৎ চটপট কাজটাকে সুঠামভাবে সম্পন্ন করা, প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করা, হত শ্রেয় আয়োজনের প্রতিকূল। কারণ, যতদিন-না পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, কাগজে-কলমে এই তরুণ-তরুণীরা ছাত্রই

থেকে যাবে, আর তাই, সংজ্ঞার্থ মতন, এদের কিছুতেই চাকরিসন্ধানী শিক্ষিত বেকার বলে গণ্য করা যাবে না। কারণ, যতদিন তারা ছাত্র থাকবে, এই ছেলেমেয়েরা তাদের উদ্বেগ দুশ্চিন্তা স্থগিত রাখতে পারবে, আর অন্যদেরও মাথাব্যথা উপশম না-হোক স্থগিত থাকবে। তারা নিজেরাও তা জানে, বিশ্ববিদ্যালয়ও তা জানে, আর সরকারও এই রংদার সত্যটিতে যৎপরোনাস্তি আমোদ পায়। অবস্থা যখন এই, যে, সৃজনশীল কাজে এই ছেলেমেয়েদের গ্রহণ করার সত্যিকার ক্ষমতা এই সমাজব্যবস্থার নেই, তখন ছাত্রজীবনকে প্রলম্বিত করার এই ভড়ংটাই বরং শ্রেয়তর সমাধান। এমনতর সমাধানে যে মনস্তাত্ত্বিক ভাঙন ও ক্ষয় জড়িয়ে থাকে, তা নিতান্তই অবহেলার যোগ্য, আর সারা দেশের কথা ভাবলে, এদের কাজ জোটাবার জন্য সংঘবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযান চালালে, দেশের প্রকৃত সংগতির যে-পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করতে হত, এ-অবস্থায় তার চেয়ে খরচ লাগবে ঢের কম। পরিভাষা আওড়ানো অর্থনীতিবিদেরা যেমন বলে থাকেন, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা না-করায় হারানো সুযোগের যে মাশুল দিতে হয় তা অনুপাতে এতই কম যে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যায়।

তো, তারা অপেক্ষা করে, যুবসমাজের এই বিপুল সমাবেশ। এই জটলা অবশ্য কেমন যেন শীর্ণ, কুঞ্চিত, বয়েসের তুলনায় ঢের প্রবীণ, ঢের অভিজ্ঞ, ঢের বিজ্ঞ। আপনি যদি এ-তল্লাটে পদার্পণ করেন, তো তারা নিতান্ত নিস্পৃহভাবে নিরাসক্ত গদ্যে জানিয়ে দেবে, যে, অবস্থাটা এরকমই থাকবে চিরকাল। তা সে যখন যাকে যেখানেই জিগেস করুন-না কেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—সব বিশ্বাস ও বিচারবোধ শিকেয় তুলে রাখতে হবে। পাস করা আর না-করা, প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি পাওয়া বা না-পাওয়া, কিছুতেই কিছু এসে যায় না, কিছুতেই কোনো তারতম্য হয় না: কাজের যখন এতটাই অভাব, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বাড়তি খেতাব—কিংবা তার অভাব—অনায়াসেই, এবং সচরাচর, গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়। কী এসে যায়, কাজেই, যদি সূচি থেকে দু'বছর পেছিয়ে থাকে পরীক্ষা, কিংবা অবশেষে সে-পরীক্ষা যখন নেয়া

হয়, সে যদি পরিণত হয় প্রহসনে? ডিগ্রি যেহেতু অনেককাল আগে থেকেই বাজারে কাটবার ফুশমন্তর নয় আর, কী এসে যায় যদি বড়োগোছের সামরিক অভিযানের ভঙ্গিতে গণটোকাটুকির ব্যবস্থা করা হয়? নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচতে দিন, পাশ কাটিয়ে যান, অন্যদের রাস্তা করে দিন, কেননা আপনারা সকলেই তো এক বিশাল ভ্রাতৃত্বের অংশ, আশাহীন এক ভ্রাতৃত্ব, বেকারদের সেই নিষ্করুণ জনসংঘ! বরং যদি কোনো কৌশলে সেই জনসংঘে নাম লেখাবার দিনটাকে পেছিয়ে দেয়া যায়, তার জন্য একটা মাশুল বা কিস্তি তো দিতেই হবে। কারণ, এখনও যতক্ষণ নিজেকে ছাত্র বলে বর্ণনা করা যায়, অন্তত কিছুক্ষণ মুলতুবি রাখা যায় মরীয়া হতাশা, দায়িত্ব কাঁধে নেবার অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে অন্তত সাময়িক অব্যাহতি জোটে: দয়া করে তাদের ছাত্র থাকতে দিন, অন্তত যতদিন পুরোপুরি লোক না-হাসিয়ে সেটা পারা যায়, ততদিন। কর্তৃপক্ষ অভূতপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে সায় দেয়: আয়োজনটা সকলের কাছেই চমৎকার ঠেকে। যতবার পরীক্ষা পুনরায় পেছিয়ে যায়, ততবারই এটা হয়ে ওঠে গোল্লাছুট খেলার জাঁকজমক ও মাহাত্ম্যের আরো-একটি অপ্রতিম উদাহরণ।

আর যেহেতু স্পষ্ট জানা নেই ভবিষ্যতের রূপ সত্যি কী অথবা সত্যি কবে পরীক্ষার দিন ঘোষণা করা হবে, এই তরুণ-তরুণীরা পালে-পালে যায় বোম্বাই ছবি দেখতে। এই ছবিগুলো সবাইকে একেবারে সমান করে দিয়েছে: নাক উঁচু বাঙালিরা অব্দি পুরোপুরি কুপোকাৎ। এমন-কি সত্যজিৎ রায়ের কোনো ছবিও কলকাতার সিনেমায় টেনেটুনে চার পাঁচ সপ্তাহ চলে; মফস্বলের কোনায়খামচিতে তো আরো কম। কিন্তু রাজেশ খান্না শর্মিলা টেগোর মার্কা খাড়াবড়িথোড় চলবে মাসের পর মাস। বোম্বাইয়ের অনর্গল অবদানগুলো স্থূল, অশালীন, কুরুচিকর, অবাস্তব। তাতে কী? যত অসম্ভব, তত মজা, তত বেশি তাদের প্রলোভন, সুড়সুড়ি। কুড়ির এদিক-ওদিক অপ্রতিভ হেলে-থাকা তরুণ-তরুণীরা এখন থেকেই জানে যে কোন অন্ধকার তাদের জন্য ওৎ পেতে আছে। স্কট-ফিট্জেরাল্ডের একটা ঝিলিক এখনও হয়তো হাওয়ায় লেপ্টে আছে: বলা হবে আপনাকে, এখনও রজনীর স্নিগ্ধ বা উতলা

হওয়া উচিত, খড়খড়ি নামিয়ে আনার মতো দেরি এখনও হয়নি। কিন্তু, দেখছেন তো, কোনো টালসামাল দেয়া গোছের বিকল্পও তো খাড়া করা যাচ্ছে না ; এই তরুণ-তরুণীদের একদিন-না-একদিন তো জানিয়ে দিতেই হবে যে তাদের সকলের নামে রায় বেরিয়ে গেছে ; এক্ষুনি অবশ্য তারা তা খানিকটা আঁচ করতে পারে ; যাক না দু-একদিন, অথবা সপ্তাহ, কিংবা মাস, না-হয় বছরই, তাদের কানের পাশে যথাসময়ে নামতাটা পড়ে শোনানো হবেই। অনিবার্য যে-অন্ধকার তাদের নাগাল ধরে ফেলল বলে, তারই জন্য অপেক্ষা করতে-করতে তারা বেছে নিয়েছে বোম্বাই ছবির অবাস্তবতার পালিয়ে যাওয়া। বেপরোয়া কোনো স্বপ্নে গা ভাসাতে অথবা অন্যের রগরগে অভিযানের শামিল হতে। এখনো অব্দি তো কোনো ট্যাকসো লাগে না। তারা তাই ফ্যানটাসিগুলো শুষে নেয় ; তারা, অন্যের মারফৎ, প্রায়-বায়বীয় শর্মিলা টেগোরের বিলাসবহুল আলিঙ্গনে নেতিয়ে পড়ে ; তেমনি ভাবেই, অন্যের মারফৎ, তারা কোনো শশীকাপুর বা শত্রুঘন সিন্‌হার দুর্ধর্ষ অভিযানে টকঝাল রোমাঞ্চ অথবা উত্তেজনার মধ্যে রক্তের তেজ খুঁজে পায়। তারা লঙ্ঘন করে সব অলীক অসম্ভব শিখর, লাফিয়ে ওঠে সব কাল্পনিক ঘোড়ার পিঠে। সেই টেকনিকালার, প্যাচপেচে তালমান ছেঁড়া অসম্ভবের দেশে, তারা, দেড়শোটি সম্মোহিত মিনিট ধরে, অনুভব করে এমন-কি তাদের শারীরিক স্পর্শাতুরতারও রূপান্তর ; যা দুর্মূল্যের বাজার, তাতে এই ভূরিভোজ সস্তাই বলতে হয় ; একবার সিনেমা থেকে বাইরে বেরুলেই তো দুঃসহ দারিদ্র্যের হতশ্রী, বেকারিত্ব, অধঃপাত, ক্ষুধা এবং আরো সব। কিন্তু যেতে দিন না দিন-দুই, কুড়িয়েবাড়িয়ে টাকা-দুই জোগাড় করতে পারলেই আবার লাফিয়ে ঢুকে পড়া যাবে সিনেমার মোহময় লাস্যে আর আবার উধাও হওয়া যাবে হালকা মেঘের গুঞ্জরিত ভেলায়, লাস্যময়ী নায়িকা, অকল্পনীয় দেহশ্রী আর অপরিমিত ঐশ্বর্যের দেশে।

নয়াদিল্লিতে কেউ-একজন নিশ্চয়ই হিংস্র তৎপরতা ও জেদের সঙ্গে বোম্বাই ছবির ফরমূলাগুলো তলিয়ে দেখেছে। অন্তত দুটি মহান কাজ সম্পন্ন করেছে বোম্বাই ছবি। প্রথমত, তারাই পেরেছে এই বৈচিত্র্যময়

ভারতবর্ষের সুড়ঙ্গলীন ঐক্যের সূত্রটাকে ফাঁপিয়ে বা ফেনিয়ে তুলতে। ভারতীয় জীবনে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকের অনুসন্ধান তারা সেরে ফেলেছে। পঞ্জাবের চাষী বা উত্তরপ্রদেশের মিস্ত্রি, বিহারের সাঁওতাল খেতমজুর অথবা পশ্চিমবঙ্গের কেরানি, নাগাল্যাণ্ডের যাযাবর অথবা তামিলনাড়ুর ব্যাঙ্ককর্মী কিংবা কেরালার পেশাদার লোক-খেপানো মানুষ —সে যেই হোক-না কেন, বোম্বাই ছবির রিরংসাজাগানো মায়ামোহ কেউ এড়াতে পারবে না। চুরমার হয়ে যায় ভাষার বিরোধিতা, গুটিয়ে পড়ে থাকে ছোটোখাটো আঞ্চলিক বারফাট্টাই—যে-মুহূর্তে ভিড় জড়াজড়ি করে বসে রুপোলি পর্দার ভোজবাজির সামনে, আর প্রণয়োৎফুল্ল কোনো হেলেন যেই শুরু করে নাচের নামে তার সার্কাস। বিপুলতর তাৎপর্যটি নিশ্চয়ই এটাই যে বোম্বাই ছবি সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছে বেদম বিস্মরণের চমৎকার শিল্পটি। নিষ্ফল এই স্বপ্নগুলো ; বাস্তবতার শতকরা একশোভাগ বিকল্প যে কিছু হতে পারে, তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত না, যদি-না বোম্বাইয়ের ছবি ফুটে উঠত পর্দায়। বোম্বাই ছবি তরুণ-তরুণীদের বুঝিয়ে ছেড়েছে যে আসলে আর নকলে ভেদ করার কোনো মানে হয় না ; বস্তুত আস্‌লি মাল তো কোনো সবপেয়েছির দেশের সম্পত্তি, সেই যাকে বলে নেই-দেশ, আর সেটাই তো বিকল্পটাকে এমন তীব্র পছন্দ করার বিপুল কারণ।

কেউ-একজন অন্যখানে শিখেও ফেলেছে পাঠটা। ১৯৬৯ থেকে শুরু করে, ভারতীয় রাজনীতিতে যা কাণ্ড চলেছে তা কেবল বোম্বাই ছবির আদিরূপেরই একটি কিমাকার, দুঃসাহসী, বেপরোয়া সংস্করণ। পরিবেশন করো অতিরঞ্জিত সব প্রতিশ্রুতি, বাণী ছোটাও উপহাস্যকর সব অসম্ভাব্যতার, তোমার শ্রোতাদের গুচ্ছের আকাট পথ্য খাইয়ে একেবারে ঝিম ধরিয়ে দাও। ফরমূলাটা কাজে লেগেছে, অতএব আরো কাজে লাগাও। প্রাগ্‌-ইতিহাস থেকে তো কতবার এটাই হয়ে এল যে, শৌখিন জীবেরা কিছুদিন পরেই দৃশ্য—বা বাজার—থেকে হঠিয়ে দিয়েছে পেশাদারদের। ওদের সাবধান হওয়া উচিত, ঐ হেলেন আর শর্মিলা টেগোরদের : তাদের রুজি-রোজগারে ইতি পড়ার মহাবিপদ প্রত্যাসন্ন।

১৭

কবিকাহিনী কবিবাহিনী

আমার অনুমান, আপনার অনুমান আর আমাদের দুজনের প্রতিবেশীর অনুমান, তাদের যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করে গড় নিন, কিন্তু, একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখন নাকি প্রায় পাঁচশো কবিতার কাগজ আর পনেরো হাজার 'সক্রিয়' কবি আছেন। এই মুহূর্তে কত কাগজ আছে, সেটা অবশ্য শব্দার্থতাত্ত্বিকদের তর্কের বিষয়। কারণ কোনোটা হয়তো পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পের মতো পাঁচ বছরে একবার বেরোয়, কিংবা একবার বেরিয়েই তলিয়ে যায় বিস্মরণের গহ্বরে। অন্য অনেকগুলো নাকি আবার মাসিক, দ্বিমাসিক বা ত্রৈমাসিক প্রকাশন, তবে তাদের সাময়িকতা নির্ভর করে কখন প্রধান সম্পাদকের পকেটের হাল কিঞ্চিৎ ফেঁপে ওঠে। আবার, আছে সেই অন্য উদাহরণ, কবিতা আর ধরুন আমোদকে মিশিয়ে তৈরি-করা একটি বস্তু, দৈনিক সব কবিতাপত্র, যারা প্রতি বছর ছত্রাকের মতো গজিয়ে ওঠে কলকাতার যে-সপ্তাহ বা যে-পক্ষ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করার মরশুম। দু-একটি দলছুট বছরে, লোকে অবশ্য কবিতা ঘন্টিকীর কথাও শুনেছে। এইসব কাগজের জন্মমৃত্যু ও সাময়িকতা অবশ্য তীব্র অনুমানসাপেক্ষ, আর উদীয়মান অর্থনীতিবিদদের দল—অবশ্য যদি তাঁরা আগ্রহ বোধ করেন, তবেই—এ-ব্যাপারে কোনো-একটি মার্কভ প্রক্রিয়া, বা ঐজাতীয় কোনো-কিছু, প্রয়োগ করার অছিলায় দারুণ আমোদে মেতে থাকতে পারেন।

তবে বাংলা কবিতাপত্রগুলির সংখ্যাতত্ত্বের অতর্কিত প্রকৃতির তথ্য-সারণীতে খাবি খেতে-খেতেও, কেউ দৃঢ়তর জমিতে এসে দাঁড়াতে পারবেন, তিনি যখন সক্রিয় কবির সংখ্যা পরিমাপ করার চেষ্টা করবেন।

এখানেও অবশ্য সংজ্ঞার্থ নিয়ে একটা খিটমিটি আছে, তবে এ-সমস্যাটার মোকাবিলা করা যায় এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ বেছে নিলেই যে আমরা তাঁকেই সক্রিয় কবি বলব যিনি বছরে অন্তত এক ডজন কবিতা ছাপান পত্রপত্রিকায়। পক্ষান্তরে, তিনি এমন লোকও হতে পারেন যিনি কদাচিৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হন, অথচ তবু কেমন করে যেন বছরে দু-বছরে একটি করে কবিতার বই ছাপিয়ে বসেন। ধরা যাক, কবিতার কাগজের কোনো সাধারণ সংখ্যা জনাপঞ্চাশ কবির কবিতা ছাপে—কিছু কমবেশি হলেই বা ক্ষতি কী ; যদি ধরেও নেয়া যায় যে এঁদের কেউ-কেউ অনেক কাগজেই একাধিকবার প্রকাশিত হন, তবু কবিতার কাগজের অনুমিত সংখ্যা আর সক্রিয় কবিদের সংখ্যা বিষয়ে একটা-কোনো সুসমঞ্জ ছবি বেরিয়ে আসে কিন্তু—

ঘরে-ঘরে আসে-যায় চিন্তাশীল লোক, মুখে-মুখে কীন্‌স, মার্কস, পারেতোর নাম। কিন্তু, এদিকে, কবিতার এই অনর্গল, ভয়ংকর বিস্ফোটন নিয়ে কী করা যায় ? বাংলাদেশের এই কবিবাহিনী এই সংরক্ষিত ফৌজটাকে নিয়ে ? কবিতা সম্বন্ধে এই তীব্র আবেশকে কোনো অর্থকরী প্রস্তাবে রূপান্তরিত করা কি সত্যি অসম্ভব ? যে-সমাজ ভয়াবহভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের পথে ধাবমান, এমন-কি সেখানেও কবিতার ভূমিকা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করাটা বর্বরতার চেয়েও খারাপ। কবিতা বাড়িয়ে দেয় কোনো জাতির কল্পনার ঐশ্বর্য, কল্পনার বিভূতি ; কবিতায় অর্থ লগ্নী করা, তাই দর্শন ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বিনিয়োগ করার মতোই, এই ঐশ্বর্যকে বাড়ালেও আখেরে লাভ হওয়া উচিত। কল্পনার এই অপরিমেয় সম্পদই তো দেশে মেধাবী এনজিনিয়ার, দীপ্তিমান প্রয়োগবিদ বা কীর্তিপ্রভ পরিকল্পক উৎপাদন করতে সাহায্য করে। সমাজে কবিতার জোগান বাড়াবার জন্য, রাষ্ট্রের যে ক্রমবর্ধমান সদর্থক ভূমিকা চাই, এ-বিষয়ে তাই চমৎকার এক অর্থনৈতিক মামলা খাড়া করা যায়। আর এটা যদি দেখানো যায় যে সংগঠন ও শুভাকাঙ্ক্ষার মেলবন্ধন ঘটালে, এমন-কি অমূলক দাম আর সামাজিক ছাড়ের হারের ওপর নির্ভর না-করেও কবিতা প্রকাশনা থেকে সংকীর্ণ আর্থিক মুনাফাও

লাভ করা যায়, কবিদের পক্ষে ওকালতি তবে বেশ সম্মানের কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

ধরে নেয়া যাক যে পনেরো হাজার সক্রিয় কবিদের মোটামুটি অর্ধেক সংখ্যা প্রতি বছর একটি করে কবিতার বই প্রকাশ করবার জন্য তৈরি করতে পারবেন। তার মানে, লগ্নীর অর্থ যদি কোনো বিপুল প্রতিবন্ধক হয়ে না-দাঁড়ায়, বর্তমান তিন-চারশো বইয়ের বদলে বাংলাদেশে বছরে গড়ে সাড়ে-সাত হাজার কবিতার বই ছাপা হতে পারে। এমন-কি চাহিদা যদি অনুমিত বর্তমান ঘেরের মধ্যেও আটকে থাকে, সাংগঠনিক সুব্যবস্থার কল্যাণে প্রতিটি বইই ছশো কপি করে বিক্রি করা যাবে। যেহেতু শ-খানেক কপি রাখতে হবে সৌজন্য বিতরণের জন্য মোটমাট সাতশো কপি ছাপালেই চলবে। একটা বই ছাপাতে যা খরচ পড়ে—অর্থাৎ কাগজ কেমন হবে, শোভাই বা কী-প্রকার, মলাটটাই বা কী, আর একটা কবিতার বইয়ের গড় দৈর্ঘ্য কতটা হয়, এ-সব খতিয়ে দেখে, ধরা যাক, সাতশো কপি ছাপাতে লাগল হাজার টাকা। সাড়ে-সাত হাজার বইয়ের জন্য তাই খরচ পড়বে ৭৫ লাখ টাকার মতো। গড় দাম যদি ২ টাকা ৫০ রাখা যায়, বিক্রি থেকে পাওয়া যাবে ১·২৫ কোটি টাকা। সরকার কিংবা কোনো ব্যাঙ্ক যদি কবিদের বিপণন ব্যবস্থার সুরাহা করে দেন, তাহলে বিক্রি করতে গিয়ে যে খরচ ও পরিশ্রম পড়ে, বর্তমান অবস্থা থেকে তা অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়। বিপণনের জন্য শতকরা ১৫ ছেড়ে দিলেও, সংগঠিতভাবে কবিতা প্রকাশ করে কেউ শতকরা ৩০% লাভ করে বসতে পারবেন। এই মুনাফা যদি এখন কবিদের এবং তাঁদের জন্য যাঁরা টাকা খাটাবেন, তাঁদের মধ্যে সমানভাবে বেঁটে দেয়া যায়, বিনিয়োগকারী তবু শতকরা ১৫% মুনাফা লুটবেন, এই তথ্য নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনার উপযোগ বিষয়ে সমস্ত অনড় মতকেই, এমন-কি তাদের মধ্যে সবচাইতে বেহুদাদেরও, তুষ্ট করতে পারবে।

ইয়ার্কি? রঙ্গতামাশা? গীতল শূন্যতার পেছল পথে সরলমতি কবিদের ভুলিয়ে নিয়ে আসা? এ-রকম কোনো পরিকল্পনা কাজে

খাটাতে গেলে কী-কী অসুবিধে হবে, তা তো যে-কেউ সোজাসুজি তালিকা করে দিতে পারে। যেমন, এটা বলা হবে যে, যদি বছরে সাড়ে-সাত হাজার কবিতার বই ছাপানো হয়, তবে তা এমন-কি 'অকুতোভয়' বাঙালিদেরও গলায় আটকে যাবে, দ্রুত এঁটে বসবে চাহিদার ক্রমক্ষীয়মাণতা; তিন-চার বছর পরে, হুড়মুড় করে বিক্রি পড়ে যাবে। এটা কিন্তু ভিত্তিহীন ভয়, পুরোপুরি অমূলক। কবিতার কি কোনো শেষ আছে? পৃথিবীতে? বিশেষত পৃথিবীর এই অংশে? তাছাড়া, কবিতাপ্রেমিক প্রজাতিদেরও শেষ নেই—আগেরটির পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে পরেরটা, দশকে-দশকে। জনসংখ্যা যেমন বাড়ে, তেমনি তো বাড়ে—সমানুপাতিক একটা হারে—কবিদের সংখ্যা, আর কবিরা যা লেখেন তা পড়বার জন্য উৎসুক পাঠকের সংখ্যা। আসল সমস্যাটা, যা-ই বলুন, সাগঠনিক: কবিদের এ-ব্যাপারটার অর্থনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা তাদের বুঝিয়ে-শুজিয়ে সমবায় তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে তারা ব্যাঙ্ক বা পুঁজিজোগানো অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ফলপ্রসূ কথাবার্তা চালাতে পারে; উৎপাদন ও বিপণনের সুব্যবস্থা করা; অর্থপতিদের স্তোক দিয়ে বোঝানো যে অনুরূপ ব্যাপারে তাঁদের যে ধরাবাঁধা অনীহা আছে তা ভুলে-যাওয়া এবং কাটিয়ে-ওঠা উচিত তাঁদের। এই সব প্রতিষ্ঠানকে বোঝাতে হবে প্রকাশিত যাবতীয় কপিকেই সমজাতীয় বলে গ্রহণ করতে হবে, এবং তাঁদের বাকি-সব রুক্ষশুষ্ক বিধিনিষেধগুলো বিলকুল ভুলে যেতে হবে। সংবেদনশীল চিত্তে তাঁদের আবার কবিদের পরিচালিত করতে হবে হিসেব ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার অদ্ভুত জগৎটায়, আর, বিক্রি যাতে মার না-খায়, দরকারমত তাঁদের এমন-কি বিপণন সমবায়ও সংগঠিত করে দিতে হবে।

শেষ অব্দি এটা নিছক বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন। কবিদের পেছনে অর্থখাটানোর প্রস্তাবটা নেহাত একটা উদাহরণ: যদি খানিকটা বিনিয়োগ করা যায়, এ-রকম কত যে সৃজনশীল কাজ করতে পারি আমরা। ফি-বছর ব্যাঙ্কগুলো ৭৫ লাখের অনেকগুণ বেশি টাকাই এদিক-ওদিক সবদিকে ছিটোচ্ছে, হারাচ্ছে। এমন হতে পারে এক-

আধটা বই হয়তো হয়ে রইল মাকালফলের মত, বিকোল না তেমন। কিন্তু পরিসংখ্যানের একটি প্রাথমিক প্রস্তাব বৃহৎ সংখ্যার স্থাবরতাকে ব্যক্ত করে ; আর সাড়ে-সাত হাজার সংখ্যাটা বেশ বড়ো।

অবশ্য অন্য নানা আপত্তিও উঠবে। যেমন, যিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দশা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তিনি আচমকা হয়তো বুঝে ফেলতে পারবেন যে গণ্ডগোলটা কবিতাতেই। এমন-কি বিপ্লব ছড়ানোও এখানে কেমন একটা গীতল ও ভাবালু উচ্ছ্বাসে উপচে ওঠে, কবিতার আতিশয্য সমস্ত ক্রিয়াকর্মের সম্ভাবনাকেই প্রায় অসাড় করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে, কবিতা যে একটি বিপণনযোগ্য পণ্য, এ-কথা উচ্চারণ করাও হয়তো শোধনবাদী নিয়তির হাতে জামানত জুগিয়ে দেয়া। গীতলতার সিল্লা আর অর্থনীতির কারিবডিস-এর মধ্যে বাঙালি কবিকে অগত্যা একটা বেগতিক কিছু বেছে নিতে হবে। আর তৎপ্রসূত হতাশায়, সে হয়তো আবার আরো কিছু কবিতা উৎপাদন করে বসবে। আর ঠিক সেখান থেকেই তো আমরা শুরু করেছিলুম।

১৮

একটি ছোট্ট অন্ত্যেষ্টি

গত মাসে, রাজনর্তকী শেষ কুর্নিশ নিলেন। রোববারের সকাল, বৃষ্টি চাবকাচ্ছে রাস্তাঘাট অলিগলি : সাধনা বসু, সুদূর তিরিশের যুগের সেই হৃৎস্পন্দন, কলকাতার একটা জরাজীর্ণ ফ্ল্যাট বাড়িতে মারা গেলেন। সম্প্রতি গত কয়েক বছর ধরে তাঁর জীবন ছিল হতশ্রী, দুর্ভাগা, তাঁর মৃত্যুও হল তেমনি দুর্ভাগা। মারা গেলেন কাঙালের মতো, যত্ন করার কেউ নেই, এক নিঃসঙ্গ অকালবৃদ্ধা জগৎ যাঁকে বেমালুম ভুলে গিয়েছে। ছোটো একটি শোক মিছিল; খুব কম লোকই যোগ দেবার কথা ভেবেছিল; আরো কম লোক জিগেস করল কে মারা গেছেন বলুন তো। বিগত বসন্তের রাজনর্তকীর জন্য ফুলের কোনো সমারোহ নেই : তিনি আর কোনোকিছুরই অংশ ছিলেন না।

এখানে উপাদান আছে; যেভাবে তিনি বেঁচে ছিলেন, যেভাবে তিনি মারা গেলেন, সব মিলিয়ে এক সমৃদ্ধ নিবিড় ট্র্যাজেডির উপাদান। কেশবচন্দ্র সেনের নাতনি, বিয়ে করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্তের এক নাতিকে, হেলায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত সব প্রচল, মঞ্চে আর পর্দায় দুয়েতেই অভিনয় করেছিলেন এক অগ্রণী ভূমিকায়, নেচে আর গেয়ে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন লক্ষ লোকের হৃদয়ে, এককালে বোম্বাইতে অজস্র টাকা কামিয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই জড়ো হতে লাগলো হেমন্তের পত্রালি; উত্থানপতন বন্ধুর করে তুলল পথ। সাধনা বসু কলকাতায় ফিরে এলেন : পাতা ঝরে গেল, আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলেন দুঃসহ দারিদ্র্যে, বিস্মৃতি আর নিঃসঙ্গ মৃত্যুতে; ইতিহাসের এ এমন-এক উন্মীলন যা অনুতাপহীন, সুনির্মম, অথচ একদিক থেকে আবার ঘনায়মান হতাশারও প্রতিচ্ছবি।

ঠিক এ-রকমই কিছু-একটা ঘটছে না কি বাংলা চলচ্চিত্রের? এই নগরে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, দারুণ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাংলা ছবি দেখতে পাওয়া—যদি আপনি মরীয়া হয়ে দেখতেই চান। কলকাতার কিঞ্চিদধিক আশিটি সিনেমা হলে গোটা চার ছাড়া আর-কেউ নিয়মিতভাবে বাংলা ছবি দেখায় না, বাকি-সব প্রধানত ঘুরপাক খাচ্ছে বোম্বাই কা বাহাদুরের খেল দেখাতে, কখনো-কখনো মাদ্রাজেরও। আস্ত রাজ্যের প্রায় চারশো সিনেমা হলের কোনো শুমারি যদি নিতে পারেন, দেখতে পাবেন এই অবস্থাটিই অপরিবর্তিত; শতকরা পনেরোটি হলের বেশি, কেউ বাংলা ছবি দেখাচ্ছে না, এবং তাও মাঝে-মধ্যে, নিয়মিত নয়। প্রতি বছর আজকাল অঙ্গুলিমেয় ক-টি বাংলা ছবিই প্রযোজিত হয়, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ, মুক্তিপ্রতীক্ষায় যত ছবি আছে, আগে থেকেই তার একটা দীর্ঘ সারি তৈরি হয়ে আছে, হলগুলি প্রধানত হিন্দি ছবির কাছেই বিকিয়ে আছে। কোনো মৃতা সাধনা বসুর জন্য কোনো ফুল নেই, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও বাংলা ছবির জন্য কোনো চাহিদা নেই, আর এই দশা কিনা তখন, যখন সত্যজিৎ রায় আর মৃণাল সেন প্রান্তিকভাবে দারুণ এক ফ্যাশান। এঁরা যে-ছবিই তোলেন-না কেন, তা তক্ষুনি মুক্তি পায়, আর মোটামুটিভাবে ভদ্র কিছু সপ্তাহ ধরে চলেও যায়। যখন তাদের নিয়মিত প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়, আন্তর্জাতিক বাজার তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, কোনো-কোনোটা আবার বিদেশী টি-ভি কম্পানি কিনে নেয়। কে জানে, হয়তো এখানেও একটা ওলটানো কার্যকারণ সূত্র কাজ করে যাচ্ছে: যেহেতু সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন অন্যত্র আবিষ্কৃত হয়েছেন, অতএব তাঁদের ছবির এক নির্দিষ্ট খদ্দের দেশেও বাঁধা। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, বোম্বাই ছবি যা উপার্জন করে সে-তুলনায় তাঁদের বিক্রি তো অতীব নগণ্য।

অধিকাংশ বাংলা ছবি, শেষ অব্দি যেগুলো মুক্তি পায়, তাদের দশা তো আরো, আরো-শোচনীয়। তারা নাকি হাঁড়িচড়ানে ছবি, টাকা করাই তাদের অভিপ্রায়, কিন্তু খুব কম হাঁড়িই তারা চড়াতে পারে। চার দশক আগে, কলকাতা ছিল দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের মধ্যমণি, পুঁজির

কোনো অভাব ছিল না, প্রতিভাও না। বিখ্যাত নিউ থিয়েটার্স ছাড়াও, অন্তত আরো তিন-চারটে স্টুডিও ছিল যারা বেশ ব্যস্ত থাকত : শুধু-যে বাংলাতেই ছবি তৈরি হত তা নয়, আরো ডজন-খানেক ভারতীয় ভাষাতেও ছবি উঠত, এমন-কি হিন্দি শুদ্ধু। প্রতিভা, কিংবা ভাগ্যান্বেষীরা, পৃথ্বিরাজ কাপুর থেকে কুন্দনলাল সায়গল, জীবিকার সন্ধানে আর রাতারাতি চোখধাঁধানো খ্যাতির লোভে এইখানে আসত। তাদের পেছন-পেছন এসেছিল সুরকার, কলাকুশলী ও অন্য সবাই। সেই অযোধ্যা যে আজ কী হয়ে গেছে, চেনবার জো নেই। ভোজসভা পরিত্যক্ত! জলসাঘর শূন্য ও মলিন। কলকাতার ভাঙাচোরা স্টুডিওগুলো ফাঁকা পোড়োবাড়ির মতো। কাজ হয় বটে, তবে নির্জীব, দায়সারাভাবে, হোঁচট খেতে-খেতে, মাঝে-মধ্যে, একটা কি দুটোয়, বাকিগুলো সব দরজায় তালা ঝোলাবার কথা ভাবছে। বেকার পরিচালক আর বিভিন্ন, বেকার বা আধাবেকার, কলাকুশলী আর অভিনেতাদের সংখ্যা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। পরিচালকদের মধ্যে অতি চালাক আর ধুরন্ধর যারা, তারা কেটে পড়েছে বোম্বাই; তেমনি গেছে কোনো-কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী, চিত্রনাট্য লেখক, সুরকার ও কলাকুশলী। কিন্তু, যে-কোনো সময়েই, পালাতে পারে তো মাত্র জনা কয়—বাকিদের থেকে যেতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি। যে অবক্ষয় আজ কলকাতার পরিচয়, চলচ্চিত্র শিল্প, এককথায়, তাকেই চমৎকার ফুটিয়ে তোলে। আমি অপেক্ষা করে আছি, আপনি অপেক্ষা করে আছেন, তারা অপেক্ষা করে আছে, সবাই অপেক্ষা করে আছে। কার? তুখোড়, অনতিক্রম্য, বিষণ্ণ, গুঁড়ি-মেরে-এগুনো মৃত্যুর।

কোনো পরিবেশকই, পাগল না-হলে, সাধারণ বাংলা ছবিকে ছুঁতে চাইবে না; এবং তার যথেষ্ট সুযুক্তি আছে; বক্স অফিস আবেদনের কথা তুললে বাংলা ছবিগুলো তো আগে থেকেই হেরে বসে আছে। কোনো ভালো ছবি—যেমন কোনো সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেন—ভালো, খুবই ভালো, হতে পারে, মাঝারি গোছের বাংলা ছবি সেখানে দুঃসহ, একঘেয়ে ও বিরক্তিকর, আর খারাপ ছবি তো অবিশ্বাস্যরকম খারাপ। যে-সব ছবি

সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনের নয়, তারা হয় সরাসরি ছিঁচকাদুনে প্যানপেনে ব্যাপার, নয়তো নিষ্ফল ভাঁড়ামো, অথবা ঐতিহাসিক জেল্লায় ভরা অতিনাটকের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কোনোটাই চলে না ; ছিঁচকাঁদুনেগুলো অগোছালোভাবে প্রযোজিত আর অযোগ্যভাবে অভিনীত : এগুলো আবার এমনই ফরমূলায় বাঁধা যে হেজে পচে একাকার। ভাঁড়ামোগুলো, বোম্বেটে অশ্লীলতা আর বাঙালি আদিখ্যেতার দুর্বল আপোস, কোনোটাই লাগে না। ঐতিহাসিক নৃত্যগীতবহুল মনোরঞ্জনগুলো এতই কম টাকায় তৈরি যে প্রযোজনার দারিদ্র্য আর দুর্বলতাগুলো আদপেই অগোচর থাকে না ; এবং, বোম্বাই ছবির খদ্দের পাকড়াবার স্বপ্ন দেখারও সামর্থ্য নেই তাদের।

যারা হারে, তারা কিছুই পায় না। বেচারিরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজ করে যায়, বিমর্ষ এক জনতা, বিমর্ষ আর করুণ ; কাঁপা চোখে তাকিয়ে থাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। দু-একজন কপাল ভালো থাকলে এক-আধবার কেল্লা মেরে দেয়। অনুচ্চাশী কোনো বাংলা ছবিতে আত্ম-প্রকাশ করে কোনো উদ্বাস্তু তরুণী, বোম্বাইয়ের প্রতিভান্বেষী সতর্কচক্ষু তাকে হঠাৎ আবিষ্কার করে আরব্যোপন্যাসের গালিচায় চাপিয়ে তাকে বোম্বাই নিয়ে যায়। দু-বছরের মধ্যেই ফি ছবিতে সে কামায় পাঁচ লাখ টাকা, এতটা শাদা, অতটা 'কালো'। দু-একজন সুরকারও কাজে খাটায় বোম্বাইয়ের পুরোনো সুরকারদের সঙ্গে তাদের এককালীন মাখামাখির যোগসূত্র, পালিয়ে যায় ; তেমনি যায় দু-একজন কলাকুশলী। বাকিরা, দুর্ভাগা ; তাদের কেউ চেনাজানা নেই, তাদের কোনো আশাও নেই ; তারা থেকে যায় আর পচে মরে।

কিছুক্ষণের জন্য ক্ষীণ আশার আলো ঝিলিক দিয়েছিল ; হয়তো বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর কলকাতার ছবির বাজার বড়ো হবে। কিন্তু তা হবার কথা ছিল না—হয়ওনি। বাংলাদেশের নিজের সব সমস্যা আছে : সেখানেও আছে প্রযোজক পরিচালক অভিনেতা ও কলাকুশলী ইত্যাদির সংখ্যাতিরেক—এখানকার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। গুণপনার দিক থেকে বাংলাদেশে তৈরি-করা ছবি হয়তো কলকাতার

মাঝারি ছবিগুলোর চেয়েও অধম। অতএব তারা যে পশ্চিমবঙ্গের পণ্য বিপণন করার অবাধ অধিকার দেবে, তার সম্ভাবনাই কম ; তাদেরও তো বাঁচতে হবে।

মাঝে-মাঝে প্রস্তাব ওঠে সরকার কেমন করে আরো সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে, কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্পে অর্থ লগ্নী করতে পারে, আশ্বাস দিতে পারে যাতে আরো বেশি ছবি তৈরি হয়। ব্যাপারটা অথচ কেবল প্রযোজনার নয়। যাতে তাদের হলগুলোয় এসব ছবি দেখানো হয়, প্রদর্শকদের এ-বিষয়ে রাজি করানো আরো জরুরি কাজ। পরিবেশকরা হাঁদা নয়, তারা খেটেখুটে বাজারের হাল সমীক্ষা করে। যদি বেশি বাংলা ছবি মুক্তি পেলে তাদের বখরা বা মুনাফা চোট খায়, তাহলে বোঝাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর আপনি যদি বেশি চাপ সৃষ্টি করেন, তবে তো সংবিধানের অমুকতমুক ধারায় বেআইনি নাক গলাবার বিপদ আছে।

কলকাতা কেন বোম্বাইয়ের কাছে হেরে গেল, সে এক গোলমেলে কাহিনী ; কিংবা হয়তো, তেমন গোলমেলেও নয়। আসলে বরং সামান্য থেকেই বিশেষ ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের যেটা গণ্ডগোল সেটা মোটামুটিভাবে সব বাঙালি উদ্যোগেরই গণ্ডগোল। এমন এক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় যার কোনো তৈরি ব্যাখ্যা নেই আলফ্রেড মারশালে, অথবা সে-কথা যদি তোলেন, তো বলতেই হয়, জে. স্টাইন্‌ড্‌ল-এর প্রস্তাবিত পরিণতির আগেই এসে হাজির এক বদ্ধ, নিশ্চল অবস্থা। এরই পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে : ওষুধের ব্যবসায়, কারিগরিশিল্পে, মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানে। যে-মুহূর্তে মনে হয়েছে এই বাঙালি উদ্যোগ বুঝি আর ভেঙে পড়বে না, তক্ষুনি সে আর টাল সামলাতে পারেনি। নতুনতর সম্প্রসার নির্ভর করেছিল বাইরের কোনো সংগঠনের সঙ্গে মেলবন্ধন এবং আরো পুঁজি জোগাড় করার ওপর ; কিন্তু বাঙালিরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, আর ছায়া নেমেছে লাফিয়ে। তীব্র নিন্দা যদি কোনোকিছুর করতে হয়, তবে সেটা হয়তো পাতিবুর্জোয়া মনোবৃত্তির। বাঙালি শিল্পপতি দাবি করেছেন যে তিনি একজন

ব্যবসায়ী, সংগঠক, ঝুঁকি নিতে রাজি, কিন্তু কখনোই তিনি ঠিক গৃহ-পালিত গৃহলালিত নোঙরটি উপড়ে ফ্যালেননি। বাইরে থেকে টাকা আর দক্ষতা আমদানি করে ব্যবসায়ের সম্পদ, লগ্নীকৃত মূলধন আর কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে যতই তিনি অক্ষম হয়েছেন, ততই তিনি জগতের ক্রমবর্ধমান জটিলতার মুখে অসহায় বোধ করেছেন। নিজের খোলাটির মধ্যে আরো-বেশি গুটিয়ে যাওয়া, ক্রমশ এটাই হয়ে উঠেছে তাঁর আত্মরক্ষার উপায়। আর, এই একই ঘটনা ঘটেছে চলচ্চিত্র শিল্পেঃ গোড়ার দিকে সব সুযোগ কলকাতার দরজায় কড়া নেড়েছিল। হয় তখন তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়নি, নয়তো সে-সুযোগ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা হয়েছে। কলকাতার অনীহা হয়ে উঠেছে বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠার, ব্যূহভেদের সুযোগ।

এখন যা বাকি আছে, সে শুধু এক রগরগে উপসংহার। মাঝে-মাঝে আপনি কিছু ধরতাই বুলি শুনতে পাবেন, কিছু তাচ্ছিল্যঃ বোম্বাই সব ধার-করা পালকে সাজানো, কলকাতার আছে নিজস্ব গুণপনা, স্বকীয় শিল্পিতা; বোম্বাই যা করতে পারে, কলকাতা তা করতে পারে আরো ভালো; একবার শুধু কুয়াশা সরে যাক, দেখবে বোম্বাইমার্কা ছবিতে কলকাতা বাজার ছেয়ে ফেলেছে, গান থাকবে, ক্যাবারে নাচ থাকবে, মারপিট, সার্কাস, ইচ্ছাপূরণ এবং সকলের বোধবুদ্ধিকে অপমান-করা আরো-সব নানা মশলা; বোম্বাইকে কলকাতা তার নিজের খেলাতেই আক্কেল গুড়ুম করে দেবে। এটাও আবার পাতিবুর্জোয়া দিবাস্বপ্ন, অলীক, অবাস্তব। আপনি যতই কেননা চেষ্টা করুন, কিছুতেই তিন দশক ধরে পেছিয়ে-পড়া অথবা মুলতুবি-রাখা বিনিয়োগ রাতারাতি করে ফেলতে পারবেন না, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো ব্যয়বহুল জমকালো ছবি তৈরি করার মতো টাকা কলকাতার আর জুটবে না এখন, কলকাতা তার প্রাথমিক অসুবিধেটিকেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না, চোখ-ধাঁধানো জেল্লা সব চেষ্টা সত্ত্বেও নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। সেই সঙ্গে—একে বাঙালির উন্নাসিকতা অথবা বুদ্ধির বারফট্টাই যাই বলুন-না কেন—কলকাতার ছবিগুলো বোম্বাই বা মাদ্রাজের স্থূলতা

বা কুরুচি থেকে শত হাত পেছিয়ে থাকবে। চিমটিটা এখানেই। বেশ্যা যদি হতেই হয় পুরোপুরিই হতে হয়, হাফগেরস্থয় চলে না; নাচতে নেমে ঘোমটা টানলে নাচটাই বিগড়ে যায়; যদি ভূমিকাটায় আপনার মানসিক বা সাংস্কৃতিক বাধো-বাধো ভাব থেকে থাকে, তবে আপনি ব্যর্থ হবেনই— আপনার বিফলতা কেউ ঠেকাতে পারবে না। ছবি দ্যাখে যে-দর্শক, অন্তত তাদের একটা বিপুল অংশ, হিন্দি ছবির অন্তঃসারশূন্যতার কাছে পুরোপুরি বিকিয়ে গেছে, কিন্তু কলকাতার পরিচালক ও কলাকুশলীরা এখনও দোনোমনা করছেন। তাঁরা টাকাও কামাতে চান, আবার জপতে চান আন্তোনিওনি, ওজু বা ভাইদার কথা। রথ দেখা ও কলা বেচা, ডুড ও তামাক—দুয়েতেই সমান আসক্তি। এ একেবারে আজগুবি অযৌক্তিক ব্যাপার! সেইজন্যই তাদের ভুগতে হবে, অপেক্ষা করে থাকতে হবে ধ্বংসের জন্য।

১৯

আখতারি বাঈএর জাতীয়করণ

সে ছিল একটা অন্য জগৎ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কলকাতা, সুভাষ বোস, জে. এম. সেনগুপ্তের যুগ, ক্যালকাটা করপোরেশন নামক কৃত্রিম স্বায়ত্ত-শাসনযন্ত্রের পটভূমি। গরিবদের নিয়ে মাথা ঘামানো দূরে থাক, তাদের কথাও তখন কেউ শোনেনি। গরিব বলতে তখন বোঝাত প্রধানত কৃষক—এবং মুসলিম কৃষক। কাজি নজরুল ইসলামকে নিয়ে কেউ বিব্রত বোধ করেনি, তিনি তো বলতে গেলে আমাদেরই একজন, এমন-কি বিয়েও করেছেন হিন্দু মেয়েকে। তবে গান্ধিকে কারো বলা উচিত যে মুসলমানদের বেশি লাই দিতে নেই, জিন্নাকে সামলান, ফজলুল হকের লম্ফঝম্ফ আর বরদাস্ত করা হবে না। তাছাড়া কংগ্রেসের তিন-চতুর্থাংশই তো হিন্দু জমিদারে ঠাসা। ক্যামাক স্ট্রিট ও ল্যান্সডাউন রোডের ত্থ-ধার ধরে তাদের রমণীয় প্রাসাদ। যদিও তখন চরম মন্দার সময়, তাতে কী আসে যায়? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মৌলিক গুণই হল এই যে জমিদারকে ভুগতে হয় না, ভোগে রায়ত। বস্তুত জমিদারদের প্রকৃত আয় তখন বেড়েই গিয়েছিল, আর আয় বেড়েছিল বেতনভোগী মধ্যবিত্তের। দিনের মতো দিন গেছে তখন, কলকাতার একটা আভিজাত্য ছিল; আজকের বেগম আখতার তখনও ছিলেন আখতারি বাঈ নামে ছিপছিপে একটি কিশোরী; সেই কিশোরীটি প্রধানত ঠুংরি জাতীয় গান গেয়ে বেড়াত লক্ষ্ণৌ-এর তালুকদার এবং কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিট-ল্যান্সডাউন রোডের বাসিন্দা জমিদারদের মজলিশে।

কখনো হয়তো সন্ত্রাসবাদীরা একটা অঘটন ঘটিয়ে খবর সৃষ্টি করত। কোনো বোকা মেয়ে হয়তো স্যার জন অ্যানডারসনকে তাক্ করে সরাসরি গুলি চালিয়ে বসল, দু-একজন পুলিশের গোয়েন্দা খুন হল, পত্রিকাগুলিতে তাই নিয়ে কিছু মন্তব্য করা হল, মুখ্যসচিবের সঙ্গে রাজপ্রতিনিধির, রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে রাজ্য-প্রশাসকদের আরো ঘন-ঘন চিঠিচাপাটি চলল। কংগ্রেস নেতারা দোনোমনা করতে লাগলেন, একদিকে মাথাগরম তরুণদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, অন্যদিকে ব্রিটিশ গোঁয়ার্তুমির বিরুদ্ধে উত্তেজিত ধিক্কার। তারপর আস্তে আস্তে গণ্ডগোল থিতিয়ে আসত। মুসলমান কৃষকদের ওপর নিপীড়ন চলত একই ভাবে। জমিদাররা তাঁদের তেত্রিশ কোটি আমলা লাগিয়ে সুষ্ঠুভাবে খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত করতেন। ডিসেম্বর মাস পড়লেই বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্সের সামনে রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা। জমিদাররা আসতেন তাঁদের পুরোদস্তুর জাঁকজমক করে পেখম মেলে। সন্ধ্যায় আখতারি বাঈ ফৈজাবাদি তাঁদের গান শোনাবেন। আর দিনের বেলায় চলবে ক্রিকেট। মনে আছে সেই সব নাম, যা ক্যালকাটা এবং বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবগুলির প্রাণের প্রাণ—লংফিল্ড, বেহ্‌রেণ্ড, ভ্যান্ ডের গুচ ও হোসি ? রবীন্দ্রনাথ আছেন শান্তিনিকেতনে এবং দুনিয়ায় সবই ঠিকঠাক চলছে। বাঙালি কবিরা তখন দলে বেজায় ভারি ; তাদের টাকাপয়সা বিশেষ না থাকলেও ত্রিশের দশকের গোড়ায় তারা সব সময়েই কী করে যেন অগ্রণী ছোটো পত্রিকা বার করতে পারত, সেগুলি নীতির দিক থেকে রবীন্দ্রবিরোধী হলেও প্রথম পাতায় তাদের প্রশংসা বা নিন্দাব্যঞ্জক রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছাপাত। বাঙালি হিন্দু যুবকদের সহজেই দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেত—হবু-কবি এবং হবু-সন্ত্রাসবাদী। কখনও দ্বিতীয় দল প্রথম দলকে সংখ্যায় ছাড়িয়ে যেত, কখনও আবার হত উল্টোটা। কচিৎ একের সঙ্গে আরেকটির সংমিশ্রণও দেখা যেত। কোনো সময়ে কোনো পাগ্‌লাটে প্রফেসর হয়তো লুনাচারস্কি কিংবা লেওন ট্রটস্কি থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। বিরল কোনো আলোচনায় রাশিয়ানরা নিজেদের নিয়ে কী করছে সেই প্রসঙ্গ উঠত। কিন্তু মস্কো বা লেনিনগ্রাদের দূর বজ্রনির্ঘোষে কারো তন্দ্রা টুটবার

সম্ভাবনা ছিল না। গরিব লোকেরা ছিল শান্ত এবং বাধ্য, বেশির ভাগই চাষী, বেশির ভাগই মুসলমান। ফজলুল হকের মতো বদমাশদের সজুদ রাখা দরকার, তাহলেই সুখশান্তি বিরাজ করবে, আর কিছুই করতে হবে না। মেট্রো সিনেমায় মাঝে-মাঝে আসত জ্যানেট গেনর অভিনীত কোনো ছবি, আর সব সময়েই শোনা যেত আখতারি বাঈএর গান, কোনো-না-কোনো জমিদারের বাসভবনে। কাতর স্বরে জীবনকে মায়ার স্বপন বলার কোনো দরকারই ছিল না। জীবন স্বপ্ন মাত্র নয়, হতে পারে না, কারণ গরিবদের অস্তিত্বই নেই, আর আখতারি বাঈ প্রতি সন্ধ্যাতেই গাইছেন।

তারপর এল যুদ্ধ এবং দেশবিভাগ। বাঙালি হিন্দু জমিদারদের জীবন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। পরের ত্রিশ বছর তাদের কেটেছে ঐহিক ও আত্মিক দিক থেকে পুনর্বাসনের বিক্ষিপ্ত চেষ্টায়। আলস্যের দিন শেষ হল : ক্যামাক স্ট্রিট ও ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িগুলি ভেঙে পড়তে শুরু করল, আয় বন্ধ হয়ে গেল, হৌসি ও লংফিল্ডরা সম্ভবত অস্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডায় পাড়ি দিল ; কিন্তু একটা বিশেষ ধরনের আদব-কায়দাও তারা সঙ্গে করে নিয়ে গেল। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ধানখেতগুলি থেকে যে উদ্বৃত্ত সম্পদ পাওয়া যেত, তা খরচ হত কলকাতায়। ব্রিটিশরাই এই ব্যবস্থা চালু করেছিল, হিন্দু জমিদার, আইনজীবী ও ডাক্তাররা তাকে প্রতিষ্ঠা দিল : ফিরপোতে মধ্যাহ্নভোজ, ক্রিসমাসের মরশুমে ফ্রুটকেক ও অন্যান্য বিলিতি মিঠাইএর চলন, চৌরঙ্গি ও পার্ক স্ট্রিটে আলোকসজ্জা, গভর্নরের বাড়িতে নাচের উৎসব, ক্যালকাটা ক্লাব অধীর প্রতীক্ষায় থাকত, রাজপ্রতিনিধি থাকতেন বেলভিডিয়রে, সেখানে দেশীয় ভদ্রলোকদের দরবার বসত সকাল ন'টা থেকে প্রায় বিকেল পর্যন্ত, দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যকর উপসর্গে ভরা বাস্তব পশ্চাৎপটের অন্ধকারে লীন হয়ে থাকত। শহরে আসতেন বড়ে গুলাম আলি, ছিপছিপে কিশোরী আখতারি বাঈও আসত।

যখন যুদ্ধ শেষ হল, দেশও ভাগ হয়ে গেল, তখন এই ধরনের জীবন-যাত্রার ওপর অন্তিম আঘাত এসে পড়ল। উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যয় করার নতুন

পন্থা খোঁজার দরকার হল। উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করাটা এদেশে কোনো সমস্যাই নয়, কারণ দারিদ্র্য আমাদের দেশে চিরকালীন, আর দরিদ্র মানুষ থাকলেই তাদের শোষণ করা যায়। কিন্তু, অর্থনীতির ভাষায়, তার পুরো মূল্য উশুল করা নিয়ে একটা অসুবিধা উপস্থিত হতে পারত। দৃষ্টিকটু বড়োমানুষি উধাও হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্টির জগতে সংকট ঘনিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। নতুন যুগের শিল্পপতিরা শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পেরেছিল আংশিকভাবে। কারণ ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক দুনিয়ারও সদর রাস্তা ও গলিঘুঁজি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। অভাগাদের ভাগ্য ফেরেনি, কিন্তু সংস্কৃতির অবস্থা ছিল বর্ধিষ্ণু। নিজেদের বাকি কাজ শিল্পপতিরা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিল। যারা একদিন ঐশ্বর্যের কোলে বসে 'প্রোলেট-কুল্ট' বিষয়ে লেওন ট্রটস্কির লেখা পড়তেন, তাঁরা উল্লসিত হলেন। রাষ্ট্র এসে দাঁড়ানোমাত্র পুরো উপযোগিতা উশুল করার সমস্যা মিটে গেল। আখতারি বাঈ বেগম আখতার রূপে পূর্ণপ্রস্ফুটিতা হলেন।

এইভাবেই কেন্দ্রের তথাকথিত শিক্ষাদপ্তরকে সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও দায়িত্ব দেওয়া হল। 'অ্যাকাডেমি' নয়, 'অকাদেমী'র যুগ শুরু হল। সংস্কৃতির জাতীয়করণের সঙ্গে-সঙ্গে মূল্যগত ভেদাভেদের নীতি অনুসৃত হতে লাগল। ভোগ্যপণ্যের বাজারে যেমন একচেটিয়া আধিপত্য বিরাজ করে, লগ্নীর বাজারেও তাই; কোন্ শিল্পী, গায়ক, নাট্যকার, চিত্রকর আর কবিকে কতটা সম্মান দেখানো হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব তাঁদেরই যাঁরা কর্তৃত্বের পদে সমাসীন। তাছাড়া কবি, নাট্যকার, শিল্পীদের সৃজনী প্রতিভার প্রচারও কেন্দ্রীয় সালিশির ওপর নির্ভর করে। জওহরলাল নেহরুর জীবৎকালে তালুকদার-জমিদারদের ক্ষমতার বদলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা তত চোখে পড়ত না, কারণ নেহরু কাজ করতেন উনিশশতকী হিন্দু জমিদারদেরই ঢঙে। অন্ততঃ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে মুরুব্বিয়ানার ধরনটা আগের মতোই থেকে গিয়েছিল। আখতারি বাঈ বেগম আখতারে পরিণত হলেও তাঁর কণ্ঠে সুরের খেলা পুরোনো স্মৃতির আমেজ নিয়ে আসত। কখনো-কখনো বেগম আখতার

নামের রাশভারি মহিলাকে মঞ্চচ্যুত করে সেই কিশোরীটি এসে হাজির হবার চেষ্টা করত।

চারিদিকে তাকালে একটা জগাখিচুড়ি সমাজব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়; একটা যেমন-তেমন আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা প্রায়-সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতি এখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করে ক্ষয়িষ্ণু বণিকতন্ত্র ও আনাড়ি পুঁজিবাদের সঙ্গে। সংস্কৃতিকে যতই উচ্চ মর্যাদা আমরা দিই-না কেন, জাতীয়করণের পরে তার নানা উদ্ভট দিক দেখা যেতে লাগল, ভ্রষ্টাচার পর্বতপ্রমাণ হল। রাষ্ট্রের হাতে সংস্কৃতি। কিন্তু এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি যে-রকম, তাতে জনসাধারণের পাতে দেওয়া হয় শুধু সাধারণী রেডিও সেটে পরিবার পরিকল্পনার গুণ বর্ণনা করে ভাঁড়ামি ভরা গান; কখনও বা এর পরিপূরক অন্যস্বাদের ভোজও থাকে, যথা ক্ষমতাসীনদের পরিচালনায় কীরকম বীরত্বের সঙ্গে এই ধর্মভূমিকে পাষণ্ড চীনাদের হাত থেকে রক্ষা করা হল সেই বিবরণ। কিন্তু সারাক্ষণই জীবনের প্রকৃষ্ট জিনিসগুলি বড়লোকদের জন্য, শাসকশ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বেগম আখতারের গান বা যামিনী কৃষ্ণমূর্তির নাচ উপভোগ করার অধিকার আছে তাদেরই।

ছিপছিপে সেই কিশোরী অনেক ওপরে উঠল তার নিতান্ত সাধারণ জাতকুল পেছনে রেখে। অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই জুটল। আখতারি বাঈ ফৈজাবাদি হলেন বহু রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া বেগম আখতার। বিদেশে ঘুরতে গেলেন ভারতীয় সংস্কৃতির দূতী হয়ে, ভারতের নান্দনিক উৎকর্ষের বাণী প্রচার করলেন। অর্থাৎ তাঁকে বন্দী করা হল, শাসনযন্ত্রের একটি অংশে পরিণত হলেন তিনি। অর্থ ও খ্যাতি লাভের আগে যখন কলকাতায় আসতেন ধনী জমিদার ছাড়াও আরেক ধরনের গুণমুগ্ধ শ্রোতা তিনি পেতেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির তরুণরা—অনেক সময় বৃদ্ধরাও—বিনাপয়সায় গান শোনানোর জন্য অনুরোধ করতেন, তিনিও গাইতেন। গণনাট্যসঙ্ঘের অভ্যুদয়ের আগেও সাধারণের জন্য গান গাইবার এই প্রচেষ্টা আমরা দেখি। কিন্তু সংস্কৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত বিষয় হয়ে যাবার পর

সবই বদলে গেল। আখতারি বাঈএর জাতীয়করণ হল, তিনি হলেন বেগম আখতার। সাধারণ লোকের জন্য ব্যয় করার মতো সময় তাঁর রইল না। কর্তাব্যক্তিদের খেয়াল মিটিয়ে যেটুকু সময় থাকত, তা যেত ধনীদের আত্মিক উন্নতি সাধনে। আখতারি বাঈ, বেগম আখতার কর্মব্যস্ত অবস্থাতেই মারা গেলেন। আফসোস হয়, মৃত্যুর আগেও তিনি মুক্তি পেলেন না। গান-গাওয়া পাখিটি যতদিন বাঁচল খাঁচাতেই বন্দী রয়ে গেল।

২০

একজন সাধারণ লোক

'নাবিক ফিরে এলো ঘরে, সাগর থেকে তার ঘরে।' তিনি ছিলেন নেহাৎই সাধারণ লোক, কোনোভাবে যার বিশেষীকরণ সম্ভব নয়, যাঁর আছে কেবল সামান্য ধর্ম। ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখেছিলেন শান্তিনিকেতনে, কিন্তু সে তো নিছকই একটি ইতিবৃত্ত, অনেক দিনই ভুলে-যাওয়া, এমন-কি তাঁর নিজেরও তা মনে থাকত না। নেহাৎই সাধারণ মানুষ, কিছুদিন আগে ষাট বছরে পা দিয়েছিলেন ; যা-যা থাকে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের সবই—ছিল সেই আদিরূপাত্মক সব কুটুম্বিতা ও সম্বন্ধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তুলকালাম মুদ্রাস্ফীতির কৃপায় শতচ্ছিদ্র, জোড়াতালিরও পরপারে। পেশা হোমিওপ্যাথি। তিনি গত সপ্তাহে মারা গেছেন।

সাধারণ এক মৃত্যু। গত কয়েক মাস ধরেই তিনি ভুগছিলেন ঃ অবস্থাবিপাকে-পড়া, পুষ্টিকর পথ্যহীন বুড়োমানুষদের যে-সব বিচিত্র রোগ ধরে বসে সে সবই ছিল। হাসপাতাল আর বাড়ি, বাড়ি আর হাসপাতাল—বার কয়েক এই করেই কেটেছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য আর তাঁর ফিরল না ; ওষুধপথ্য আর সেবাযত্ন সত্ত্বেও, জটিলতা বেড়েই চলল, প্রতি সপ্তাহেই অবনতির দিকে গেল স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থা—গত সপ্তাহে, তিনি মারা গেলেন। সাধারণ এক অন্ত্যেষ্টি। বন্ধুদের ছোট্ট এক বৃত্ত ঘনিয়ে এল। তাঁদের মনে ছিল, সে যে কত শত দয়াদাক্ষিণ্য তাঁরা পেয়েছেন এই মানুষটির কাছ থেকে—সে কত-কত বছর জুড়ে ; তাঁদের মনে ছিল তাঁর উষ্ণতা, তাঁর ঔদার্য, তাঁর স্নেহের প্রসার, আচরণের সেই প্রকাণ্ড সৌষ্ঠব ও মাধুর্য—যা ছিল মানুষটির ব্যক্তিত্বেরই সমার্থক ; সহানুভূতি আর

সহানুভূতিতে মাখামাখি একটি মুহূর্ত—সমবেত সকলেই তার অংশভাক্‌। কিন্তু চিরকালই এমন মুহূর্তের আয়ু তাৎক্ষণিক, সাধারণ এক অন্ত্যেষ্টি এক সাধারণ মানুষের অন্ত্যেষ্টি—সময় বেশিক্ষণ লাগেনি। বন্ধুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেন। এবার শুধু পরিবারের মানুষেরা একা। ঘনিষ্ঠ কেউ, প্রিয়জন কেউ বিদায় নিলে যে-একাকিত্বের বোধ নেমে আসে, এ শুধু সেটুকুই ছিলো না। অপ্রতিরোধ্য ছিল বাড়ির কর্তার মৃত্যুর সঙ্গে জড়ানো প্রধান অনুষঙ্গগুলো। কোনো সাধারণ মানুষের মৃত্যুর ফলে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা সত্যিই অসাধারণ আয়তনলাভ করে বসতে পারে।

একজন সাধারণ মানুষ। এমনকি, হোমিওপ্যাথ হিসেবেও তিনি বোধ করি মোটামুটি সাধারণই ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো অব্দি তিনি শ্রদ্ধায়-সম্মানে খানিকটা অতিভূত হয়ে থাকতেন তাঁর জীবিকার নামজাদা সব ব্যক্তিত্বদের দক্ষতা ও কুশলতায়। তাঁর ছিলো উপরন্তু, সেই সহজাত বিনয়ঃ অন্যদের অন্য মতের বা কখনো-কখনো মেজাজমর্জির প্রতিও শ্রদ্ধা তাঁর ছিল প্রায় দ্বিতীয় প্রকৃতি। একজন সাধারণ মানুষ, যিনি নিজেকে কখনো জাহির করতেন না, চাপিয়ে দিতেন না, যাঁর পেশাগত মতামতগুলোও সবসময় অস্ফুষ্টভাবে প্রকাশিত হত একজন সাধারণ মানুষ, নিজের পেশায় জনপ্রিয়, কিন্তু 'সফল' নন। সাফল্য মাপা হয় বিনিময়ে কী পাওয়া গেল তারই শর্তে। এই হোমিওপ্যাথ কোনোরকমে শুধু সংসার চালাবার মতো অর্থ উপার্জন করতেন। একেবারে হাল আমলে যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করল, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমে আরো অনিশ্চিত ও আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এও আবার তাঁকে একটি সাধারণ বর্গের একজন মাত্র বলে শনাক্ত করেছিলঃ এই পরিবেশে জীবনধারণের জন্য কায়ক্লেশে সামান্য টাকাও উপার্জন করা যাঁদের কাছে দুঃসাধ্য, ডাক্তারি, আইন বা শিক্ষকতা, সব পেশাতেই এমন মানুষের সংখ্যা বিপুল। কলকাতা আর মফস্বলে এ-রকম দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি। বিবর্ণ মুখ দেখেই আপনি তাঁদের চিনতে পারবেন,

চিনতে পারবেন তাঁদের শরীরে অপুষ্টির চিরস্থায়ী ছাপ দেখে, তাঁদের কথাবার্তায় যেভাবে তেতো বাঁকা সুর ঢুকে পড়ে, তা-ই দেখে।

এই হোমিওপ্যাথ, কয়েক বছর আগেও, তিক্ততাটা নিজের ভেতরই চেপে রাখতেন, তাঁর ছিল সেই বিরল ক্ষমতা, যার বলে তিনি ঘটনা দুর্ঘটনা থেকে হঠাৎ-হঠাৎ আবিষ্কার করে বসতেন অপ্রত্যাশিত সুখকর কোনো দিক। একে বলুন প্রতিবেশীদের প্রতি দরদ, বলুন সামাজিক বিবেক, যা খুশি, তিনি মনে করতেন মজুর বস্তিতে বিনি পয়সায় গরিবদের চিকিৎসা করার আনন্দ বিরাট। লেনদেনের স্থূলতা তাতে নাক গলাত না। কোনো বাহাদুরি বা ঢাকঢোল ছিল না। হোমিও-প্যাথটির চেম্বার ছিল ফাঁকা, শাদাসিধে, নেহাৎই সাধারণ। অন্য-কোনোরকম হলেই বর্বর দেখাত; জাঁকজমক তাহলে তাঁর মক্কেলদের দূরে সরিয়ে রাখত। মাঝে-মাঝে নামমাত্র একটা ফী পেতেন, বেশির ভাগ সময়েই ফী-এর কোনো প্রশ্নই উঠত না। এখানে-ওখানে কখনো-শখনো এক-আধটা ডাক, সামান্য টাকা জোটাত; অবশ্য ডাক আসত কালেভদ্রে দৈবাৎ। কিন্তু আপনি তাঁকে টেলিফোন করুন: আপনার বা আপনার সমস্যার জন্য তাঁর হাতে সময় অফুরান; গাড়ি পোষার সংগতি তাঁর ছিল না, উনি পায়ে হেঁটেই চলতেন, অথবা ঠেলে উঠতেন কোনো ভয়াবহ ভিড়ে-ভরা বাসে-ট্র্যামে, আপনি যেখানে তাঁকে চান, তিনি এসে হাজির, শ্রান্ত কিন্তু খুশি, সনির্বন্ধ স্নেহে আর সৌজন্যে ভরপুর। কারু কোনো উপকার করা তাঁর কাছে ছিল মস্তিষ্কের তাড়না। এ-রকম সব তাড়নার সমাহারই ছিল তাঁর জীবন। এদিকে, সারাক্ষণ অর্থের অপ্রতুলতা লেগেই আছে। অথচ তাঁকে দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই: স্বভাবের মাধুর্য, সৌজন্যবোধ, এদের সঙ্গে টাকা থাকা-না-থাকার সম্পর্ক খুবই কম।

তবু যে-কোনো দরিদ্র হোমিওপ্যাথেরও স্বপ্ন থাকে। হয়তো আমাদের শান্ত সুবোধ মানুষটির এই স্বপ্ন দেখার গভীরতর অধিকার ছিল। বেশির ভাগ সময়েই, তাঁকে কাজ করতে হত হাঘরে নিঃসম্বলদের মধ্যে —শতকরা হিসেবে দরিদ্র ও ভবঘুরেদের মধ্যে অনেক বেশি সহজ সরল

সৎমানুষদের দেখা মেলে, ধনকুবেরদের চাইতে অনেক বেশি, সেই যাঁরা তাঁদের বেঢপ অহংএর তাড়ায় ছোটাছুটি করেন দামি-দামি নার্সিংহোমে। বেশি দরিদ্রদের রাজত্ব আসা উচিত শিগগিরই, আমাদের এই হোমিওপ্যাথ নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন। কিন্তু আপনাকে তো তার জন্য খাটতে হবে; কষ্ট করতে হবে; ধনকুবেরদের উচ্ছেদ হওয়াই উচিত, তাদের দিক থেকে কোনোদিনই স্বতঃপ্রণোদিত ত্যাগের সম্ভাবনা নেই; একটা আন্দোলন চাই সেজন্যে, রাজনৈতিক আন্দোলন, এমন-এক আন্দোলন যার জন্ম হয় একেবারে মাটি থেকে, যাতে গরিবদের রাজত্ব আসতে পারে এখানে।

সাধারণ মানুষ ছিলেন এই হোমিওপ্যাথ, একজন শান্ত মানুষ, কিন্তু তাঁর ছিল সংরক্ত আবেগ, ছিল দৃঢ় বিশ্বাস, পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব। এই কথা সবসময় স্পষ্ট করে বলাও হত না। মানুষটি বিনয়ী; যে-রোগীর দঙ্গলকে তিনি চিকিৎসা করতেন তারা প্রধানত হাঘরে হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ঐতিহ্য এটা অনিবার্য করে তুলেছিল যে তাঁর দৈনন্দিন গতিবিধির মধ্যে তাঁকে সামাজিক মেরুর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিচরণ করতে হবে। নিজের মতবাদ সম্বন্ধে অটল, কিন্তু রূঢ়তা সহজে আসত না তাঁর আচরণে; কে জানে হয়তো তিনি ভেবেছিলেন শত্রুপক্ষের শিবিরে ঢোকবার সময় তাঁর রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বকে ছদ্মবেশ পরানোটাই শ্রেয়তর রণকৌশল। কিন্তু আনুগত্য আর মৈত্রী ছিলই। রাজনৈতিক আন্দোলনের সরাসরি কোনো অংশ হয়তো ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন না এ-কথাটা বলাও অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য। তিনি, এবং তাঁর মতো মানুষরা, চিরদিনই ছিলেন আশপাশে, সেই ১৯০৫ বা ওরই কাছাকাছি কোনো সময় থেকে, গভীর-নাড়া-দেয়া রাজনৈতিক চেতনাগুলোকে রক্তমাংস জুগিয়ে। তাঁরা পরিহার করেছেন পাদপ্রদীপের আলো, কিন্তু তাঁদের অবিরাম খাটুনি ছাড়া কোনো আন্দোলনই সত্যি করে গড়ে উঠতে পারত না। সারাক্ষণ, আদর্শ আর জনসাধারণের মধ্যে, তাঁরাই অনুঘটকের কাজ করেছেন। স্বপ্নকে তো ফলিয়ে তুলতে হয়; কোনো তারাকে

ধরায় নামিয়ে আনতে গেলে ধরাধরি করতে হয়। নামহীন অধ্যবসায়ের এক বিপুল পরিমাণ চাই এ-কাজে; কঠিন, অগোচর গাধার খাটুনি, দিনের পর দিন, সামাজিক অস্তিত্বের দিনের পর দিন। দলের নেতা ও কর্মীরা তাদের কাজ করে যায়; কিন্তু প্রায় সকল অবদানই সেই অঙ্গুলিমেয়দের, যাঁরা দলীয় কাঠামোর প্রতিষ্ঠিত চৌহদ্দির বাইরে, যথার্থ স্বেচ্ছাসেবক, যাঁরা পরিহার করেন খ্যাতি, পুরোগামিতা, ইশতেহারে সই করেন না, প্রতিনিধি দলে যোগ দিতে প্রত্যাখ্যান করেন, কিংবা সে-অর্থে মিছিলেও, কিন্তু যাঁদের কাছে স্বপ্ন এজন্য মোটেই কিন্তু কম সত্য নয়। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক—এঁরাই এই মহান অনুঘটক, এঁরাই রূপ দেন অবয়ব দেন জনসাধারণের আবেগ অনুভূতিকে, এইসব সংগঠক, যাঁদের নেই কোনো বাক্‌পটুতা, যাঁদের নেই কোনো সামান্যতম দাবি। তাঁরা বাড়ির ছাদ থেকে এ-কথা চেঁচিয়ে ঘোষণা করেন না; অথচ, আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সারূপ্য তবু পরিপূর্ণ ও চরম। এরই জন্য তাঁরা অকাতরে ব্যয় করেন অর্থ উপার্জনের সময় ও সুযোগ, তাঁরাই পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট মানুষ, সুনিবিড়ভাবে লিপ্ত। স্বপ্নের প্রেক্ষিত, আর তার তুচ্ছ, অব্যবহিত, সাধারণ ছোটোখাটো কাগজগুলোর মধ্যে যে-যোগসূত্র রয়েছে, সোজাসুজি সেটা চোখে পড়ে তাঁদের। কোনো সেতুর রামধনু এই স্বপ্নের সঙ্গে তাঁদের জীবনের যোগাযোগ রচনা করে দেয়। স্বপ্নদর্শীদের বিশাল নিঃশব্দ বাহিনী এগিয়েই চলে।

এই হোমিওপ্যাথ ছিলেন এমনি একজন স্বপ্নদর্শী। ছিলেন সাধারণ মানুষ; সাধারণত্বই তাঁর অস্তিত্বের সংজ্ঞার্থ রচনা করেছিল। কোনো বিরাট ব্যক্তিগত উচ্চাশা ছিল না। বন্ধুদের প্রতি অনুগত ছিলেন, অনুগত আর অনুরক্ত আর স্নেহশীল। কিন্তু তারই পাশাপাশি অনুগত ছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের আন্দোলনের কাছে। ছিলেন সহানুভূতিতে সহযোগী, কোনো ক্যাডর বা সরকারি কর্মী নয়। কিন্তু অভিধার ব্যাকরণ আবার ভড়ংএ পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে, প্রকাশ করার বদলে সে ঝাপসা করে দিতে পারে, গুলিয়ে দিতে পারে। তাঁর নিঃশব্দ লাজুক ধরনে বছরের পর বছর তিনি তাঁর

দেয় ভাগ দিয়ে গেছেন। এ-রকম ক্ষেত্রে, সর্বসময়েই হিসেব রাখা মুশকিল; একবার কয়েকজন লোকের স্মৃতি মুছে গেলে, কেউই তাঁদের ত্যাগের বিশেষ রূপগুলো আর মনে রাখবে না। নাম যাঁরা খোঁজেন না, তাঁরা সহজেই এই পথে এসে হাজির হন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি একটি উন্নততর নির্বাচন। যাঁরা সুসভ্য, তাঁরা নিজেদের নামডাক জাহির করতে চান না। তা-ই হয়। যুগ-যুগ ধরেই নীরব মানুষরা নীরবই থাকেন, অজানা, অস্বীকৃত, তালিকায় অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁদের বাদ দিলে মানসিক প্রগতির বিধি অচল হয়ে পড়ে। ইতিহাস তাঁদের নাম পটের গায়ে উৎকীর্ণ করে না, কিন্তু তাঁদের অস্বীকার করার দুঃসাহস কখনো নিশ্চয়ই ইতিহাসের হবে না। এই হোমিওপ্যাথ, স্নেহশীল, প্রতিবেশীর ভালোর জন্য উৎকণ্ঠিত—সারূপ্যের কোনো সংকটে ভোগেননি। অন্যদের পরিচর্যা করতে ভালোবাসতেন, শুধু সেই বিরাট সংখ্যক হাঘরেদের, তাঁকে কোনো পয়সা দেবার কোনো ক্ষমতাই যাদের ছিল না। তিনি, আর তিনি যাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন তাদের মধ্যে ছিল এক গভীর স্নেহের সম্পর্ক, এক নিবিড় ঐক্যবোধ। হয়তো, তিনি তাদের ভালোবাসতেন বলে তারাও তাঁর আদর্শকে ভালোবেসেছিল; তারা অবহিত হয়েছিল—স্বজ্ঞার বলেই বেশি, উপদেশ বা পরামর্শে নয়—যে তাঁর আদর্শ আর আন্দোলন আসলে তাদেরই; যদি তাদের জন্যই না-হত, তিনি তবে এ নিয়ে মোটেই কখনো মাথা ঘামাতেন না।

বীর তিনি, নিজের ধরনে বীর, কিন্তু তাঁর বীরত্বের কোনো নথিই থাকবে না। শেষের কয়েক বছর ছিল যেন করুণগম্ভীর পরিচ্ছেদ। হঠাৎ মনে হয়েছিল তাঁর আদর্শ বুঝি আরো দূরে সরে গিয়েছে; সম্ভাব্যতা আর সম্ভাবনার গণিতের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল বিবিধ রাহিক, অতিকায় ছায়া ফেলেছিল; হাওয়া ঘুলিয়ে দিয়েছিল বিশৃঙ্খলা। সেই দিনগুলো ছিল দুঃখের, বিদীর্ণ, যেন আদর্শ চিরকাল যেমন ছিল ঠিক তেমনি থেকে গেছে, কিন্তু কেবল কিছু নির্বিবেক উপাদান যেন কারু বিশ্বাসকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, বিশ্বাসের সবগুলো ভরকে

যেন হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেছে। রোগতাপ সওয়া যায়, কিন্তু জীবনের সব স্বাদ বা উৎসাহ চলে গেলে বেঁচে থাকা যে কী কঠিন।

এক সাধারণ অস্তিত্ব। একজন সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন, আর এবার এক সাধারণ মৃত্যু। কিন্তু এইসবকিছুই তো তিলে-তিলে যোগ হয়, না-হলে ইতিহাস হত অন্তঃসারহীন, আশ্বাসহীন, ধাপ্পাবাজ। সাধারণ মানুষরাই চিরকাল ইতিহাসের গতিরেখাকে আকার দিয়ে যায়, পুঁথিতে তাদের উল্লেখ না-ও যদি থাকে। তাদের নিজস্ব বিশেষ ধরনে বিরাট হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ, মহান। হোমিওপ্যাথ অমল সেন চুপি-চুপি চলে গেলেন, গত সপ্তাহে; সাধারণ এক মৃত্যু, 'বনপাহাড় থেকে ঘরে ফিরে এলো শিকারি'। অমল সেন, নেহাৎই একজন সাধারণ মানুষ, তবু বিরাট মানুষ। তাঁর বিরাটত্ব ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে, অথচ ইতিহাস সে-কথা ঘুণাক্ষরেও জানবে কিনা সন্দেহ।

২১

বহু স্বপ্নের অস্থিচুর

অপ্রতিরোধ্য এক প্রক্রিয়া এটা, আর কাগজের অভাব সুদূরতম অঞ্চল থেকেও বলি দাবি করে। লিটল ম্যাগাজিনগুলো নির্মূল হয়ে যাবার আশঙ্কায় মুখ চুন করে থাকে। যাদের উচ্চাভিলাষ ছিল মাসে-মাসে বেরুবে, তারা পরিণত হয়েছে ত্রৈমাসিকে ; ত্রৈমাসিকগুলো হয়ে উঠেছে ষাণ্মাসিক, ষাণ্মাসিকগুলো মোটেই আর তা নেই, তারা হয়ে উঠেছে এমনই-এক দৈবাধীন পরিসংখ্যা। আর তাদের সব ক-টিই রোগা হয়ে গেছে, পাৎলা।

এবং, তাতে, জীবনের একটি সমৃদ্ধ দিক মুছে যাচ্ছে। চাইলে একে বলতে পারেন যৌন তাড়নারই প্রতিফলন, বলতে পারেন একেবারেই-অনতিরিক্ত ক্যালোরির ভস্মশেষ ; লিটল ম্যাগাজিনগুলো তবু ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের আদিরূপাত্মক ঐতিহ্যের প্রতিনিধি। সে তো আছেই —মন আর বস্তুর মধ্যে এক বিরামহীন সংঘাত ; এই ম্যাগাজিনগুলো ছিল প্রকাশ্য দিবালোকে বিরাট একেকটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ—মন, সে কিনা বস্তুকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করছে। কেরানি, স্কুলশিক্ষক, অধ্যাপক, বেকার—এদের যে-কোনো একটি সংকর শ্রেণীকে নিন। যে-কোনো মুহূর্তে তাকান, দেখবেন এদের কোনো টাকা নেই ; এ-রকম মুহূর্তের সমাহারই এদের সমবেত অস্তিত্ব। অথচ, তবু, সবসময়েই দেখবেন, তাদের মধ্যে বেশ একটা বড়ো অংশ কোনো লিটল ম্যাগাজিন বার করার বিলাস-অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এ-সব পত্রিকার বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রসঙ্গের প্রসার সাধারণ কল্পনাকে তাক লাগিয়ে দেয় ; আগুনঝরা গদ্য ; জ্বালাময়ী কবিতা : যেমন বিপ্লবের কবিতা—তেমনি নির্জনতা বা প্রকৃতিবিলাসের ;

জ্যাঁ জেনে আর কিমিতিবাদী নাটক বিচ্ছিন্নতাবাদ ও তরুণ মার্কস; ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—তার কোনোটার বা ১৯৪৯ নাগাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে জীবন কেমন কাটত তার জন্য হাহুতাশ, কারো লেখায় ভিয়েৎনামের কোনো নাম-না-জানা স্ত্রীলোকের মহাকাব্যোচিত বীরত্বের গুণগান, আরেকজন আবার কোনো টেস্টম্যাচের আগেরদিন কোনো ক্রিকেটভক্তের মনোবেদনাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইছে। শুধু ছোটোগল্পের জন্য আছে কোনো কাগজ বা কোনো সংখ্যায় শুধু আছেঃ উৎপল দত্ত ও বাংলা নাট্যজগতের সংকট; বোদলেয়ার আর নরকের ধারণা; উনিশ শতকের কলকাতার চিক বা পর্দার নকশা বা কারুকাজ; তিতুমীর সত্যি বিপ্লবী ছিলেন, না কি কোনো ফেরেব্বাজ, তা নিয়ে তাত্ত্বিক সন্দর্ভ; নয়া-ফ্যাসিবাদ, মৌলিক অধিকার ও ১৯৭২এর সাধারণ নির্বাচন; তিন বা ছয় বা আটটি ফরাসি স্ল্যাপস্টিকের তর্জমা; আন্তোনিয়ো গ্রাম্‌শ্‌চির জেলখানার নোটগুলোর সটীক ভাষ্য; ১৯৪৬ থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় সি-আই-এ যা যা করেছে বলে শোনা যায়, তারই বিস্তর টীকা-পাদটীকা সংবলিত গবেষণা প্রবন্ধ, ম্যাকমাহন সীমারেখা আর নেভিল ম্যাক্সওয়েলের ভারতযুদ্ধ; ই-ই-সি-পরবর্তী ইওরোপে রিলকের প্রাসঙ্গিকতা; একটি ছোট্ট কাগজ—সমান নিরপেক্ষভাবে পেড়ে ফেলছে সি-পি-এম, সত্যজিৎ রায় আর উদীয়মান ডেভিস কাপ খেলোয়াড়কে। আর এই পত্রিকাগুলোর আকার আয়তন—তারও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। পাতায়-পাতায় ছেলেমানুষি স্ববারির চিহ্ন; মাঝে-মাঝে, বিস্তর কাঁহা-কাঁহা নামের উল্লেখ আর দেখানেপনা; লিরিক উচ্ছলতার ফোয়ারা ছুটছে বিশপাতা-জোড়া বিপ্লবী আগুন ওগরাবার পরেই; সুস্পষ্ট সততার পাশাপাশি সহাবস্থান করছে ডাহা মিথ্যাচার ও অসাধুতা। লেখকরা পরস্পরকে পেড়ে ফ্যালে; শত্রুপক্ষকে যা-তা নামে ডাকে; সুবিধেবাদ গুটিশুটি মেরে ঢুকে পড়ে আর বিখ্যাত-সব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অকুতোভয় উৎসারণের পাশেই নিজের জন্য চমৎকার একটা কুলুঙ্গি বানিয়ে নেয়।

ভালো, মন্দ, এবং বেশির ভাগ সময়েই কিছুই-না, কিন্তু সব

মিলিয়ে এরা তবু তৈরি করেছিল একটি আবহাওয়া। বলতে পারেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের দর্পণ। অসহনীয় অহংকার, ম্যাটিনি-মার্কা প্যাচপেচে আবেগ, ডাগর চোখের স্পর্শাতুর বিস্ময়, অসংশোধনীয় নৈরাজ্যবাদ, অবিশ্বাস্য—ইন্দ্রিয়ময় পঙ্‌ক্তি রচনার দুঃসাহস, অর্থনীতি বা পুঁজি বিষয়ে চরম ঔদাসীন্য, দিন এনে দিন খাওয়ার বিপজ্জনক প্রতিভাস। কোনো কোনো লেখাকে আপনার মনে হবে প্রলম্বিত বয়ঃসন্ধির পারিতোষিক-পাওয়া নমুনা, কোনো-কোনোটা আবার অকথ্য বর্বরতায় ভরা; কিন্তু অকস্মাৎ, এই বিবদমান ভিড়ের মধ্যে, আপনি কুড়িয়ে পাবেন একটি লেখা, ছোটো অথবা বড়ো, পুঙ্খানুপুঙ্খ যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করছে উনিশশতকী ফরাশি রান্নার সামাজিক বুনিয়াদ, অথবা আলব্যের কামূ আর অবক্ষয়ের ধারণা সম্বন্ধে গভীর-নাড়া-দেয়া এক তাকলাগানো মৌলিক আলোচনা।

মান্নুন, চাই না-ই মান্নুন, এই লিটল ম্যাগাজিনগুলো রচনা করেছিল এক যৌগিক অখণ্ডতা, দ্রুত অবক্ষীয়মাণ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাপনের তলানিটুকুর এক উদ্ধত ঘোষণা। অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধে কবেই এদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। হাবার মতো কিছু কাজ আর ঘটনাচক্র—এই দুয়ে মিলে এটাই সুনিশ্চিত করে দিয়েছে যে অর্থকরী বিষয়ে তারা চিরকালই আকাট থেকে যাবে। যা-কিছু ঘটেছে অথবা ঘটতে পারেনি, তার জন্য মাঝে-মাঝে দোষ দেয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে, যুক্তি থাকুক আর না-ই থাকুক। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা অধিকতর স্বচ্ছ লেখা বেরোয় এ-সব কাগজের কোনোটায়, বাঙালিদের নিজের মধ্যেই যে বিস্তর দোষত্রুটি অক্ষমতা আছে, তারই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কঠিন ঘা-দেয়া একটা লেখা হয় সে, নির্মমভাবে বস্তুনিষ্ঠ, কোনোকিছুকে ছেড়ে কথা কয় না। কিন্তু কঠিন কথা যেমন কোনো হাড় ভাঙে না, তেমনি বাস্তবতার রূপটাকেও আদৌ বদ্‌লে দেয় না। বাংলার অনেক তরুণই তাই মুমুক্ষা খুঁজেছে বিপ্লবী মৃত্যুতে, কেউ উধাও হয়ে গেছে জেলখানায় গরাদের ওপাশে; আর কেউ-কেউ 'বনি অ্যাড ক্লাইড'-মার্কা আপাতরগরগে অভিযানে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, যদিও বিশুদ্ধ রোমান্টিকতার

উপাদান সামান্যই চুঁইয়ে পড়েছে তাতে। কিন্তু, এইসবের বাইরেও আরো একটা বড়ো অংশ থেকে যায়। এই শেষোক্তরা ঠিক জানে না তারা কোন্ দিকে যাবে। এমন স্বীকৃতি অবশ্য নিজেদের কাছেও কবুল করতে তাদের ঘৃণা হবে। বাঙালির অহং শেষ পর্যন্তও বাঙালিরই অহং থাকে। পুঁজির শোচনীয় অভাব, পুষ্টির অভাবনীয় অভাব, বাঙালি তরুণরা সংকীর্ণ, গণ্ডিবদ্ধ, অসংশোধনীয়—তবু ভাবতে ভালোবাসে যে বাকি জগৎটা লুটিয়ে থাকবে তাদের পায়ের তলায়, খাদ্য তাদের না-থাকতে পারে, সকাল থেকে সন্ধে অব্দি হয়তো একমাত্র যা তাদের পেটে পড়েছে তা আধগরম কয়েক পেয়ালা চা বা কফি, প্রাণের চাঞ্চল্য বা ফুর্তি তবু তাদের অস্তিত্ব থেকে কিছুতেই পুরোপুরি নিষ্কাশিত হয় না। এ-সময়—এবং সবসময়েই—এরা প্রত্যেকেই নিজের কাছে একেকজন পেল্লায় বীর, এবং বীর স্বয়ং এবার একটি লিটল ম্যাগাজিন বার করবেন।

হয়তো কোনোদিনই আগুন ধরানো যাবে না। হয়তো কোনো লিটল ম্যাগাজিনের পরমায়ু চিরকালই পূর্বনির্ধারিত, প্রাক্‌স্বীকৃত, যেমন আগে থেকেই পুরোপুরি জানা থাকে বাঙালি যুবকের উদ্বায়ী উৎসাহের দৌড়। এমনি অলসভাবে রাস্তার মোড়ের কোনো দোকানে দাঁড়িয়ে পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কোনো বহিরাগতর কাছে হয়তো মনে হবে যে এদের বিষয়সূচি বড়ো একঘেয়ে, বিরক্তিকর, অপ্রাসঙ্গিক; হয়তো কখনো এদের দু-একজনের সঙ্গে আলাপ হলেই আপনি চিনে ফ্যালেন এদের সবাইকেই। যদি এদের তুলে দেয়া বা বন্ধ করে দেয়া হয়, কাগজের দাম যেভাবে ক্রমেই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে আর সর্ববিসারী মুদ্রাস্ফীতি যেভাবে আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে শীগ্‌গিরই হয়তো বেশির ভাগই কাগজ তুলে দিতে বাধ্য হবে; তৎসত্ত্বেও, এ কিন্তু মোটেই পারেতো-ভণিত উপযোগিতার শেষ সীমার দিকে এগিয়ে যাওয়া হবে না। তাহলে এ হয়ে পড়বে পরিশুদ্ধির সুযোগবিহীন এক দুর্বিবহ জগৎ। আরিস্তোতল যেমন জপান, জ্ঞান নয়, ক্রিয়াকেই হতে হবে ফল। প্রত্যেককে তার আত্মজ্ঞানটুকু মঞ্জুর করাই যথেষ্ট নয়, অহংএর নির্গমেরও পথ চাই। ধ্বংসোন্মুখ বাঙালি

যুবক সম্পর্কসূত্রহীন, ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে না; শিল্পের জগতে তারা গোঁত্তা খাবে; জমি-মানুষের অনুপাত তাদের কৃষিকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে; পালে-পালে গিয়ে যে আজ বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে যোগ দেবে, অ্যাদ্দিনে তাদের সে-দিকে না আছে ঝোঁক, না আছে টান। দ্বিপদরাশির ক্রিয়াকারণ কাজ করে যাচ্ছে সবেগে, তুখোড়, নাছোড়, একটানা, আর এইসব তরুণ—আজ যদি তারা চায়ও—আর কিছুতেই ইতিহাসের নির্মম মোড়গুলোর নাগাল ধরতে পারবে না। অর্থনৈতিক সুযোগগুলো ভূসম্পত্তির পরিমাণেরই অপেক্ষক। ভূসম্পত্তি, যেমনভাবে তা এখন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কব্জায় গিয়ে পড়েছে, তার মধ্যেই কোনো স্বনির্মিত অনীহা আছে কিনা, অথবা বাঙালির কালাপাহাড়ি মনোভাব আর ছেঁদো রোমান্টিকতাই অবশেষে তাদের প্রতিহিংসার দেবী নেমেসিসের কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কিনা—এ-সম্বন্ধে জল্পনা করা এখন একেবারেই নিরর্থক। হয়তো এই প্রস্তাব দুটির শেষোক্তটিতে খানিকটা সত্যও আছে। কিন্তু বাঙালির ধাত থেকে তিক্ত বাঁকা সুর আর রোমান্টিকতার একান্তর ভঙ্গিকে ঝেঁটিয়ে বার করে দেবার অভীষ্ট চেষ্টাও খুব একটা কাজে আসবে কিনা সন্দেহ। এদের লিটল ম্যাগাজিনগুলো কেড়ে নিন, দেখবেন, এই তরুণদের অনেকেই একমাত্র যে-কাজটা জানত, এমন-কি তাতেও ব্যাপৃত থাকার সুযোগটাও হারিয়ে বসেছে। এই কাগজগুলো বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা যে সবাই স্বাভাবিকভাবেই সরকারবাহাদুরের খাশ কামরায় অথবা টাকা-তৈরির কারখানার অন্দরমহলে ঢুকে পড়বে, এটা মনে করা ভুল হবে। সম্পত্তি-কাঠামোর প্রশ্নটা নিছকই মনস্তাত্ত্বিক আবেশের বিষয় নয়: এ এক স্পর্শসহ, মূর্ত, সুবাস্তব অস্তিত্ব, কয়েকজন অলসপ্রকৃতি বালকের খেলনা কেড়ে নেয়া হয়েছে বলেই চটপট তাকে ভেঙে ফেলা যাবে না। যাদের হাতে এই সম্পদ আছে, তারা বাইরের লোকদের ঠেকাবেই: এই হবু স্বনিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের—অন্তত তাদের বিপুল অংশকে—শূন্য হাতেই ফিরে আসতে হবে। এই লিটল ম্যাগাজিনগুলো ছাড়া বেচারিরা করবেই বা কী?

ট্র্যাজেডি থেকে অট্টহাস্যকরকে আলাদা করে রেখেছে ছোট্ট একটা সরু বিভাজক। লিটল ম্যাগাজিন-বিহীন বিশ্ব, কারু-কারু মতে, হয়তো এমনই একটা জগৎ হয়ে উঠবে যে যেখানে নতুন আবর্জনার রাশি একটু কম। আপনি যদি অর্থনীতির গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে-আসা কোনো অহংসর্বস্ব মূল্য-উপযোগবাদী হন, লিটল ম্যাগাজিনগুলোর অনুপস্থিতিকে আপনার মনে হতে পারে, অত্যন্ত গুরুতর কোনো উন্নয়নের সূচক বলে, 'অনাগ্রাধিকার'মূলক ক্রিয়াকলাপগুলোকে ছিপি আটকে রেখে মূল্যবান কাগজের এত অপচয় রোধ করা যাবে। দেখে মনে হয় না কেউই এর সঙ্গে জড়ানো 'সুযোগ খরচ'এর কথা ভাবছে ঃ সেই হিসেব কষতে বসাটা হয়তো নেহাৎই নাকের ডগার ওপাশে তাকাবার চেষ্টা, সবসময়েই যেটা একটা অস্বস্তিকর ব্যায়াম। লিটল ম্যাগাজিন-গুলোকে তুলে দিয়ে আপনি, বলাই বাহুল্য, বিবিধ প্রণয় ও বহু স্বপ্নকে পিষে মারবেন। কিন্তু তার চেয়েও যেটা জরুরি ও প্রাসঙ্গিক, আপনি আত্মপ্রকাশের একটা উপায়কেও রোধ করে দেবেন ঃ যে-সব আবেগ-অনুভূতি-তাড়না জীবনের বিপজ্জনক বছরগুলো থেকে উৎসারিত হয়, সেগুলো এখন থেকে ফেনিয়ে পেঁচিয়ে পাক দিয়ে ফুটতে থাকবে টগবগ, কিন্তু বেরুবার, উপচে পড়ার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না —বহু তাড়নার জটিলতা রাস্তা হাৎড়ে মাথা কুটে বেড়াবে। যৌন-চেতনার উন্নয়ন সাধন বা রূপবদলের জন্য বিকল্পের ব্যবস্থা করতেই হয়। কথাগুলোকে যদি বেরুতে দেয়া না-হয়, কে জানে, হয়তো আরো অনেক রক্তঝরার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে।

২২
আনন্দময়ীর আগমনে

আবার পুজোর হিড়িক লেগেছে। এই মরশুমটা আজকাল মোটামুটি শহরগুলিরই একচেটিয়া দখলে। দেবদেবীরা গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির যোগ দ্রুত ঝেড়ে ফেলছেন। গ্রামের দিকে গরিবদের তো পুজো করার কোনো উপায়ই নেই, ধনীদেরও এখন পর্যন্ত দুর্গোৎসবকে বিলাসিতার প্রদর্শনীতে পরিণত করার মতো আত্মবিশ্বাস গজায়নি। তবু দেবদেবীদের তো টিঁকে থাকতে হবে; বারোয়ারি পুজোর ব্যবসা যাদের জীবিকা, সেই সামাজিক পরগাছাদের জন্যই টিঁকে থাকা দরকার। দেবদেবীদের বাণিজ্যীকরণ হচ্ছে বলা চলে; আর বাণিজ্যের সঙ্গে নাগরিকতার সম্পর্ক তো খুব ঘনিষ্ঠ।

এর ফল যা ঘটছে, সেটা মূলধনের সঞ্চালন থেকে মূল্যের উৎপত্তি হবার মতোই একটা ব্যাপার। নিংড়ে নাও, নিংড়ে নাও; সম্পন্ন গেরস্থ, সন্দেহজনক চেহারার ব্যবসায়ী, ট্যাক্স-এড়ানো পেশাদার লোকের বাড়তি মেদ ছেঁকে তোলো; সচ্ছলতার বন্যা বয়ে যাক। কিন্তু অন্যদিকে রেহাই যেন না পায় গরিব স্কুলশিক্ষক, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুধ্যমান কেরানি এবং নিম্নবেতনের পেনসনভোগীর হয়রান স্ত্রী। রোজা লুক্সেমবুর্গের 'তৃতীয় ব্যক্তি'রা দোরগোড়ায় বড়ো বেশি ঘুরঘুর করছে, আপনার আর্থিক অবস্থান তুলনায় অথবা স্বয়ংসিদ্ধভাবে যাই হোক-না কেন, তারা পুজোর নামে তোলা আদায় করবে এবং নিজেদের পকেট ভরাবে। কী ভাবে টাকাটা খরচ হবে জিগেস করতে যাবেন না। প্রথাগত হিসেব রাখা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুগের মাথাব্যথা তা কে না জানে? তবু যদি ঝামেলা করতে থাকেন, তাহলে বছরে একবার পুজো কমিটির মিটিং

বসবে, পেশাদার হিসেবরক্ষকদের দিয়ে আয়-ব্যয়ের আইনসম্মত তালিকা খুঁটিয়ে তৈরি করিয়ে আপনার হাতে দেয়া হবে, রসিদগুলি সবই প্যাওয়া যাবে। বস্তুত তৃতীয় ব্যক্তিসুলভ অস্তিত্বের ফন্দিফিকির এগুলোই। পরগাছারা এভাবেই বাড়বে এবং জমিয়ে বসবে। দীন-দুনিয়ার মালিক তো তারাই।

তার পরবর্তী রং-তামাশার মধ্যে একটা নির্মমতা আছে। দুর্গোৎসবের উপজীব্যই হল ফরমাশি গান এবং নকল সম্মোহন। হঠাৎ দেখা যায় বিদ্যুতের ঘাটতিটা কোনো সমস্যাই নয়। আলোকসজ্জায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়; আর ঢোলের শব্দ সপ্তমে ওঠে; বারোয়ারি পুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'; রাজনৈতিক নেতারা—যাঁদের কিছুতেই শিক্ষা নেই—এসে হাজির হন। সাংস্কৃতিক চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা এমন-কি পূজা অনুষ্ঠানও 'উদ্বোধন' করেন। তৃতীয় ব্যক্তিদের তখন ব্যস্ততার মরশুম; টাকার ঝনৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের আরো ব্যস্ত, আরো একাগ্র দেখায়, তাদের নিশ্চিন্ত আত্মম্ভরিতা আরো বেড়ে চলে। সবই খেলার অঙ্গ। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও একটা নির্মমতা আছে। উদ্বর্তনের অলঙ্ঘ্য নিয়ম না মেনে উপায় নেই। চাচা আপনা বাঁচা, এটাই সেই নিয়ম। মণ্ডপের বাইরে যদি ক্ষুধাতুরের ভিড় জমে, 'তৃতীয় ব্যক্তি'দের তাতে কিছু এসে যায় না। ব্যবসা ব্যবসাই; আর কোথায় কয়েকজন হতভাগ্যের কী একটু অসুবিধা হয়েছে, কারা ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে পারছে না, তাতে দুর্গোৎসবের ব্যবসাটা তো মুলতুবি রাখা যায় না। তাছাড়া আপনি বোধহয় লক্ষ্য করেননি যে এ-বছর খরচের খাতে দুর্ভিক্ষত্রাণ নামে একটা বিশেষ হিসেব দেখানো হয়েছে! এতেই তো সমস্যার সুরাহা হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে আপনারা শুনলে সুখী হবেন, সমবেত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, যে আগামী কালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটি নতুন আইটেম যোগ করা হয়েছে; শ্রীমতী ভীমপলশ্রী বসু কত্থক নৃত্য প্রদর্শন করতে রাজি হয়েছেন।

বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের ঘোষণা রয়েছে এখানে। এ-সব ঘটনা তো আর আটশো, হাজার কিংবা পনেরোশো মাইল বা

কিলোমিটার দূরে ঘটছে না, এই বাস্তব তো একান্ত কাছের ; যে-পার্কে দুর্গোৎসব চলছে তার একশো মিটার দূরেই গলির যে-মেয়েলোকটি ভিক্ষা করছে, কাঠি কাঠি হাতপা যে-বাচ্চাগুলো দেবীর চোখধাঁধানো মূর্তির দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তারা তো শ্রীমতী ভীমপলশ্রী বসুর মতোই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুময় জগতেরই অংশ। কিন্তু-এরকমই হয়, বাণিজ্যের হাওয়া সব শুষে নেয়, মানবসভ্যতায় ব্যক্তির প্রাধান্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। সমাজ তখন এক বৃহৎ বাজারে পরিণত, দর হাঁকাটাই সেখানে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, দর হাঁকার পেছনে যখন থাকে শক্তিশালী চাহিদা ; আর অন্যরকমের যে-ডাক, মানুষের ক্ষিধের ডাক, তার কোনো গুরুত্বই নেই। টাকায় কথা বলে, টাকার অভাব একটা দুরারোগ্য ব্যাধি, যারা এই ব্যাধিতে ভোগে, ব্যাধির ফলাফলও তাদের কপালে ঘটবে।

এতে সৌন্দর্যবোধের ব্যত্যয়ই বা ঘটে না কেন, সে-তর্কে গিয়েও কোনো লাভ নেই। সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা যে-কোনো যুগেই শ্রেণী-ভিত্তিক। রোমানদের রক্তাক্ত ক্রীড়াগুলিকেও তৎকালীন কোনো সমালোচক সৌন্দর্যবোধের যুক্তিতে নিন্দা করেনি। ক্রীতদাসদের সিংহের মুখে নিক্ষেপ করার রীতি সমেত সবকিছুই নির্দোষ আমোদ ছাড়া আর তো কিছুই নয়। অসতর্ক মুহূর্তে আপনি বড়ো জোর একটু অস্বস্তি বোধ করতে পারেন এই ভেবে যে একদিকে যেখানে সাম্য, সমাজতন্ত্র ও কৃচ্ছ্রসাধনের এত গালভরা বুকনি, সেখানে অন্যদিকে কীভাবে ধনীদের যথেচ্ছ আমোদপ্রমোদের পাশাপাশি খাদ্যাভাবের মতো পার্থিব কারণে মানুষ রাস্তায় পড়ে মরছে। কিন্তু আসলে, অবাধনীতির মূল কথাই তো তাই, ভালোর সঙ্গে মন্দকেও মেনে নিতে হবে, আপনার পৌষমাসে অন্যদের যদি সর্বনাশ হয়, তাতে আপনার কী এসে যায়? যতক্ষণ সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে প্রয়োগবাদ এসে না-মিশছে, ততক্ষণ তা আকাশ-কুসুম মাত্র। আর প্রয়োগবাদ যখন একটি নান্দনিক তত্ত্বের সূত্রগুলি বিবৃত করে, তখনও শ্রেণীসম্পর্কের যে বাস্তবতা তার হদিশ ঠিকই রাখে।

এইজন্যই বারোয়ারি পূজার প্রথাকে যদি আপনি নিন্দা করতে শুরু

করেন, তাহলে রাজনৈতিক নেতাদের কাউকেই আপনার ধারে-কাছে দেখতে পাবেন না। বরং তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু সংসারাভিজ্ঞ, তাঁরা আপনাকে চারটি উপদেশও দিয়ে দিতে পারেন ; এই পুজোর ব্যবসাগুলি উদ্বৃত্ত মূল্যের সক্রিয় সঞ্চালনে সহায়তা করে, এগুলোতে উৎসাহ না-দেওয়া মানে নীরস কাজ ও ততোধিক নীরস মুনাফালোটার এক বিষণ্ণতর পরিস্থিতির অভিশাপে নিজেকে জড়ানো। অবশ্যই উদ্বৃত্ত মূল্যে তো কারও জন্মগত অধিকার নেই, তা সৃষ্টি হয় হীন, ফন্দিবাজ মানুষের অগ্রগতি থেকে ; তাদের নিজেদের সময় যতক্ষণ ফুর্তিতে কাটছে, ততক্ষণ অন্যরা ক্ষুধায় কাতর রইল কিনা তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। যতরকম কায়দাকানুন দেখানোর আছে, সব দেখানো শেষ, লোকঠকানো যতদূর হতে পারে হয়েছে, বুলিগুলো আওড়ানোও হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও ক্ষুধার্ত এবং অভুক্তরা খাদ্যের জন্য দুর্বলকণ্ঠে ভিক্ষা জানাচ্ছে, আর ওদিকে শ্রীমতী ভীমপলশ্রী বসু পায়ে এবং শরীরে উল্লাস জাগিয়ে সারারাত নেচে চলেছেন। নাকি এই সংবেদনশীলতার অভাব একটা নতুন পতনের লক্ষণ। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং পরোপকার—আগেকার দিনে এগুলোকে গুণ বলে ধরা হত, আজ তার বদলে পাওয়া যাচ্ছে একটা চতুরালি ; সমাজতন্ত্রের ভড়ং এবং ব্যক্তিগত মুনাফার অবাধ অনুসরণকে মেশানো সম্ভব, এই বিশ্বাসের ওপর যা দাঁড়িয়ে আছে। এই হল আজকের দিনে আমাদের উত্তরাধিকার। 'তৃতীয় ব্যক্তি' নামে যাদের সবচেয়ে বেশি মানায়, সেই জোগাড়ে লোক এবং দালালরাই এই সমাজ-ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ : চাকরি জোগাড় করা যায়, বক্তৃতা সাজানো যায়, এমন-কি জনসংযোগের ব্যবস্থাগুলো যদি আপনার হাতে থাকে, তাহলে আপনার পক্ষে একটা দুর্ভিক্ষও জোগাড়যন্ত্র করে ঢেকে রাখা নেহাৎ অসম্ভব হবে না, কারণ নৈর্ব্যক্তিক বস্তুতান্ত্রিক বিষয়গুলিও বিভিন্ন আলোকে তখন দেখানো যায়। অতিব্যক্তিক বিষয়েরও অভিধাটা আপনিই ঠিক করে দিতে পারেন, এবং যে-কবি, সম্পাদক অথবা সমাজ-বিজ্ঞানী আপনার দেওয়া অভিধাকে স্বীকার করে না, তাদেরও চুপ করিয়ে দিতে পারেন। পালপার্বণগুলি এই ব্যবস্থার সঙ্গে ভালোই খাপ খেয়ে

যায়। এগুলোর সাহায্যেই মধ্যবিত্ত সুস্থতার মুখোশটা বজায় রাখা যায়; পালাপার্বণ হল সেই দালালদের মতো যারা সমাজকে ঠিকমতো চালায়। পুজোর মরশুম চলছে, ঢাকে কাঠি পড়েছে, মন্ত্রের পবিত্র ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, বড়োলোকেরা তাদের গয়না এবং বেশভূষা বের করেছে, শ্রীমতী ভীমপলশ্রী বসুর পা এবং কোমর কত্থকের দ্রুত ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে, মহোৎসবের কর্মকর্তারা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে, নেতারা নিরাপদ বোধ করছেন। সব হাতের মুঠোয় আছে। দুর্ভিক্ষের ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলা গেছে, ক্ষুধিতের কান্না আর শোনা যায় না, তাছাড়া দেশের এক মন্ত্রীও মার্কিনদের সামনে হলফ করে বলেছেন দুর্ভিক্ষে একটিও লোক মরেনি। ঢাকের বোল দ্রুততর হোক, কত্থক নৃত্যের সঙ্গে গা ছমছম-করা উত্তেজনা ফেনিয়ে উঠছে, উৎসবের দিন শিগ্‌গিরই কেটে যাবে, তবু, ভাববেন না, হয়তো আরো নতুন উত্তেজনা আমাদের সামনে —স্বর্গ থেকে মণ্ডামেঠাই নাই বা খসে পড়ল, তবু নিদেনপক্ষে আকাশে উঠতে পারে স্পুটনিকের দেশী সংস্করণ, আর তার পেছনেই হয়তো আসবে সাধারণ নির্বাচন।

২৩

টোটেমই সব

অর্থনৈতিক দুর্দশা যত ছড়িয়ে পড়ে, জীবনের সব পথের পথিকরাই আবিষ্কার করে বসে বাস্তব থেকে পালাবার যে-যার-নিজের-মতো ঘুলঘুলি। একবার যখন জীবনের অগুনতি সমস্যার স্পষ্ট সমাধানগুলো মাঠে মারা যায়, মনোযোগ সরিয়ে আনতে হয় বিশ্বাসের সর্বরোগহর বটিকায়। অস্পষ্টতা স্থানচ্যুত করে চিন্তার স্বচ্ছ সংগতি। ব্যক্তিরা খুঁজতে থাকে তাদের ব্যক্তিগত বিপত্তির আকস্মিক, ছপ্পর-ফুঁড়ে-পড়া, ঐন্দ্রজালিক নিষ্পত্তি। সামাজিক সমাধান—তারা ভেবে বসে—এ-তল্লাটে মেলবার নয়; তাই তারা হন্যে হয়ে ওঠে তক্ষুনি-ফেঁদে-বসা সব ব্যবসার খোঁজে চট করে যাতে তাদের মুশকিল আসান হবে।

কেউ যদি কলকাতার পথঘাট দিয়ে হেঁটে যায়, এই ব্যাপারটা গোচর হবেই। বারোইয়ারি—বা সার্বজনীন—পুজোর সংখ্যা বেড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আধ্যাত্মিক নেতাদের বারফট্টাইও মালুম হতে শুরু করেছে। দেবদেবী ও তাদের চেলাচামুণ্ডার এতটা প্রাদুর্ভাব আগে আর-কখনো দেখা যায়নি। নাম-না-জানা ক্ষুদে-ক্ষুদে দেবদেবীদেরও টেনে-টেনে বার করা হয়েছে বারোইয়ারি তাঁবুর তলায়। তাই বলে এঁরা কিন্তু সস্তাদরে গণ্ডায়-গণ্ডায় বিকোন না; ঠিক তার উলটোটাই বরং। জনসাধারণের ওপর বাধ্যতামূলক জেজিয়া—রাজনৈতিক মুগুর ও ছোরা ঘুরিয়ে—চাপিয়ে দিয়ে প্রতিমাসেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ-কিছু রাজস্ব সমাগম হয়—আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এইসব দেবদেবীদের পুজোর আয়োজন করবার জন্যই। বেকার ছোকরারা এমন একটা বৃত্তি মাথা খাটিয়ে বার করে ফেলেছে যার মারফৎ রথ দেখা আর কলা বেচা, ধর্মাচার আর হাতখরচা

—বেশ মোটারকম হাতখরচা—দুইই মিলিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। বারোইয়ারি পুজো আর সস্তা হিন্দি ছবির বক্স-অফিস সাফল্য—এই দুয়ের মধ্যে বেশ-একটা সুমাত্রাসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। দেবদেবীদের পরেই—কিংবা তাঁদের মতোই সমান তাৎপর্যময়—হল চিকিৎসার বদলে ব্যাঙের-ছাতার-মতো-সবখানে-ছড়িয়ে-পড়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন করনেওলাদের প্রাদুর্ভাব। এই মুশকিল আসানেরা সারিয়ে দেবেন আপনার ক্যানসার, আপনার বেঙা পেতলকে রূপান্তরিত করবেন নিখাদ সোনায়, আপনাকে জুটিয়ে দেবেন চাকরি, ঘটিয়ে দেবেন চাকরিতে পদোন্নতি, আপনি যাতে ঠিকেদারিটা বাগাতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন, এরা আপনাকে চাই-কি মন্ত্রী বানিয়ে দেবেন, এবং আপনার দুহিতার জন্য সুপাত্র জুটিয়ে দেবেন।

যে-সমস্যাগুলো কিছুতেই বাগ মানছে না, তার মন্ত্রপূত তাৎক্ষণিক সমাধানের গাজরটি ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে আপনার নাকের ডগায়। কিছুতেই যখন কোনো ফায়দা হল না—বেশ অনেকেই নিজেদের মধ্যে যুক্তি আর শলা শানায়—তো, একবার, গুরুর শ্রীচরণে মতি সমর্পণ করেই দেখা যাক-না কেন। খুড়োর কলটা বেশ ভালোই ফেঁদেছে, তবে পথটা ভারি পেছল। আপনাকে যা করতে হবে, তা হচ্ছে কিছুই-না; আপনি দিব্যি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন, আর টোটেম আর ট্যাবু সব দখল করে জাঁকিয়ে বসবে। যেমন গরিবগরবাদের মধ্য থেকে, তেমনি পাতিবুর্জোয়াদের মধ্য থেকে, নানা মতপথের বিস্তর লোক তাই বিকল্প ঘর বা খুঁটিগুলোর মধ্যে এক্কাদোক্কা বা কানামাছি খেলতে থাকে। সবাই মিলে সংগ্রামী আন্দোলন চালিয়ে তো ধরাছোঁয়ার মতো কোনো লাভ হল না; তো অন্তর্বর্তীকালীন কিছু-একটা হোক—গুরুবাদের অন্তর্বর্তীকাল, ভোজবাজির।

বাঙালির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাহতির পরতের ভেতরে পরত, আস্তরের মধ্যে আস্তর, প্রবণতার মধ্যে প্রবণতার মুখোমুখি আপনাকে যে দাঁড়াতে হয়, তা এই কারণেই। সাময়িকভাবে—অথবা চিরকালের মতোই—রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলপ্রদায়ী কার্যকরতা সম্বন্ধে যাদের একবার

মোহভঙ্গ হয়েছে, কোনো আধ্যাত্মিক গুরু তাদের গায়ে, মোলায়েমভাবে সব প্রাণজুড়োনো মলম মালিশ করে দেন। যদি একবার কোনো রাজনৈতিক নেতা প্রতিশ্রুত সুদিন এনে দিতে ব্যর্থ হন—কিংবা নেতাটি যদি ভণ্ড বলে একবার প্রমাণ হন—ঘাবড়াও মৎ, আপনার জন্য তুলে-রাখা আছে আধ্যাত্মিকতার বিশল্যকরণী। ঠিকেদারদের মধ্যে কেউ নিখাদ খাঁটি, কেউ বা ভেজাল মাল। এ-তো হবেই। সামাজিক সব সমস্যার যে অর্থনৈতিক উৎস আছে, এ-সম্বন্ধে জনগণের অবধান এখনো ভাবালুতার বুড়বুড়ির সঙ্গে আচ্ছা করে মেশানো, সে আসল থেকে নকলকে—বা অলীককে—আলাদা করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী, এতে ভণ্ড আর হাতুড়েদের পক্ষে নিজেদের মনোমতো লাগসই এক কুলুঙ্গি তৈরি করে নিয়ে, নিজেদের চোখধাঁধানো জাঁকজমকের প্রদর্শনী খুলে বসতে বেশ সুবিধে হয়। কিন্তু জীবিকাটা আবার একটু গোলমেলে, কখন যে কী হয় ঠিক নেই, বিস্তর ঠোকাঠুকির ফলে ভির্মি খাবার, ডিগবাজি খাবার হারটাও বেশি। অঘটনগুলো ঘটতেই থাকে, আর দেবতারা ফেল মেরে যেতে থাকেন, আর অন্য দেবতারা এসে তালুকমুলুক জুড়ে বসতে থাকেন। একজন দাদার স্বরূপ যদি ফাঁস হয়ে যায়, লোকে কিন্তু দাদা জাতটার সম্বন্ধেই বিমুখ হয়ে পড়ে না, বরং তারা অন্য দাদার শরণ নেয়, চেষ্টাটা পুরো চালিয়েই যায়, মরিয়া হতাশ এক-একটা পরম্পরায়; এবং এ-চেষ্টা চালাতে গিয়ে তারা ভিখিরি হয়ে যেতে পারে, দেউলে হয়ে যেতে পারে, কেননা দাদাদের—এবং দাদাদের ছোটো ভাইদের—এক দারুণ ক্ষমতা আছে আপনার উপার্জন ও ভূসম্পত্তি হাতিয়ে নেবার।

অনেক ধর্মব্যবসায়ী আবার মার্কিন সদাগরি রীতিনীতির সঙ্গে ঠুনকো আজগুবি আচানক দার্শনিকতা মেশাবার কসরৎটা গুলে খেয়ে ফেলেছে। তাদের তাৎক্ষণিক মুখনিঃসৃত বাণীতে থাকে মনভোলানো বোল, নিগূঢ় সব তত্ত্বের সঙ্গে যা জটপাকানো ; আর কিংবদন্তিগুলো সহজে ছড়িয়ে দেবার উপায়ও আছে। সেইজন্যই, অর্থনৈতিক অবস্থার মৌলিক ও গুণগত বদল যদি না-হয়, আধ্যাত্মিক পাণ্ডারা

সম্ভবত একটানা খদ্দের পাকড়ে যেতে পারবেই। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যে মদ-গাঁজা ভাং-চরস মেশাবার ঝোঁক ও অভ্যাস থাকে কারু-কারু, এটা কিন্তু মোটেই রাষ্ট্রের কোনো গুপ্তকথা নয়ঃ কিন্তু এই জলতরঙ্গর কাছে আপনি কে? যারা ভোজবাজির মতো সব মুশকিল আসান করে দেবার চটকদার প্রতিশ্রুতি দেয়, লোকে পিল-পিল করে তাদের কাছে ছুটতেই থাকবে।

কারবার যা চলেছে, তাতে যে কোনো বিনিময়ের বালাই নেই, এটা একটা অদ্ভুত লক্ষণ। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলপ্রদানে অক্ষমতা মধ্যবিত্ত ও গরিবদের ছুটিয়ে নিয়ে যায় এইসব ভণ্ড ফেরেব্বাজ মুশকিল আসানদের কাছে। কিন্তু যখন কোনো ঝাড়ফুঁক অথবা পাণ্ডাই কোনো মুশকিল আসান করতে পারে না, তখন কিন্তু ফের ব্যারিকেডে এসে যোগ দেবার কোনো স্বতশ্চল গতি দেখা যায় না। রাজনৈতিক আঙিনায় যদি ফিরেও আসে কেউ, উপজাতীয়তার বিস্তর লক্ষণ থেকেই যায়। সংগঠিত জনগণের আন্দোলনে আস্থা বা বিশ্বাসে ঘাটতি কমে না; রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক লক্ষ্যের অভীষ্টে পৌঁছুবার জন্য কোনো রংদার জেল্লাবাজ মোহময় নেতার মধ্যস্থতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরা হয়, বাঙালি মানসের কাছে সুভাষচন্দ্র বসুর আকর্ষণ মোটেই কিছু কমেনি, এমনকি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই জোরদার জমকালো দিনগুলোতেও। নকশালপন্থীদের চেয়ারম্যান মাওয়ের নাম জপ করার পেছনেও—অনুমান করা সম্ভব—এমনি-কোনো বোধ সম্ভবত কাজ করেছে—কোনো পিতৃপ্রতিমের কাছে নিজের প্রশ্ন বা সন্দেহগুলোকে সমর্পণ করে দেবার তাড়া। আর, দুই ঋতু আগে, বাংলাদেশে শত্রু-নিধনের পর, ইন্দিরা গান্ধির উল্কার মতো উত্থানের পেছনেও টোটেমবাদের মোক্ষম দাওয়াই আছে; নেহরু-দুহিতা আবির্ভূতা হলেন শত্রুনাশিনী দেবী দুর্গা হিসেবে, ভগবতী পালিকায় তিনি যে পরিণতা হবেন এমন ইঙ্গিতও তারই প্রতিশ্রুতি।

যাঁরা ভাবছেন এ-তল্লাটের এইসব কাজকারবারগুলো সাময়িক বিভ্রান্তিমাত্র, এবং, সম্ভবত শিগ্‌গিরই আবার ধ্রুপদী ধরনে তীক্ষ্ণ বিভাজিত

শ্রেণীসত্তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হবে, তাঁদের কপালে হয়তো একটা বড়ো আশাভঙ্গ আছে। যে-মুশকিল আসানরা এখন বিশ্বাসের নামে জনগণের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে, নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে, তারা তো নিছকই গভীরতর কোনো অস্থিরতার রোগলক্ষণ। এক ধরনের উপজাতীয়তা এঁটে বসেছে, যুক্তিগ্রাহ্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করার আগে তা নিশ্চয়ই তার বলি দাবি করবে। জনগণ আর রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর ওপর যতদিন কিছু ফড়ে, দালাল আর ঠিকেদার তাদের অলুক্ষুণে ছায়া ছড়াবে, অর্থনৈতিক দাবিগুলোর বাস্তবায়নের লড়াই ততদিনই মুলতুবি রাখা যাবে। একদিক থেকে, এই দালালদের উপস্থিতি অর্থনৈতিক বিকাশ পেছিয়ে দেবেই। কারণ যতদিন টোটেমবাজি শাসন চালাবে, এই ধারণাটাই টিঁকে থাকবে যে, যেমন কারু ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সমস্যার রাতারাতি সুরাহা হতে পারে, তেমনিভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোও ভোজবাজির মতো মিটিয়ে ফেলা যাবে। অর্থনৈতিক ফুশমন্তর বা ভোজবাজির অনুসন্ধান—আর কেউ নয়, স্বয়ং এদেশের প্রধানমন্ত্রী শুদ্ধু যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটাই বুঝিয়ে দেয় এ-দেশের মজ্জায়-মজ্জায় ইন্দ্রজাল আর অন্ধবিশ্বাস কতটা শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে: অর্থনীতি, গণিত ও পদার্থবিদ্যার নীতিগুলো বড়ো কঠিন, বড়ো কর্কশ: তো, তাদের এড়িয়ে চলুন, তার বদলে শরণ নিন আধাভৌতিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তির। সিদ্ধান্তটা ভেবেচিন্তেই নেয়া; এবার থেকে দাদারা আর বাবারাই হবেন দেশের ত্রাণকর্তা। আর যদি কখনো পাড়াতুতো কোনো দাদা ভির্মি খান তো আমরা বেরিয়ে পড়ব বৃহৎ পৃথিবীতে, এবং বিদেশ থেকে আমদানি করব বিকল্প—পনেরো বছরের ঠিকেয়, কিস্তিবন্দী হারে।

২৪

গ্যের্নিকা মৃত্যুহীন

প্রত্যেকের কাছেই পাবলো পিকাসো তার নিজস্ব। কেউ নীল পর্যায়ের অপ্রতিরোধ্য মায়ায় মুগ্ধ, কারও কাছে পিকাসো অসংখ্য কিউবিস্ট কাঠামোর উদাহরণস্বরূপ; কেউ বা ফ্যভ্-প্রভাবিত পিকাসোর মধ্যেই অর্থ খুঁজে পান। আবার আপনার পছন্দ হয়তো ফ্রান্সের স্বর্ণবেলানিবাসী অসম্ভব ধনী, ঈষৎ পাগলাটে সেই পাবলোকে। যাঁর চোখে রহস্যের ঝিকিমিকি, যিনি অস্থিরভাবে এটা-সেটা নিয়ে শৌখিন খেলা খেলছেন, মৃৎশিল্প থেকে যাচ্ছেন স্কেচে, স্কেচ থেকে ভাস্কর্যে।

আরো কেউ-কেউ আছে, যাদের কাছে পিকাসোই গ্যের্নিকা, গ্যের্নিকাই পিকাসো। সেই পিকাসো এমন একজন শিল্পী, যিনি বিশ্বাস করেন জীবন ছাড়া শিল্প নেই, শিল্প জ্যান্ত অভিজ্ঞতারই অনুলিখন, শিল্প মানে লড়াই আর শিল্পী একজন যোদ্ধা। গ্যের্নিকা ছিল এক মৌলিক আবেগের দলিল, মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধ্বনিত প্রতিবাদ; আজও গ্যের্নিকা তাই। কিন্তু তাছাড়াও গ্যের্নিকার অর্থ জীবনের ঘোষণা, গ্যের্নিকা মানেই ক্রোধ এবং সমবেদনা, হতাশা এবং আশা, ঘৃণা এবং প্রেম; আগেও তাই ছিল, আজও তাই আছে।

স্পেনে তখন প্রতিরোধ ভেঙে পড়ছে, যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই পেছনে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে মৃত, প্রায়ই তাদের শেষকৃত্যও করা যায়নি; অন্যেরা ইতস্তত ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই অনুভূতির তীব্রতা বহুদিন পর্যন্ত টিঁকে ছিল। স্পেন উদ্ধার করা হল না, কিন্তু লড়ে যাবার মতো আদর্শ অন্যত্রও ছিল। ফ্যাশিবাদের সঙ্গে সংগ্রাম চলছিল অনেক জায়গায়, ইউরোপে এবং ইউরোপের বাইরে। স্পেনে জিতলেও অন্য প্রতিটি

দেশেই ফ্যাশিবাদের মৃত্যু ঘটল অনিবার্যভাবে। সোভিয়েত রাশিয়া যখন বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠেছে, পিকাসো তখন আশেপাশেই ছিলেন। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আবার জোট বাঁধতে শুরু করল। উইনস্টন চার্চিল অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ফুলটন বক্তৃতা পরিবেশন করেন, বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টকে হলিউড থেকে তাড়ানো হয়, 'হাউস অ্যান্টি-আমেরিকান অ্যাকটিভিটিজ্‌ কমিটি' মঞ্চে প্রবেশ করে, জো ম্যাকার্থির আমল শুরু হতে আর দেরি নেই। রোজেনবার্গ দম্পতি বীরের মৃত্যু বরণ করলেন, জেনারেল ম্যাকআর্থারকে কোরিয়ার ওপর লেলিয়ে দেওয়া হল, ওদিকে হো চি মিন সড়ক জ্যান্ত হয়ে উঠল। দিয়েন বিয়েন ফু এসে দাঁড়াল ইতিহাসের দোরগোড়ায়। পাবলো পিকাসো তখনও সংগ্রামে নিযুক্ত, শান্তির পারাবতগুলি সব-জায়গায় ডানা ঝাপটাচ্ছে, আপনার স্বপ্নে তারা প্রতীকী রূপ নিয়ে আনাগোনা করে, এমন-কি আপনার প্রণয়িনীর রুমালেও তাদের ছবি। তখনও বিশ্বাসের দিন, আত্মনিবেদনের দিন, স্বপ্ন দেখার দিন শেষ হয়নি।

খুব কম লোকই তখন জানত যে সময় আর বেশি নেই। বিংশতিতম কংগ্রেসই ঘটাল অন্তর্ঘাত, আদর্শবাদ আর কোনোদিনই সেই ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। এ-সবের মূলে কী ছিল, সেই বিশ্লেষণ যদি এড়িয়েও যাওয়া যেত, তবু নিকিতা ক্রুশ্চভ হাতে-হাতে যে ফল ধরিয়ে দিলেন তা সবাই দেখেছে। গ্যের্নিকা, শান্তি পারাবত, পিকাসো—এরা প্রত্যেকেই শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক, লড়াকু আদর্শবাদীদের সাথীদের প্রতিভূ। এই সাথীত্বকেই বিংশতিতম কংগ্রেস নাকচ করে দিল। লড়াই করার মতো বিশ্বজনীন আদর্শগুলির মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এল। তারপর থেকে জন অসবোর্নের নায়ক অতীতের দিকে তাকাল কেবল ক্রোধ নিয়ে।

স্বাভাবিক কারণেই বার্ধক্য আনে বিস্মৃতি। কিন্তু গ্যের্নিকার প্রসঙ্গ বা স্রষ্টার নাম উল্লেখ করার সুযোগ যে আজকাল এত কম আসে, তার কারণ আরো গভীর এক অসুখ। গোষ্ঠীগত আত্মরতিতে নিমগ্ন দুনিয়ায় আদর্শবাদীদের নিয়ে বড়োই মুশকিল। পিকাসোর প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষকদের

অনেকেই পিকাসোকে নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। শিল্পের জায়গা নিয়ে নিচ্ছিল নিছক দক্ষতা ; ভূতপূর্ব আদর্শবাদীদের সম্বন্ধে শেখানো হচ্ছিল আদর্শচ্যুতির আরাম। রক্তনিশান ও আন্তর্জাতিক সংগীত অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে পাবলো পিকাসোও অবান্তর হয়ে গেলেন। গল্পজাতিসুলভ অফুরন্ত চাতুর্যের ভাণ্ডার নিয়ে তিনি নিজেকে গুটিয়ে ফেললেন। শেষ দিকে, তাঁর কথা আর বিশেষ শোনাই যেত না।

তবু রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ানোতে সত্যিই কি কিছু এসে যায়? কলকাতার বস্তির হাভাতে ছেলে, কিংবা পুরুলিয়ার গ্রামে খাজনার ভারে জর্জরিত আদিবাসী কৃষক কখনো পিকাসোর নাম শোনেনি। পিকাসোর কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল এদের বিশেষ বেঁচে থাকার ধরন। কিন্তু তাঁর শিল্প ছিল সূক্ষ্ম, তিনি দেখেছিলেন শোষণের কোনো দেশ কাল নেই: দেশকালবিশেষে শোষণের আঙ্গিক বদলায় মাত্র, তার বিষয়বস্তু একই থাকে। শুনতে হয়তো অবিশ্বাস্য লাগে যে নিউ অর্লিন্সের বস্তির কালো মানুষ, কিসদাদ ওরেগনের লাগোয়া বিস্তীর্ণ মাঠে মেক্সিকোর তুলো-কুড়ুনি, পশ্চিমবঙ্গের জেলে আটক রাজনৈতিক কর্মী আর মার্কিন নেপামে বিকৃতাঙ্গ ভিয়েৎনামি শিশু—এদের সবার যন্ত্রণাই আসলে একই কাহিনীর অংশবিশেষ। কিন্তু প্রশ্নটা মূলত বিশ্বাসের—এবং অন্যের অনুভূতির সঙ্গে একাত্মবোধের। যে-মুহূর্তে দূরদূরান্তবাসী নানা লোক এক উত্তরাধিকারে সামিল হয়, একটি লক্ষ্যকে সমবেত স্বীকৃতি দেয়, তখনই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের জন্ম হয়। মূল্য আরোপণ থেকেই তো শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস আসে। মূল্য আরোপ করা মানেই সৃষ্টি করা।

সংগ্রামী শিল্পী পাবলো পিকাসো ঠিক এই কাজই করতেন। গ্যের্নিকা নামের ঐ একটি ছবি, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শান্তি-পারাবতদের ঐ প্রাণপ্রাচুর্য সৃষ্টি করেছিল এমন এক উন্মাদনা, এমন এক আদর্শ-প্রীতি, এমন এক ক্রোধের দাহ, এমন এক তীব্রতা, যার ভাগ সবাই নিতে পারে। পিকাসো নিয়ম মানার লোক ছিলেন না; বিধি-বিধানের গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে রাখতে তিনি বরাবর অস্বীকার

করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর শিল্পের জ্বলন্ত সক্রিয়তা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। দিঙ্‌নাগেরা তাঁকে হারাতে না-পেরে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। হয়তো ঐ উপায়েই তারা তাঁকে দলে টানতে চেয়েছিল। তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধরনে, যেমন মাওৎ সে তুঙের নিন্দামূলক একটি বিবৃতিতে তাঁকে দিয়ে কিছুতেই সই করানো যায়নি।

এই খাপছাড়া ছোট্ট মানুষটির অবদান কী তা নিয়ে আরো অনেকদিন প্রচণ্ড ঝগড়া চলবে। অনেক নারী এসেছিলেন তাঁর জীবনে, তাঁরা তাঁর ঐহিক সম্পত্তি নিয়ে বচসা চালাবেন। এম. জি. এম. হয়তো শিগ্‌গিরই পুরোদস্তুর একটি জীবনীচিত্রে হাত লাগাবে; নিঃসন্দেহে ফরাশি কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর ওপর মালিকানা দাবি করবে, দখলের লড়াই অনেক দূরের বামপন্থীদের মধ্যেও ছড়াবে, জঁা পল সার্ত্র ও সিমোন গু বুভোয়া তাতে যোগ দেবার দায়িত্ব বোধ করবেন; বাম তটে উত্তর-প্রত্যুত্তরের পাহাড় জমে উঠবে। হাওড়ার বেকার কারিগর ও বাঁকুড়ার নিঃস্ব দিনমজুর কখনোই তাঁর নাম শুনতে পাবে না; তাঁর প্রত্যক্ষ অবদানে তাদের কোনো ভাগ থাকবে না, তাদের দৈনিক শ্রমের চেহারা যেমন ছিল ঠিক তেমনি থেকে যাবে। যে-খনিগুলিতে মানুষ-খুনের ব্যবসা চলে, তার যদি জাতীয়করণ হয়েও যায়, তবু খনিশ্রমিকদের তখনও বাঁচতে হবে এবং মরতে হবে কতগুলি নরকতুল্য খুপরির মধ্যে; কারণ পশুদের মতো তাদের জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলা করা যায়। রাতের অন্ধকারে জোতদারের লোকেরা তখনও থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের যোগসাজশে স্থানীয় পুলিশবাহিনীর সহায়তায় ভাগচাষীর ভগ্নপ্রায় কুঁড়েয় হানা দিয়ে ধান লুট করে নিয়ে যাবে। অল্পবয়সী যে কলেজ শিক্ষকটি বিপ্লবের পত্রপত্রিকা পড়া এবং পড়ানো নিজের জন্মগত অধিকার বলে জানত তার জীবন্ত আদর্শপ্রীতি হঠাৎ আততায়ীর ছুরিতে স্তব্ধ হয়ে যাবে। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর ক্ষমতাসীনের বিষাক্ত ছোবল তখনও এসে পড়বে; আইনশৃঙ্খলার রক্ষককুল লড়াকু শ্রমিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিবারই পুঁজিপতি মালিকের খেয়াল চরিতার্থ

করবে। দাম বেড়ে চলবে। মুনাফাবাজদের শ্রীবৃদ্ধি হবে, কিন্তু আপনি প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুললেই আপনার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত পঁচিশ বছর ধরে পিকাসো যে শান্ত ধীবরপ্রধান গ্রামটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার থেকে এটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। প্রকাশ্যে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের প্রসঙ্গে ফিরে আসার আর বেশি সুযোগ তিনি পাননি। ধনী মার্কিন বিধবারা তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন, সারা দুনিয়া থেকে ভাস্কর্যের লোভনীয় ফরমাশ আসত। কিন্তু গ্যের্নিকার উত্তরাধিকার যা, ঠিক তাই-ই রয়ে গেছে। তাকে কখনো অস্বীকার করা যাবে না! মনের মধ্যে শান্তি-পারাবতদের ওড়াউড়ির শেষ নেই, যদিও আজ তারা আশ্রয় নিয়েছে অবচেতনার স্তরে। কলকাতার যে ছাত্রটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা বর্জন করে দেশের 'আইনশৃঙ্খলা'র স্বার্থে জেলের গরাদের আড়ালে হারিয়ে যায় অজান্তে হলেও তার সঙ্গে সে নিয়ে যায় একটুকরো পিকাসো। গ্যের্নিকার আগুন জ্বলছে, জ্বলবে। আমরা সবাই গ্যের্নিকার সন্তান।

২৫

ভুল নিশানার তীরন্দাজ

কেউ শুধু আছড়ায়, অসহায় ক্ষোভে, দিনের অবসানের বিরুদ্ধে। বুদ্ধদেব বসু হাতের কাজ শেষ করে যেতে পারলেন না। গত কয়েক বছর ধরে তিনি টাকার জন্যে হন্যে হয়ে চেষ্টা করছিলেন, কিছু বাড়তি টাকা, যা তাঁর ঘর-গেরস্থালি সামলাবে, যখন তিনি কায়মনে আবার নিবিষ্ট হবেন মহাভারত সম্বন্ধে তাঁর বিপুল ও চমৎকার কাজটিতে। মহাভারতের এই টীকা আর ভাষ্য হবে তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরাকাষ্ঠা। বাংলা সাহিত্যের এককালের 'দুরন্ত শিশু', 'আঁফাঁ তেরিবল' প্রবিষ্ট হয়েছেন প্রশান্তির মণ্ডলে; অতীতের সেই ঝোড়ো পাখিকে আর চেনাই যাচ্ছিল না। মহাভারতের ওপর এ-সব টুকরোয় কবিতায় আর দর্শনে মাখামাখি; তাদের মসৃণ ছিমছাম ধারালো গদ্যের আছে এক ঋজু গম্ভীর সৌন্দর্য; তাদের প্রেক্ষাপট এক প্রকাণ্ড কল্পনাশক্তিরই সাক্ষী।

কিন্তু এই তো পরিণাম। প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে, মানুষটি থেকেছেন আদ্যোপান্ত সাহিত্যিক। সাহিত্য ছিল, তাঁর কাছে, তীব্র প্রণয়ের চেয়েও বেশি কিছু: ছিল আস্থা, আশ্বাস, তাঁর একমাত্র আনুগত্য। তবু সে ব্যর্থ হল তার জন্য মোটামুটি সচ্ছল কোনো জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে দেড়শোরও বেশি বই লেখা সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথকে যদি বাদ দেন, বাংলা সাহিত্যে আর-কেউ পুরো বর্ণালিকে এমনভাবে ছুঁতে পারেননি; আপনি কবিতা থেকে শুরু করুন, আর তালিকা করে যেতে থাকুন, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, নাটক, ভ্রমণবৃত্তান্ত, লঘু নিবন্ধ, ছোটোদের গল্প, ছোটোদের ছড়া-কবিতা, আর অনুবাদ—সম্পাদক হিসেবে তাঁর বিপুল অবদানের কথা যদি নাও বলেন। তবু, চিরকাল,

ছিল অর্থের প্রচণ্ড অভাব; এত হ্রস্বীভূত বাংলাদেশ, একাধিক অর্থে হ্রস্বীভূত। দেশভাগের ফলে বাংলা সাহিত্যের বাজার অত্যন্ত ছোটো হয়ে গিয়েছে।

আরো একটি মৌলিক উৎপাদক কাজ করে যাচ্ছিল। বুদ্ধদেব বসু খুঁতখুঁতে লেখক। কেবল যে কোথায় কোন্ শব্দ ব্যবহার করবেন, তাই নিয়েই তাঁর খুঁতখুঁত তা নয়, বইগুলো কেমনভাবে ছাপা হবে, সাজানো হবে, কোন্ প্রকাশকের আনুকূল্যে প্রকাশিত হবে, সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু ইতর ফিরিওলারা সাহিত্যকে যে-আবহাওয়ায় দখল করে বসে, সেখানে গুণের কদর রুচির আদর কিছুই নেই। বিনিয়োগ পুঁজির শনির দৃষ্টি যে-দিকেই পড়ে, সেদিকটাই তার কব্জায় চলে আসে। সাহিত্যের ব্যবসাও সে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। আপনি যদি এই ঐ খবরকাগজের প্রতিষ্ঠানের মোসাহেব হিসেবে কাজ করতে রাজী না-থাকেন, তাহলে আপনার জীবিকা বিপন্ন হবে। সাহিত্যিক সাফল্য এখন একটি ফলাও প্রচার ও বিজ্ঞাপনের অবদান। আপনার বই শুধু তখনই বিকোবে, যখন কোনো-একটি প্রধান খবরকাগজ প্রতিষ্ঠান আপনার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করতে তৈরি থাকবে—তার আগে নয়। সে যদি কৃপা করে আপনার পিঠ চাপড়ায়, তাহলে সারা পথ জুড়ে শুধু পুষ্পস্তবক —তাও গোলাপের; আপনার বইয়ের বিক্রি বাড়তে থাকবে, খবরকাগজগুলো আপনার স্তুতি করেও শেষ করতে পারবে না।

তাঁর নিষ্পাপ বছরগুলোয়, বুদ্ধদেব বসু ছিলেন জিহাদযোদ্ধা, যিনি রুচি বা মান বিষয়ে কোনো আপসরফা করতেন না; যারা খবরকাগজের নাগপাশে বাঁধা পড়ে যেত, এবং তাদের প্রকাশিত সন্দেহজনক কাগজে লিখত, তাদের নিয়ে তাঁর হাসিঠাট্টার বিরাম ছিল না। অথচ, যখন তাঁর মৃত্যু হল, চাকা পুরো ঘুরে গিয়েছিল। তাঁর প্রাত্যহিক অন্নের জন্য তাঁকে তাদেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছিল যাদের তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন—খবরকাগজের জগতের সেই অমার্জিত অরুচিকর লোকগুলোর সেই বিবেকহীন দল, যাদের কোনো সাহিত্যিক ন্যায়নীতির

বালাইই নেই। জিহাদকে চুপচাপ কবর দেয়া হল। বুদ্ধদেব বসুকে আপস করতেই হল, ব্যস ; এ ছিল—ওরা যাকে বলে একটি সুব্যবস্থা। তাদের সহ্য করতেন তিনি, মেনে নিতেন তাদের বদখেয়াল আর ইতরামো, তাদের সহ্য করতেন ; বদলে তারা নজর রাখত যাতে তিনি পুরোপুরি অনাহারে না-মরেন। কিন্তু ঐটুকুই। ব্যবস্থাটা যেভাবে অভ্যুদিত হয়, তাতে গলগ্রহদের এইভাবেই ছোটোখাটো দড়িতে বেঁধে ঘোরানো হয়। বুদ্ধদেব বসু অবহিত ছিলেন যে তিনি সময়ের বিরুদ্ধে ছুটছেন, তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। 'মহাভারতের কথা'র প্রথম খণ্ড তৈরি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য তিনি আয়োজন করছেন, সংগ্রহ করছেন উপাদান—অনুষঙ্গ ও উল্লেখ, নজির ও টীকা—যে-বই, তাঁর সন্দেহ ছিল না, হবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান। এই লেখা শেষ করার জন্য তাঁর শুধু চাই দুটি বছর—অবাধ, নির্বিবাদ। তাই তাঁকে সেই দুছবরের জন্য যথোচিত আর্থিক সংগতির ব্যবস্থা করতে হবে ; তাদের মহিমা আর তুচ্ছতা, বিশালতা আর নীচতা নিয়ে যখন মহাভারতের কুশীলবরা ভিড় করে দাঁড়াবে, যখন এক-এক করে তাদের বিশ্লেষ করা হবে, নেকড়ে-গুলোকে তো ততক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

কেউ জিগেস করতে পারে, মোটেই তাচ্ছিল্য না-করার মতো দেড়শোর ওপর বইয়ের যিনি রচয়িতা, যে মানুষটির অঙ্গীকার আর সততা প্রশ্নাতীত, তিনি কেন তাঁর জীবনের প্রদোষে টাকাকড়ি নিয়ে এত ভাববেন ? কিন্তু ভাবতে হয়েছিল। সরকারের টনকও নড়েনি। খবর-কাগজের সাম্রাজ্যের যারা অধীশ্বর, বর্তমানে যারা সাহিত্যিক বিচার-বিবেচনার একচ্ছত্র অধিপতি, তারা তাঁকে দিত ততটুকুই টাকা, যাকে বলা যায় নিছক রুটির সংস্থান। সেইজন্যই মানুষটিকে, তাঁর জীবনের শেষ দিন অব্দি, ঘানি টেনে-টেনে সেই জিনিস বার করে দিতে হত যাকে তিনি নিজেই বলতেন হাঁড়ি-চড়ানে বই, এমন-কি সস্তা, অশ্লীল, কুরুচিকর সব সিনেমার কাগজের, জন্য লিখতে হত তাঁকে, আর তা শুধু এই আশাতেই যে হয়তো কিছু টাকা জমিয়ে রাখা সম্ভব হবে, 'মহাভারতের কথা'র

শেষ খণ্ড লিখবার সময় যে-টাকায় তাঁর জীবনধারণ চলবে। বেস্‌বলে যাকে বলে হোম স্ট্রেচ, সেটা আর তাঁর নাগালে এল না। সেই টাকা জোটাবার আগেই মানুষটি ধ্বসে পড়লেন, মারা গেলেন।

এটা, একদিক থেকে, চমৎকার বুঝিয়ে দেয় এই সময়ের বস্তুঘনিষ্ঠ বাস্তবতা। বিভিন্ন বর্ণের অশিক্ষিত সব রাজনীতিবাজ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা একেকজন টাকার কুমির হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু দশবছরের হাড়ভাঙা খাটুনিতে যে-টাকা উপার্জন করতেন, কুললে একমাসের বেআইনি লেনদেন মারফৎ তারা তত টাকা উপায় করে। সাংবাদিকরা, যারা একটা বাক্যেরও অন্বয় শুদ্ধ লিখতে পারে না, প্রতিষ্ঠানের এই দিকটাতেই বিরাজ করে; ভোগবিলাসের জীবনে তাদের কোনো উপকরণেরই অভাব হয় না। অপরাধ জগতের যত হীন চরিত্র, যাদের সৃজনশীল প্রতিভার একমাত্র প্রকাশ ছুরি চালানোয় বন্দুক চালানোয়, নির্বিকারভাবে ফস-ফস করে ছড়ায় একশো টাকার নোটের তাড়া; কী করে এ-টাকা তারা পায়, জিগেস করবেন না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এমন নগণ্য-কিছু টাকাও বাঁচাতে পারেন না, যা, তিনি যখন 'মহাভারতের কথা' লিখবেন, তাঁর ভরণপোষণের দায় মেটাবে।

পরিহাসের বিষয় এটা, নির্মম কোনো পরিহাস। বুদ্ধদেব বসু এটা টের পাননি, আর তাই তাঁর ধাবমান নিয়তির সঙ্গেও যুঝতে পারেননি। গত তিন দশক বা তার কাছাকাছি সময় জুড়ে তিনি ছিলেন 'সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা'র পক্ষে এক বিরাট প্রবক্তা। মানুষটি ছিলেন মুহূর্তের দাস, সহজে জ্বলে ওঠেন তেলেবেগুনে, পেশাদার কমিউনিস্ট-খেপানো লোকগুলোর ফাঁদে সহজেই তিনি পা দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি যে তথাকথিত বৈষম্য নিক্ষেপ করা হয়, তা তাঁকে রুষ্ট করে তুলত। তিনি রেগে টং হয়ে যেতেন, লিখতেন ঘৃণায়ভরা সব নিবন্ধ, ব্যারিকেডের ওপাশে যে-সব বন্ধু ছিল, এককথায় তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতেন। কোনো বোরিস পাস্তেরনাক বা আলেক্সান্দর সল্‌ঝেনিৎসিনের বাধাবিপত্তি তাঁকে দিনের পর দিন উত্তেজিত করে রাখত। এই এক অদ্ভুত চোখের

অসুখ ছিল তাঁর, নিকটদৃষ্টির সাতিশয় অভাব, অনেক কাছের অবস্থা-ব্যবস্থাগুলোর বৃহত্তর তাৎপর্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত। যে সমাজটায় তিনি আছেন বাস করছেন, কাজ করছেন, তার সুযোগ-সুবিধাগুলো যে-কেলেঙ্কারি রকম বৈষম্যের সঙ্গে বিতরিত, এমন-কি শিল্পী-সাহিতিকদের বেলাতেও যে তাই, তা তাঁর চোখে পড়ত না। অথচ, তাঁকে নিজেকেই, খবরকাগজের সাম্রাজ্যের সব ফালতুদের সঙ্গে, একাদশ শ্রেণীর সব সাংবাদিকদের সঙ্গে, সসম্ভ্রমে কথা বলতে হত, কেননা এরাই সব সঙ্গতি নিয়ন্ত্রণ করে, এরাই তাঁর জন্য আরো-কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। যখন তিনি স্বাধীনতার নির্বস্তুক ধারণা নিয়ে দারুণ উত্তেজিত, তখনও তিনি সবচেয়ে জরুরি সূত্রটিকে দেখতে পাননি ঃ স্বাধীনতা কোনো স্বতন্ত্র চল নয়, সে হল সম্পদবণ্টনের একটি অনুষ্ঠান। কোনো ব্যক্তি, সে কবি বা ঔপন্যাসিক যা-ই হোক-না কেন, সে যদি নিজের বা নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করতে না-পারে, তবে সে স্বাধীন নয়, যা লিখতে চায় তা লিখবার কোনো স্বাধীনতা তার নেই। তার সময়ের একটা বড়ো অংশই চলে যায় হাঁড়িচড়ানে বই লিখতে বা বিনিয়োগ পুঁজির দালালদের মনোরঞ্জন করতে—আর তার বৃহৎ উচ্চাভিলাষগুলো কেবলই স্থগিত ও প্রলম্বিত হতে থাকে। তা-ই হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর, অন্য লেখকদের বেলাতেও তা-ই ঘটবে ; কারণ, যে-তকমা দিয়েই আপনি আপনার পরিপার্শ্বিককে বোঝাতে চান-না কেন, সে যদি আপনার অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটাতে না পারে, তবে আপনার দ্বারা কোনো স্বাধীন রচনাই হবে না।

রবীন্দ্রনাথের পরে, বাংলাদেশে সম্ভবত এত বড়ো প্রতিভা আর কেউ জন্মায়নি। অন্যরা, যেমন জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন শ্রেষ্ঠতর গভীরতর কবিতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মহত্তর ঔপন্যাসিক, যিনি সম্ভবত বাংলাভাষার সেরা উপন্যাসটি লিখে গেছেন। অন্য আরো-কেউ হয়তো এমন প্রবন্ধ লিখেছেন, যা বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যময়তায় বুদ্ধদেব বসুর বেশির ভাগ প্রয়াসকেই ছাড়িয়ে যায়। আরো কেউ-কেউ আছেন, সাহিত্য সমালোচনায় যাঁদের রচনা বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে অনেক বেশি

তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। আর, নিশ্চয়ই, এ-তল্লাটে, অধিকতর যোগ্য নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যাবে। অথচ সব মিলিয়ে আপনি যদি ভাবেন, আর সেইসঙ্গে যদি সম্পাদক ও সাহিত্যিক আন্দোলনের অনুঘটক হিসেবে তাঁর চমকপ্রদ ভূমিকার কথা আপনার মনে থাকে—তবে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অটল, তুলনারহিত। অথচ তবু, আমরা সবাই যে-ব্যবস্থার কয়েদী, সেই ব্যবস্থায় তাঁকে ভদ্রগোছের কোনো সামান্যতম রুজিও দেয়া হয়নি। এই সমস্যার সমাধান যে একটাই, লেখকদেরও গিয়ে ব্যারিকেডে যোগ দিতে হবে, এ-কথায় তিনি সায় দিতেন না। মানুষ স্বাধীন জীব, লেখকও স্বাধীন, নির্বাচনের স্বাধীনতা তার আছে। বুদ্ধদেব বসু নির্বাচন করেছিলেন। যারা সমাজবিপ্লবের সপক্ষে, বুদ্ধদেব বসু তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলোয় তিনি তাদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিলেন, প্রবল, তীব্র।

তাঁর মৃত্যুর ধরন প্রমাণ করে দিল, যদি এখনও কারু কোনো প্রমাণ লাগে, যে তিনি ভুল লক্ষ্য, ভুল নিশানা, ভুল চাঁদমারি বেছে নিয়েছিলেন। এখন যখন তিনি নিরাপদেই মৃত, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ব্যবসায় যারা একচেটিয়াভাবে কায়েম হয়ে বসেছে সেই পুঁজিবাদী প্রকাশকদের মুনাফার বিষয় হয়ে উঠেছে—এই মৃত্যু থেকেও তারা সুবিধে নিংড়ে নিতে চাইছে। এ একেবারেই অসহ্য, সাংঘাতিক, মারাত্মক, কেননা বুদ্ধদেব বসুকে খুন করেছে এরাই। তাদের মনোবিকার আর অহংমন্যতা সাহিত্যিক মানসকে ঠেলে নামিয়েছে নোংরা, কুৎসিত, নিম্নতম বিন্দুতে। এতটাই তাদের প্রতাপ যে বুদ্ধদেব বসুর মতো লেখকদের সুনিশ্চিত কোনো বাজারের কোনো সুযোগই নেই—আর তাই বুদ্ধদেব বসুদের ব্যাকুল হতে হয় অন্নের জন্য। এরা খুনে, সব ক-টা, আর এরাই এখন—কী দুঃসহ স্পর্ধা—প্রধান বিলাপকারীদের ভূমিকা কুক্ষিগত করে নিয়েছে। যখন অন্যরা এখনও গর্জায় আছড়ায় দিনাবসানের বিরুদ্ধে।

২৬

দু-মুখো অর্থনীতি

দেশে বস্ত্রশিল্পের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির একটি গত কয়েক মাস ধরে খবরের কাগজে এক বিশেষ ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে। বিজ্ঞাপনটি মনোমুগ্ধকর না হোক, নজরে পড়ার মতো। যেমন-তেমন দেখতে, যেমন-তেমন পোশাকপরা এক দম্পতি কেমন করে কালক্রমে বদলে গেল, আর কত বদলে গেল—কয়েকটি ছবির মাধ্যমে এটাই সেখানে দেখানো হয়েছে। তাদের সাজসজ্জায় বিপ্লব ঘটেছে : আঠারো বা উনিশ শতকের উদ্ভট, অনড়, ঢিলেঢালা রীতিনীতির খোলস ছেড়ে আকস্মিক উগ্রতায় তারা ঝাঁপ দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের উন্মত্ত আধুনিকতার মধ্যে। তারা আপাদমস্তক সুমার্জিত, আধুনিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ তাদের সর্বাঙ্গে। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে আজকাল এই দম্পতির ; আর তাদের সঙ্গে ঐ বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠানটিরও ভোল পালটে গেছে : বিজ্ঞাপনটি এই বার্তাই একটানা সুরে আমাদের দিয়ে চলেছে। ভাবখানা এই যে পথদেখানোর কাজ যদি এই প্রতিষ্ঠানটি না-করত, তাহলে এই দম্পতি আজকের ধাঁধা-লাগানো দুনিয়ায় হারিয়ে যেত, এমন এক দুনিয়া যেখানে জীবন উঁচুগ্রামে বাঁধা, ব্যবহার্য বস্তুমাত্রই বিলাস-সামগ্রী, যেখানে সবাই সুখী আর সারাক্ষণ বাজছে পপ্ সংগীত, যেখানে শৌখিন বেশবাসে সৃষ্টি হয় ইন্দ্রজাল-মায়া, যেখানে দারিদ্র্য, নোংরামি, অপুষ্টি, ব্যাধি এ-সমস্ত কথাই কেউ কখনও শোনেনি।

দোষটা এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নয়। এই প্রতিযোগিতার বাজারে মুনাফা লোটা আর বিক্রি বাড়ানো আবশ্যিক কাজ। পণ্যদ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা করাই শুধু নয়, বিজ্ঞাপনে বাজার

ছেয়ে ফেলার প্রস্তুতিও দরকার। বিলাস সামগ্রীর বাজারকে স্বীকৃত সত্য হিসেবে নিয়ে, সেখানে নিজের জায়গা বাড়িয়ে নিতে হবে। আর তারপর এরও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, যারা এখনও ভোগের ফাঁদে পা দেয়নি, তাদের মধ্যেও আরও বেশি-বেশি বিলাসসামগ্রী কেনার লোভ জাগিয়ে তুলতে হবে। যে যাই বলুক, এই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার সিন্‌থেটিক সুতো তৈরির উদ্যোগ নিতে অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করার জন্য বিদেশী মুদ্রার বরাদ্দ নির্দেশ করা হয়ে গেছে, কিছু পরিমাণে কাঁচামালের জোগান যাতে অব্যাহত থাকে, তারও ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানকে সরকার থেকে কখনও অন্যমনস্কতার বশে, কখনও বা চোরাপথে, ব্যবসা বাড়ানোর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; এর ফলে অনেক জায়গাতেই প্রাথমিক লাইসেন্সে এদের যে-পরিধি ছু'কে দেওয়া হয়েছিল, এদের আসল সাম্রাজ্য আজ তার দু-তিনগুণ বেশি। তলায়-তলায় এই যে তাদের বৃদ্ধি ঘটেছে, সেটাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা, আজকের বিতর্ক প্রায়ই সেই তামাদি প্রশ্নের ওপর। কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা, বিলাসসামগ্রীগুলি সদর দরজা দিয়ে বিক্রি করা হবে, না পেছনের দরজা দিয়ে, তাতে কি কিছু আসে যায়? কাগজে-কলমে সরকারি নীতি যা-ই হোক-না কেন, গত কুড়ি বছর ধরে বিভিন্ন সরকারি কার্যকলাপের মোট ফল হয়েছে বিলাসসামগ্রী উৎপাদনের দ্রুত প্রসার। এই দ্রুতবর্ধমান জগৎকে পুষ্টি জোগানোর জন্য যন্ত্রপাতি ও উপাদান আমদানি করতে দেওয়া হয়েছে, বিদেশী মুদ্রার প্রাচুর্যের ওজুহাত দেখিয়ে। যেখানে আমদানি করাটা নেহাৎই দৃষ্টিকটু দেখায়, সেখানে দেশজ বিকল্পের জন্য ঘরের অমূল্য সম্পদ খরচ করা হয়েছে। আজ যদি সেইসব দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এই বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি হাজার-হাজার টাকা ব্যয় করে বিজ্ঞাপন দেয়, তবু এ-রকম বিধিবহির্ভূত কাজের নিন্দা করার মুখ সরকারের নেই। এমন-কি এই প্রতিষ্ঠানগুলি যখন তাদের অব্যবহৃত ক্ষমতা পুরো কাজে লাগানোর জন্য বাড়তি বিদেশী মুদ্রা দাবি করে, তখন সে-দাবি নির্দ্বিধায় নাকচ করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না।

নিকিতা ক্রুশ্চেভের নীতিগল্পের ইঁদুরের মতো বিলাসদ্রব্যের বিপণনের ব্যাপারটা সরকারের গলায় আটকে গেছে, গেলাও যাচ্ছে না, ফেলাও যাচ্ছে না।

এইজন্যই, ভোগ্যপণ্যের নিয়ন্ত্রণ এবং আড়ম্বর ও আতিশয্য ত্যাগ করার বিষয়ে সরকারি বিবৃতিগুলিকে চরম কপটতার লক্ষণ বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষ যা-যা করে সেই সবকিছু করেও যে লোক তার থেকে কোনো সুখ পেতে অস্বীকার করে, তাকে বলা হয় পিউরিটান; তেমনি সাধারণ মানুষের মতো সবকিছু করেও যে ভাব দেখায় যেন সবই অনিচ্ছায় করেছে, তাকে বলা হয় ভণ্ড। নেতারা সব সময়েই ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহার সীমিত রাখার জরুরি দরকার নিয়ে বাক্যব্যয় করেন; কিন্তু সদুপদেশগুলি নিজের ক্ষেত্রে কখনোই প্রয়োগ করা হয় না। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির খাতিরে এবং অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করার জন্য সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া যে কত দরকার, সেটা সারাক্ষণই কানের কাছে ঢাক পিটিয়ে বলা হচ্ছে। তবু রক্তের বন্ধন সবকিছুর চাইতে জোরালো, এবং আত্মার যে ত্যাগের ক্ষমতা আছে, দেহের তা নেই। চারদিকে যদি কৃচ্ছ্রসাধন চলে তো চলুক, তবু আপনার সন্তানসন্ততি, আপনার আত্মীয়বন্ধুদের জন্য কিছু সাজসজ্জা চাই, কিছু উঁচুদরের সংগীত চাই, কিছু অত্যুৎকৃষ্ট খাবার চাই। কৃচ্ছ্রসাধন করুক পাশের বাড়ির লোক। এখানে অস্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হবে, ব্যয়স্ফীতি আটকাতে হবে, অপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিতে হবে, শাদাসিধে জীবনের মহিমা আবার প্রচার করা দরকার। এইসব উপদেশ দেবার পর নেতারা পাঁচতারা হোটেলের বন্দীশালায় অদৃশ্য হন। এমন-কি কখনো-কখনো তাঁরা নিজেদের এটাও বুঝিয়ে ফেলেন, যে এই বিলাসিতায় ডুবে থাকা ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, এটা জাতির স্বার্থেই। গরিব দেশ হলে কী হয়, ভারতবর্ষের মানসম্মান তো খাটো করার জিনিস নয়, মন্ত্রীদের জীবনযাত্রা যদি কেতামাফিক না-হয়, তাদের বাংলোতে যদি যথাযোগ্য সাজসরঞ্জামের অভাব হয়, ভোজসভাগুলিতে যদি যথেষ্ট জেল্লা না-থাকে, তাহলে সেই

মানসম্মানই ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। ওপরতলার বাছাই-করা কয়েকজনের ক্ষেত্রে যদি ষড়ৈশ্বর্যের তালিকা ঠিকঠাক না-থাকে, তাহলে বুঝি বিদেশীদের কাছে আমাদের মাথা নীচু হয়ে যাবে; এই দুরন্ত প্রতি-যোগিতার জগতে, যেখানে পারস্পরিক তুলনা করাই প্রধান' কাজ, সেখানে টিঁকে থাকার জন্যই কয়েকটি প্রাচুর্যের এলাকা তৈরি করে রাখা বুঝি দরকার।

কিন্তু এই দুর্বল ওজুহাতে ফাঁকি ঢাকা পড়ে না। দিনের বেলায় যে-মন্ত্রী মদ্যপানবিরোধী কথা বলছেন, তাঁকেই সন্ধ্যায় বোতল-বোতল হুইস্কি ফাঁক করতে দেখা যাবে, যিনি খাদি ছাড়া আর কিছু না-পরার শপথ নিয়েছেন, অবসর সময়ে তাঁরই পরিধানে সব চাইতে জেল্লাদার সিল্ক এবং সিন্‌থেটিকের শোভা। শপথে এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারে কোনো সম্পর্ক নেই। জনসাধারণের জন্য কতগুলি বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু নগদ জিনিস ওপরতলার লোকদের জন্যই সংরক্ষিত। উপদেশ ও উদাহরণের মধ্যে অনন্ত অমিল।

নীতিগত বা নান্দনিক প্রশ্ন এটা নয়। এই দু-মুখো অর্থনীতি চলতে পারে না আরো অনেক পার্থিব একটা কারণে; এটা চলতে পারে না, কারণ এটা অর্থনৈতিক নিয়মগুলোর সম্পূর্ণ বিরোধী। আইন প্রণেতারাই যেখানে নিজেদের জন্য জীবন-যাত্রার একটা অত্যুচ্চ মান তৈরি করে নিয়েছে, এবং বিপণিই যখন দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, তখন উপরতলার মানুষদের বহুবিধ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চাহিদা মেটানোর জন্য অজস্র বিলাসসামগ্রীর উৎপাদন না-হয়ে পারে না। এই শিল্পগুলি লগ্নীকৃত মূলধনের একটা অন্যায় রকমের বিরাট অংশ গ্রাস করে নেয় বলেই, যে ভোগ্যপণ্যগুলি আরো মৌলিক চাহিদা মেটায় সেগুলির উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য দরকার হয় আরো মূলধন; কিন্তু সে-মূলধন কখনোই উঠে আসবে না, যদি না ভোগ্যপণ্যের মোট ব্যবহার সীমিত রাখা হয়, এবং এইভাবে সঞ্চয়ের হার বাড়ানো যায়। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনের ভার যদি আমরা প্রত্যেকে সর্বদাই আমাদের প্রতিবেশীর ওপর দিয়ে রাখি, তাহলে সঞ্চয় বাড়তে পারে না। জনসাধারণের গড্ডলিকাপ্রবাহ

নেতাদেরই অনুগমন করে, মিতব্যয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করে তারা নেতাদের বাস্তব উদাহরণই মেনে নেয়, তীর্থযাত্রা চলে ভোগের উচ্চতর শিখরের দিকে। এটাও অবশ্য বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই অপবাদ মাত্র, যারা কোনোগতিকে টিঁকে থাকার কিনারায় টলমল করছে, তাদের ভোগ্য-পণ্যের ব্যবহার ঈষৎ বাড়লেও জাতীয় সঞ্চয়ের মাত্রার তাতে বেশিকম হয় না। তাছাড়া পরিসংখ্যানগত গবেষণা বিশ্বাস করতে হলে, ইদানীং তাদের ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের মাত্রা বরং কমে গেছে। কিন্তু এটা সত্য নয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটা বেশ বড়ো স্তরের পক্ষে, যাদের প্রকৃত আয় গত কুড়ি বছরে বেড়েছে এবং যারা অন্য সময়ে সঞ্চয়ে নারাজ হত না। কিন্তু তারা জানে পন্থা কী। কাজেই তারা নেতাদের কথায় কান না-দিয়ে তাদের কাজের অনুকরণ করে।

আগামী সপ্তাহে কলকাতায় চারদিনব্যাপী কংগ্রেস সম্মেলন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নাকি প্রায় ছয় লক্ষ টাকা খরচ করে একটা দারুণ বাসস্থান তৈরি হয়েছে। খবরের কাগজে ঐ বাড়ির চার হাজার স্কোয়ার ফুটব্যাপী অন্তঃপুরের বিলাসিতার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভণ্ডামির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ঐ চার হাজার স্কোয়ার ফুটব্যাপী জাঁকজমকের আচ্ছাদন হবে গ্রামবাংলার রীতিতে খোড়ো চাল। ভিত্তিতে নিরেট বিলাসিতা; মাথায় মূক দারিদ্র্যের যন্ত্রণার ধ্বজা। এ-দেশের বাস্তব কিন্তু অন্যরকম—তলার দিকে কুড়িভাগের উনিশভাগ অবিমিশ্র দারিদ্র্য, আর চূড়ার ওপরটুকুতে চূড়ান্ত সম্পদের দ্যুতি। প্লেটো বর্ণিত গণতন্ত্রও এইরকমই ছিল।

২৭

স্বপ্ন যদি সত্যি হত

যদিও একটা হতাশার হাওয়া বইছে, স্বপ্ন দেখায় তবুও মানুষের জন্মগত অধিকার, এমন-কি এই দুর্ভাগা দেশের যে-কোনো নাগরিকও তা দাবি করতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা এর চাইতে বেশি আর খারাপ হতে পারত না, মুদ্রাস্ফীতির অবাধ আধিপত্য চলেছে, মানুষের দুরবস্থা প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যাচ্ছে, রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যগুলি কোনো চোরাবালির গভীরে হারিয়ে যাওয়ার মুখে। তবু স্বপ্ন দেখার লোক থেকেই যায়, আর তারা স্বপ্নও দেখে। তাদের মনে এই আশা থাকে, যে মোড় ঘুরলেই একটা নতুন দৃশ্য উন্মোচিত হবে। তারা স্বপ্ন দেখে যায়, যে এই শনিবারের বিশেষ অপ্রীতিকর ঘটনা অতীতে মিশে গেলে, আগামী ঘটনাগুলি হবে সুস্থতা ও সমতার পরিচায়ক, মহৎ সারল্যে মণ্ডিত। কল্পনা করে, সরকারি ও আধা-সরকারি দুর্নীতির দিন শেষ হবে, সবাই সাধুসন্ত বনে যাবে। ভেবে বার করা যায়, এ-ধরনের স্বপ্নের মধ্যে কোন্‌টা হবে আদর্শস্থানীয়, তালিকায় যার নাম থাকবে সবচেয়ে আগে, অন্য যে-কোনো স্বপ্নের চমক-লাগানো সাহসিকতা যার কাছে সম্পূর্ণ ম্লান হয়ে যাবে।

একটি লোক আছে, যার সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নটি এ-রকম : শনিবার রাত্রি শেষ হয়ে রবিবার সকাল এল, বিছানা থেকে ধীরে-সুস্থে উঠে দরজার পাশ থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়েই সে দেখে একটা চমৎকার খবর। প্রধানমন্ত্রীর সচিবদপ্তর থেকে একটা ঘোষণা বেরিয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছেন, যে দেশের দুরবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে, আর সেটা বাড়িয়ে লাভ নেই, এবারে

একটা মোড় ঘোরা দরকার। প্রধানমন্ত্রী ঐ ঘোষণায় জানাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে যথাযথ আলোচনা না-করে নিজস্ব উদ্যোগে শিল্পোন্নতি সংক্রান্ত দপ্তর যে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা তিনি প্রত্যাহার করছেন। ঐ বিবৃতিতে আরো জানা যাচ্ছে, মারুতি প্রাইভেট লিমিটেডকে শিল্পসংক্রান্ত ছাড়পত্র দিয়ে ঐ দপ্তর যে-স্পর্ধা দেখিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তাতে হতভম্ব। এ-বিষয়ে যখন প্রারম্ভিক পত্রালাপ হয়, তখনই তাঁর যথেষ্ট দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। যোজনা কমিশন তো বহু আগেই স্থির করেছিল, যে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে কোনো ছোটো গাড়ি তৈরির পরিকল্পনা অগ্রগণ্যতার হিসেবে জাতীয় চাহিদার অনুকূল হবে না। বর্তমান সময়ে ছোটো যাত্রীবাহী গাড়ি উৎপাদন করার ক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজনীয় তো নয়ই, কাম্যও নয়। যদিও দাবি করা হয়েছিল, যে মারুতি গাড়ি বানানোর খরচ, অন্যান্য যে-সব গাড়ি এখন বাজারে চলছে তার তুলনায় কম পড়বে, তবু তার চাহিদা তো সীমাবদ্ধ থাকবে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই! বস্তুত প্রধানমন্ত্রী অনুভব করেছেন যে তথাকথিত ছোটো গাড়ি নির্মাণ প্রকল্প বিষয়ে যোজনা কমিশন যখন আলোচনায় বসেছিল, তারপরেও দেশের অবস্থা আরো অনেক খারাপ হয়েছে। জাতি আজ যে ঘোর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বড়ো বা ছোটো কোনোরকম যাত্রীবাহী গাড়ি তৈরি করার জন্যই আমাদের দুর্লভ জাতীয় সংগতির একটি অংশ অপচয় করার কোনো কারণ নেই। যে-তিনটি গাড়ির একখানা এখন আছে সেগুলোর পেছনেই মূর্খের মতো অজস্র জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার করা হয়ে থাকে, এই মূর্খামির আওতা যেন আর বাড়ানো না-হয়। মারুতি একটি বেসরকারি উদ্যোগ এবং সরকারি সম্পদে এর দরুন টান পড়বে না বলে যে যুক্তি দেখানো হয়, বিবৃতিতে তাকে বিভ্রান্তিকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ জাতির ব্যবহার্য যে মোট সম্পদ আছে, এই কম্পানি তো তাকেই ক্ষয় করে বেঁচে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন, যে এটা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যায় না। আর দেশজ মালমশলায়

বিদেশী সাহায্য ছাড়া মারুতি গাড়ি তৈরি হবে বলে দ্বিতীয় যে যুক্তি দেখানো হয়, সেটাও সমান ভুল। পরোক্ষ আমদানির খরচটা সব-দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে—এবং সেটা খুবই গুরুতর হতে বাধ্য। বিদেশী মুদ্রার যে-দুর্ভিক্ষ চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মারুতি-প্রস্তাব বিলাসিতা মাত্র, কাজেই এটাকে নাকচ না-করে কোনো উপায় নেই। বিবৃতিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পরিবহণের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া উচিত কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর। সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে অবশ্যই ট্রাক বানানোর দিকে। তাছাড়া জাতীয় সম্পদের যে-অংশটুকু ডবলডেকার-জাতীয় গণপরিবহণের উপযুক্ত যান নির্মাণে ব্যয় করার সীমিত এক্তিয়ার আছে, তার বিলিব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মারুতি নির্মাণের অনুমতি দেওয়াই হবে জাতীয় সম্পদের অপচয় এবং সে কারণেই আইনত অপরাধ।

কিন্তু মারুতি প্রাইভেট লিমিটেডের পেছনে যারা আছে, তারা পরীক্ষামূলক একটি কারখানা বসানোর জন্য ইতিমধ্যেই যা ব্যয় করেছে তার কী হবে? তাছাড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে ইতিমধ্যে মূলধনও তো সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। উদ্যোক্তারা এই প্রতিষ্ঠান শুরু করার জন্য শিল্পপতিদের কাছ থেকে বেসরকারিভাবে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা তুলেছে। তাছাড়া জনসাধারণের জন্য আর্থিক লেনদেনের যে সংস্থা আছে, যেমন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি, সেখান থেকেও টাকা ধার করেছে। জমি কেনা হয়ে গেছে; ইস্পাত ও অন্যান্য দামি মালমশলা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারছেন, মারুতিকে আর অগ্রসর হবার অনুমতি না-দিলে অনেক লোকের খুবই ক্লেশ হবে। কিন্তু বিবৃতিতে এই যুক্তি দেখানো হয়েছে, যে মারুতির জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের কিছুটা অপচয় ঘটেছে ঠিকই, তবু আরো বৃহত্তর অপচয়ের ওজুহাত হিসেবে সেটাকে নেওয়া যায় না।

এই পর্যায়ে ঘোষণাটিতে আরো একটি সাম্প্রতিক সরকারি সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে; নয়াদিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার তোড়জোড়

চলছিল, আর্থিক অসুবিধার জন্য সেটাও নাকচ করে দেওয়া হল। ইতি-মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি, বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে মণ্ডপ নির্মাণ এবং মেলার অন্যান্য বিবিধ আয়োজন বাবদ বহু কোটি টাকা খরচ করা হয়ে গেছে। তবু কর্তৃপক্ষ মনে করেছেন, এইসব প্রাথমিক ব্যয় সত্ত্বেও মেলাটাকে হতে দেওয়া খুবই অদূরদর্শিতার কাজ হবে। কাজেই এটা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সরকার স্বীকার করে নিলেন। মারুতির ক্ষেত্রেও তাই করা হবে। প্রস্তাব করা হচ্ছে, এ পর্যন্ত যা খরচ হয়েছে সেই মূল্যে কারখানাটি কিনে নিয়ে ট্রাক এবং জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী অন্যান্য যান জোড়া দেবার কাজে তা ব্যবহার করা হবে।

বিবৃতিটিতে খুব সাফ কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, যে সরকার জানেন, প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত জমি মারুতির জন্য দখল করা হয়েছিল। সরকারি ইস্পাত কারখানাগুলি বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছিল, মারুতি যাতে প্রয়োজনীয় ইস্পাত পেতে পারে, সিমেণ্ট ও অন্যান্য দুর্লভ মালমশলা, পালা আসবার আগেই মারুতির জন্য বন্দোবস্ত হয়ে যেত। স্বীকার করা হয়েছে, যে-শিল্পপতিরা মারুতির অধিকাংশ মূলধন সরবরাহ করেছিল, তাদের সহযোগিতার পুরস্কার হিসেবে তাদের আমদানির সুবিধা এবং অন্যান্য বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে; এই কেলেঙ্কারির তদন্ত হবে, কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধ কার, সব আলাদা-আলাদাভাবে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এও জানা গেছে যে, সম্ভাব্য বিক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম দর্শনীর নাম করে মারুতি প্রাইভেট লিমিটেড প্রায় দুই কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। কম্পানির বিষয়কর্ম সংক্রান্ত সরকারি দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে খোঁজ নিতে, এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করাটা আইনসংগত হয়েছিল কিনা।

বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি জানেন যে মারুতির সঙ্গে আরো বড়ো-বড়ো প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে যার সূত্রপাত, এ-রকম একটা পরিকল্পনা শুধু এটা নয়। এমন-কি নিকটতম বা নিকটতর স্বজন পোষণের চিক্কণ উদাহরণ হিসাবেও এর প্রকৃত গুরুত্ব নয়। এটা

ব্যাপারটার অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা দিক মাত্র। আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই, সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার যে উপদেশগুলি দেওয়া হয় সেগুলি কি কেবল ফাঁকা কথা? প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের দুরবস্থার কথা সকলেই বলে থাকেন। যে-কোনো সরকারি বিবৃতিতে কৃচ্ছ্রসাধন এবং জাতীয় সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করা হয়। যেটা ভোগ করা হয়, সেটা খরচ হয়ে যায়। যাত্রীবাহী ছোটো গাড়ির খাঁই বাড়া মানে ঠিক সেই আন্দাজে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির পথ থেকে সরে আসা। মারুতি কেবল অমূল্য সম্পদের ক্ষতিই করবে না, আরো অগ্রসর হতে দিলে বিলাসিতার বন্যা বইয়ে দেবে। মারুতিকে ছাড়পত্র দিলে একই ধরনের অন্যান্য পরিকল্পনাকে আটকে দেবার কোনো নৈতিক যুক্তি থাকবে না। বিবৃতি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী খুবই ভালো করে বোঝেন যে দেশের প্রতিটি লোকের সামনে তিনি যে-আত্মত্যাগের আহ্বান রেখেছেন, তাঁর কাজেও তার সমর্থন থাকা উচিত। মারুতিকে নিষিদ্ধকরণের এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তিনি দশের সামনে একটা নজির সৃষ্টি করার ভার নিচ্ছেন; যারা গাড়ির মডেলটি বানিয়েছিল তাদের ক্ষমতা, উদ্যম, উদ্ভাবনী শক্তির তিনি প্রশংসা করেন। যে-অর্থনীতি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে এরা অনেক উন্নতি করতে পারত; কিন্তু ঘটনাচক্রে তারা জন্মেছে ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে, সেখানে সব চাইতে দুঃস্থ মানুষদের অবস্থা যেভাবে একটু ভালো হয়, সেই-ভাবেই সম্পদ বাঁচিয়ে চলা উচিত। এবং সর্বস্তরে সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কাজেই এই লোকদের চরম আত্মত্যাগের জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছে; প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে এদের ছাড়পত্র বাতিল করে দিচ্ছেন। পরবর্তী যে-যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তারও কাজ শুরু হয়ে গেছে। তিনি আশা করেন এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যরাও এধরনের প্রচেষ্টা দেখাবে।

স্বপ্নটা এ-রকম। এটা যার প্রিয় স্বপ্ন, তার যে প্রকৃতিটাই বাঁকা বা সবকিছুরই সে যে খারাপ দিকটা দেখে তা নয়। সে পুরোনো ধরনের সততায় বিশ্বাসী। ঘটনা পরম্পরার নিহিতার্থ বোঝার মতো জ্ঞান ও মহত্ত্ব

প্রধানমন্ত্রীর আছে বলে সে মনে করে। সে জানে প্রধানমন্ত্রী যোজনা কমিশনের সভাপতি এবং কমিশনই ঠিক করে জাতীয় জীবনে কোন্ দিকগুলি অগ্রাধিকার পাবে। সরকারের প্রধান হিসেবেও বর্তমান সংকটের গুরুত্ব তিনি অন্য যে কারো চাইতে ভালো বোঝেন। তার ভরসা আছে, প্রধানমন্ত্রী তার স্বপ্নকে সত্য হতে সাহায্য করবেন। এইসব স্বপ্নের মধ্য দিয়েই তো একটি জাতি বেঁচে থাকে, সেগুলো ফললে তাই-ই হয়ে ওঠে গর্বের বিষয়। যে এই স্বপ্ন দেখে, তার দৃঢ় বিশ্বাস, যে তার স্বপ্ন ফললে দেশ জুড়ে যে-বিপুল আবেগের ঢেউ উঠবে, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের আলোড়নের চাইতে তা হবে সহস্রগুণে বেশি শক্তিশালী।

২৮

নয়া ব্রাহ্মণ

বলুন দেখি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কী লাভ হবে? দেশের অর্থনীতিবিদ্‌দের কি ইদানীং কেউ কোথাও দেখেছে? দেশের অবস্থা তো প্রতি সপ্তাহেই ক্রমশ আরো খারাপ হচ্ছে! সরকারি ও বেসরকারি হাতুড়েদের পোয়াবারো; অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের বিভাগগুলিকে তারা একের পর এক উচ্ছন্নে দিচ্ছে। দাম কেন বাড়ছে? সংগ্রহ কেন আশানুরূপ হচ্ছে না? আয়ের বৈষম্য কেন ক্রমেই গুরুতর হচ্ছে? সবকিছুরই এত হাস্যকর ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে যে শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। মানুষের বিশ্বাসপরায়ণতার অপব্যবহার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাহলেও, আপাতদৃষ্টিতে যেহেতু রাজনৈতিক বিকল্প বিশেষ কিছু নেই, সেই কারণে বাধ্য হয়েই মূর্খ এবং বদমাশদের সহ্য করতে হচ্ছে।

যা হোক, আমাদের প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেল: দেশের অর্থনীতি-বিদ্‌রা কোথায়? আশেপাশে কোথাও তাদের দেখা গেছে কি? ঠিক কী ধরনের কাজে ব্যস্ত আছে তারা? বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে তারা কী ভাবছে? উৎপাদনের প্রায় অচল অবস্থা, সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখায় সরকারি ব্যর্থতা, রাজস্ব আদায় এবং অর্থ-সরবরাহের ক্ষেত্রে অরাজক পরিস্থিতি, অপরিমিত মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল—এ-সব বিষয়ে তাদের কি কোনো বক্তব্য আছে? সমকালীন বাস্তবের কোনো মৌলিক সমস্যা নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোনো-একজন অর্থ-নীতিবিদ্‌কেও কি একটিও অর্থপূর্ণ বিবৃতি দিতে শোনা গেছে?

বস্তাপচা বুলির অবশ্যই কোনো ঘাটতি নেই, যথা: শোনা যাচ্ছে ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ব্যয়বৈষম্যের উপশম ঘটলে রপ্তানির মোট চাহিদাও

কমবে, অথবা পরোক্ষ রাজস্বের ধাক্কা যাতে দ্রব্যমূল্যের পরম (absolute) স্তরে গিয়ে না-লাগে সেইজন্য দরকার ঐকিক স্তরে উৎপাদন মূল্যের হ্রাস। ইত্যাকার স্বচ্ছ ছেলেমানুষির প্রদর্শনী বাদ দিলে অর্থনীতিবিদ্‌দের মনের হদিশ পাওয়াই ভার। তারা গেল কোথায়?

হয় তারা বিদেশে, নয়তো তারা পরিশোধিত কোনো অর্থনীতির জগতে উৎপাদন নামধেয় ক্রিয়ার প্রকৃতি, অর্থনৈতিক বিকাশের কালক্রম অথবা কালের পর্যায়ে জনগণের পছন্দের তারতম্য ইত্যাদি বিষয়ে নানা আজব ধারণার বশবর্তী হয়ে উন্নয়নের কোনো গুহ্য নক্‌শা বানাতে ব্যস্ত। সাধারণভাবে ভারসাম্যে বিশ্বাসী এক দুনিয়ায় বেঁচে থাকার খেসারৎ আমাদের দিতেই হবে। এই দুনিয়ায় আমাদের অর্থনীতিবিদ্‌রা সুখী পাশ্চাত্য দেশগুলির অর্থনীতিবিদ্‌দেরই কাজের হুবহু নকল করে থাকে। অর্থনীতি নামক বিজ্ঞানটি খেলনায় পরিণত, আর অন্যান্য দেশের মতোই আমাদের দেশের সদাশয় অর্থনীতিবিদ্‌রাও এমন সব মডেল নিয়ে খেলায় মত্ত, যা দূর কল্পনামাত্র এবং বাস্তবের সঙ্গে যার সাদৃশ্য মোটামুটিভাবে প্রমাণ করতে গেলেই সবচেয়ে বিচক্ষণ উকিলও হার মেনে যাবে। ইদানীংকার ইতিহাসের কোনো-এক পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের রাজনৈতিক দিকটা বাদ পড়ে গেছে। অর্থনৈতিক সূত্রগুলির উপস্থাপনায় গণিতের কঠোর শুদ্ধতা বিশ্লেষণগত শৃঙ্খলা এনে দিতে পারে; কিন্তু তার ফল হয়েছে এই যে যেটা আনুষঙ্গিক, সেটাই আসল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসফল গণিতবিদ্‌দের আর-কোনো চিন্তা নেই, অর্থনীতিবিদ্যাতে তারা তাদের যথার্থ বৃত্তি পেয়ে গেছে। গণিতের বিমূর্ত চিন্তাগুলির অবলম্বন হিসেবেই ক্রমশ অর্থনীতি ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থনৈতিক সূত্রগুলির প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডন অছিলামাত্র; বস্তুনিরপেক্ষ দক্ষতায় অন্ধ বিশ্বাসই সব। যে-কোনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজে বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার বদলে শিল্পী অথবা প্রযুক্তিবিদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় অন্তঃসারশূন্য দক্ষতার প্রদর্শন। এই অবক্ষয়ের অনুশীলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে এগিয়ে আছে। বছরে জনসাধারণের মাথাপিছু বেতনের হার যেখানে ৫০০০ ডলার, সেখানে অর্থনীতিবিদ্‌রা নানা অলস খেলায় ব্যাপৃত থাকার

অধিকার দাবি করতেই পারে। ঐ দেশে রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রতি উদ্বৃত্ত ডলারের দুই-তৃতীয়াংশ আসে চাকুরিজীবীদের আয় থেকে। চাকুরিতে অর্জিত আয়ের কোন্ অংশটা গাণিতিক আকাশকুসুমের শয্যায় শয়ান অবক্ষয়ী অর্থনীতিবিদ্‌দের বেতন, আর কোন্ অংশটাই বা নিষ্কর্মা ধনীদের যৌন চাহিদার জোগানদারিতে অর্জিত, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে গাণিতিক নক্‌শা এবং *playboy* পত্রিকার ছবি —এই দুইএর মধ্যে বিশেষ-কিছু তফাৎ নেই। দুটোই অমিতাচারের উদাহরণ—একটা ইন্দ্রিয়গত অমিতাচার, অন্যটা বুদ্ধিগত। কোনোটাই বাস্তব অর্থে সম্পদ বাড়ায় না, এমন-কি পরোক্ষভাবেও না। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়; ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট বিষয়-আশয় ঐ দেশের আছে। অবশ্যই সেই প্রাচুর্যের দেশেও নিচুতলার মানুষদের ধারণা হয়তো অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু *playboy* পত্রিকার যেমন তাতে কোনো মাথাব্যথা নেই, মডেলে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদ্‌দেরও তেমন।

ভারতবর্ষের মতো দুর্ভাগা দেশগুলিতে এই সমস্যা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা রূপ নেয়। এই দেশগুলির সম্পদের একটা বেমানান রকমের বড়ো অংশ খরচ হয় অর্থনীতিবিদ্‌দের লালনপালনে। তাদের তোয়াজে রাখায় এবং তাদের কম্পিউটার ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম জোগানোতে। আশা করা হয় যে এর বদলে তারা জাতিকে অর্থ নৈতিক উন্নতির অন্ধিসন্ধিগুলো শিখিয়ে দেবে। আদর্শ গতিশীলতার মানে আদর্শ গতিশীলতা; আমাদের অর্থনীতিবিদ্‌রা খুব শিগগিরই বুঝে ফেলেন যে এ দেশের মৌলিক সমস্যাগুলো শিকেয় তোলা থাকতে পারে, কিন্তু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অনুমানের ব্যবসাটা চালু রাখা আগে দরকার। তাছাড়া মডেলগড়ার খেলাটা আন্তর্জাতিক মক্কেলদের সামনে খোলামাঠে না-খেললে ঠিক জমে না। বিদেশী শ্রোতাদের অবিরল চাহিদা মেটানোই শুধু নয়; অন্যদের মতো আমাদের অর্থনীতিবিদ্‌রাও বোধহয় এক গুপ্ত হীনমন্যতায় ভোগেন যার ফলে বিজাতীয় শ্রোতার প্রশংসা ছাড়া তাঁদের চলে না। বিমূর্ত চিন্তায় তাঁদের উচ্চস্তরের দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য

যা মালমশলা দরকার, তাঁদের স্বদেশ শুধু সেইটুকুই জোগাতে পারে। তাঁদের নক্‌শা এবং তাঁদের উদ্ভাবিত সমীকরণগুলি দুই রকমের হয়ে থাকে। যেমন, যে অনুমানের ওপর তাদের ভিত্তি সেগুলি এত অপ্রাসঙ্গিক, যে তার থেকে উদ্ভূত কোনো সিদ্ধান্তই দেশের কোনো কাজে লাগতে পারে না; নতুবা অনেক বাগাড়ম্বর, অনেক ভাসা-ভাসা গাণিতিক শর্তের উপস্থাপন ও অনেক কষ্টকল্পিত পরিসংখ্যায়নের পরে যে-সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। অর্থনীতি-বিদ্‌রা হয় এমনই সূক্ষ্ম বিষয়ে কথা বলেন যা বর্তমানে, এমন-কি দূর ভবিষ্যতেও অপ্রাসঙ্গিক, নাহলে খুব সাধারণ কথাতেও অনাবশ্যক জটিলতার আমদানি করেন। ইতিমধ্যে দাম বাড়ছে, আয়ের বৈষম্য ক্রমে আরও প্রকট হচ্ছে, উন্নতির হার শূন্যের দিকে নামছে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন থমকে রয়েছে, শিল্পের ক্ষেত্রে কিম্ভূত পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক ব্যর্থতার যে-সব ব্যাখ্যা রাজনীতিবিদ্‌দের মুখ থেকে বেরোচ্ছে, অল্পবুদ্ধি লোকেও তার ফাঁকি ধরতে পারবে, কোনো অর্থনীতিবিদ্‌ উপস্থিত থাকলে সে-সব ব্যাখ্যা দিতে কেউ সাহসই পেত না। কিন্তু অর্থনীতিবিদ্‌রা অনুপস্থিত—হয় তাঁদের মডেলের ধ্যানে তাঁরা নিমগ্ন, নয় তাঁরা বসন্তকালীন ফুর্তি করতে বাইরে গেছেন। আর যাঁরা দেশে রয়ে গেছেন তাঁরা খোলাখুলি কিছু করতে চান না।

চান না, তার একাধিক কারণ আছে। যে-অর্থনীতিবিদ্‌রা দেশে পড়ে আছেন, এবং তাঁরাই অধিকাংশ—তাঁরাও বর্তমান ব্যবস্থা থেকে যথেষ্টই সুবিধা পেয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে তথাকথিত সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ্‌রাই গোষ্ঠী হিসেবে সবচেয়ে বেশী নগদ লাভ করেছেন, কারণ রাজনীতির জগতে তাদেরই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। আসন্ন জাতীয় সৌভাগ্যের রক্ষাকবচ বলে তাদের ধরে নেওয়া হয়েছে, এবং এই ভূমিকা থেকে যতটা সুযোগ নেওয়ার তা তারা নিয়েছে। কিন্তু কখনো-না-কখনো তাদের শেষের-সে-দিন ঘনিয়ে আসতই। সাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন একজন অর্থনীতিবিদ্‌ও এটা সহজেই বুঝবে যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দুর্গতির মূলে তার সমাজ-

ব্যবস্থা। বিভিন্ন শ্রেণীশক্তিগুলির পারস্পরিক অবস্থান যা, তাতে অসাম্য বাড়বে এবং উন্নতি সামান্যই হবে—এ-রকম ধরে নেওয়া যায়। জাতীয় সঞ্চয় যদি না-বেড়ে থাকে, মোট বিনিয়োগের একটা বেমানান রকমের বড়ো অংশ যদি অফলপ্রসূ কাজে চলে যায়, খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা যদি বানচাল হয়, এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের তফাৎ যদি বেড়ে থাকে, কৃষিজাত দ্রব্যে যদি প্রত্যক্ষ কর আদায় করা অসম্ভব হয়, যদি ঐকিক স্তরে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের খরচ কমানো না-গিয়ে থাকে, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে অর্থনীতির জগতের বাইরে; যদি দেখা যায় দাম বাড়ছে আর সরকার তা রোধ করায় ব্যর্থ, তাহলে তার কারণ সরকার মূল্যবৃদ্ধিই চায় এবং সে-ব্যাপারে মদৎ দিয়ে থাকে। চোখ থাকলে যে-কোনো অর্থনীতিবিদ্ই স্বীকার করবে যে এই পরিস্থিতিতিতে তার ভূমিকা নামে মাত্র। তার বিদ্যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গোষ্ঠীহিসেবে অবশ্য অর্থনীতিবিদ্‌রা এ-ধরনের অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ না-করতেই চাইবে; তার মানেই দাঁড়াবে সে, যে সমাজব্যবস্থা তাদের লালন করেছে তাকেই তারা ভূমিসাৎ করতে চাইছে। সুতরাং তাদের ভাতে মারার চেষ্টা হতে পারে, আরামে থাকার সরঞ্জামগুলির যে-আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন তা কমে আসতে পারে।

না, কত ধানে কত চাল হয়, অর্থনীতিবিদ্‌রা তা ভালোই জানে। ন্যাংটো রাজাকে ন্যাংটো বলায় তারা থাকবে সবচাইতে পিছনে। তাদের বর্তমান ভূমিকা অনেকটা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের মতো; এবং এই ভূমিকাই তাদের ঈপ্সিত। ব্রাহ্মণদের চিরাচরিত কাজ লোককে বোকা বানিয়ে রাখা; এইভাবে তারা হিন্দু রাজা ও দেশের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণ করেছে। রাজ্যে লক্ষ্মী কেন অচলা থাকছেন না এবং গরিবদের কেন চিরকালই দাস্যবৃত্তি করতে হবে—তার ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করাই ছিল ব্রাহ্মণদের কাজ। গত পঁচিশ বছর ধরে এ-দেশে সযত্নে যে-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তার তরফে ঐ লোক ঠকানোর কাজটা করে অর্থনীতিবিদ্‌দের প্রচুর বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। তাদের ছাড়া রাজনীতি করা যায় না; তাদের সুবিধার কোনো ঘাটতি নেই;

অমুক পরিকল্পনা ও তমুক মডেল তৈরির জন্য টাকায় বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। দেশের লোক যাতে নিজেদের সাম্প্রতিক দুর্দশার পিছনে মৌলিক তথ্যগুলি না-জানতে পারে তার জন্য তাদের ভুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা চাই ; অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে যাঁরা এই দরিদ্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশে থাকতে দয়া করে রাজি হয়েছেন তাঁদের কাজ এই ছেলেভোলানি ব্যবস্থা করা।

২৯

বারোমাসে তেরো পার্বণ

নিচের খবরটি বেরিয়েছিল কলকাতার এক বহুলপ্রচারিত নির্ভীক জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে, তার ১৪ জুলাই ১৯৭৪-এর সংখ্যায় :

প্রধানমন্ত্রীর লন্‌চে যাত্রার জন্য গঙ্গায় জোয়ারভাঁটা মাপা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লন্‌চে হাওড়া আগমন উপলক্ষে [সিদ্ধান্ত হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী লঞ্চে করে কলকাতা থেকে হাওড়া যাবেন, হাওড়া সেতু পেরিয়ে গাড়িতে নয়], জোয়ার-ভাঁটা, ঝড়, জলে গঙ্গায় গতিপ্রকৃতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও কলকাতা ও হাওড়া পুলিশ এবং মেরিন বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসাররা বারবার লন্‌চে করে বিভিন্ন সময়ে গঙ্গার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। শনিবার রাজ্যের আই. জি. রণজিৎ গুপ্ত ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হাওড়া ময়দান স্টেশন ও রামকৃষ্ণপুর হাট পরিদর্শন করেন।

এদিকে আগামী মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর আসার দিন চাঁদপাল ঘাট - রামকৃষ্ণপুর ঘাট ফেরি চলাচল বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ওই দিনের হাওড়া হাটের সময় কমিয়ে বেলা বারটা করা হয়েছে। এর পর কাউকে বসতে দেওয়া হবে না। এছাড়া এদিন থেকে রামকৃষ্ণপুর ঘাট ও সংলগ্ন রাস্তা ইত্যাদি মেরামত শুরু হয়েছে ; শান্তি রক্ষার জন্য মোট আড়াই হাজার পুলিশ থাকছে। নেতৃত্ব দেবেন ডি. আই. জি. (আরম পুলিশ) পার্থ বসুরায়চৌধুরী।

বলুন তো, সে-কোন্ আনন্দোৎসব এই হৈ-চৈ শুরু করেছিল? ইন্দিরা গান্ধি অল্পক্ষণের জন্য ১৬ জুলাই কলকাতা এসেছিলেন। নদী পেরিয়ে তাঁর যাবার কথা ছিল হাওড়ায়, এক ব্রডগেজ রেললাইন পাতার উদ্বোধনী উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় ভাষণ দেবার কথা ছিল তাঁর। হুগলি নদীর ওপারের সঙ্গে কলকাতার সংযোগ রক্ষা করে যে-হাওড়া ব্রিজ, লম্বায় সে সিকি মাইলের চেয়ে সামান্য বেশি; যানবাহন লোকজনের জট না-পাকালে কোনো গাড়ি মিনিট দুই কি তারও কম সময়ে এই ব্রিজ পেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্রিজের ওপর যানবাহন প্রায়ই বড্ড বেশি থাকে। সে-রকম ক্ষেত্রে, ঢিমে তালে গাড়ি চালাতে হয়। প্রধানমন্ত্রী, অবশ্য, তাঁর মূল্যবান সময়ের অপচয় করতে পারেন না। তাই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে তিনি হুগলি পেরুবেন, এই ব্রিজ দিয়ে নয়, মোটরলঞ্চে করে। যাওয়া-আসা মিলিয়ে তাঁর এই নদী ভ্রমণে সবশুদ্ধ্ ছ-মিনিটও লাগত কি না সন্দেহ। কিন্তু জনসাধারণের খেয়াব্যবস্থা তৎসত্ত্বেও পুরো তিন ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেয়া হল। নিত্যিকার বাজারহাট বন্ধ করে দেয়া হল বেলা দুপুরেই, যেখানে অন্যদিন বেচাকেনা চলে সন্ধে অব্দি। বিভিন্ন বর্ণের বিশেষজ্ঞদের তাঁদের নিয়মিত ক্রিয়াকর্ম থেকে টেনে বার করে লেলিয়ে দেয়া হল নদীর জলবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তদন্ত করতে। প্রবীণ সব পদস্থ কর্মীরা দিনের অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন ঝগঝগ, পর-পর বেশ কয়েকদিন ধরে, নদীর এপার ওপার, স্রোতের টান মেপে-মেপে। আড়াই হাজার পুলিশকে মোতায়েন করা হল নিরাপত্তা বা রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্বে। রাস্তাঘাট সাময়িকভাবে সারানো হল, ঝকঝকে হল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে যে-রাস্তা দিয়ে সভা করতে যাওয়া-আসা করবেন, সে-রাস্তা থেকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হল শত-শত রাস্তার লোককে, যাদের মাথার ওপর এমন-কি কোনো ছাউনিই নেই।

কেউ নিশ্চয়ই তিক্ত সকরুণ মন্তব্য করতে পারেন আমাদের এই মহান প্রজাতন্ত্রে এখনও মধ্যযুগের সম্মোহন কী প্রবল। সময় থমকে দাঁড়াত

সেকালে, এখনও দেশের বাকি সব লোকের জন্য সময় থমকে দাঁড়ায় যখন রাজার দুলাল, বা দুলালী, কিছুক্ষণের জন্য ঘরের সমুখ দিয়ে চলে যান। সংগতি-অপচায়িক পার্বণগুলো—ওপরের এই খবরের টুকরোটি যার চমৎকার পরিচায়ক, তার সঙ্গে কিন্তু সাধারণ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার সামান্যই সম্পর্ক ; এ বরং প্রায়-মধ্যযুগীয় মানসিকতা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন, যা সম্ভবত পরিকল্পনা করেই রাজনৈতিক-সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে লালন করা, অথবা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। যতদিন-না স্থায়ী কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, এই পালা-পার্বণগুলো চলতেই থাকবে, আর সাধারণ লোককেও প্রতিবার কোথাও কোনো জাঁদরেল ব্যক্তির পদার্পণ উপলক্ষে চূড়ান্ত দুর্ভোগ পোহাতে হবে। তৎসত্ত্বেও বিষয়টি একটু ভালো করে খতিয়ে দেখা উচিত। ভাবতে ইচ্ছে হয় কোনো পার্বণ মানে নিছকই এক পার্বণ। দুর্ভাগ্যবশত, মোটেই তা নয়। এই পালাপার্বণের আবার অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে ; এর সঙ্গে জড়ানো আছে সেই বিষয় যাকে বলে opportunity cost। জুলাই ১৬তে প্রধানমন্ত্রীর হাওড়াগমন উপলক্ষে শব্দজব্দটির যে-অর্থনৈতিক তাৎপর্য তা তো চোখের সামনেই আছে। দুটি অতিব্যবহৃত ও শশব্যস্ত ক্রিয়াকেন্দ্রের মধ্যে খেয়া পরিবহণব্যবস্থা তিন ঘণ্টার জন্য বিলকুল খারিজ—কেন ? না, প্রধানমন্ত্রী সবশুদ্ধ মিনিট ছয় থাকবেন আশপাশে, এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে জলপথে যাতায়াতের সব ব্যবস্থাই তাই ঐ সময়ের জন্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, আর যে-কেউ ইচ্ছে করলেই কষে বার করে দিতেন এই স্থগিত খেয়াব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক লোকসানের অঙ্ক। তাড়াতাড়ি বাজার গুটিয়ে নিতে বাধ্য করা হয় ; স্বাভাবিক সময়ের চাইতে ছ-ঘণ্টা কমে গেছে তার মেয়াদ। আড়াই হাজার পুলিশ, প্রধানমন্ত্রীর দলবলের সেবায় এক পায়ে খাড়া, যখন তাদের অন্যকোথাও কাজে লাগানো যেত, যেমন ধরুন, খাদ্যসংগ্রহের কাজে ; এটাও সুযোগ অপব্যয়ের আরেকটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী কুল্লে একটি মোটরলঞ্চে করে মাত্র ছ-মিনিটে নদী পারাপার করবেন,

বেশ-কিছু মোটরলঞ্চ-ঘণ্টা, ডিজেল, মবিল, পেট্রল পোড়ালেন পদস্থ কর্মীরা হুগলি নদীর জোয়ারভাঁটা আর জলের তল মাপতে গিয়ে। জলবিজ্ঞানবিশারদেরা—যাঁদের অন্য কাজ করা উচিত—প্রধানমন্ত্রী যে-বিশেষ এলাকা দিয়ে নদী পেরুবেন, সেখানকার মাপজোক নিয়ে গলদঘর্ম হলেন।

এ কি নিছকই তিলকে তাল করা? না কি এইসব তথ্য ভারতীয় বাস্তবতার একটা দিক খুলে দেখায়, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যে-দিকটার বেশ-খানিকটা সংযোগ আছে? পণ্ডিতেরা এ-দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের শ্লথমন্থর চালের সমালোচনায় খৈ ফোটান। গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে তাঁরা ব্যবস্থাটির নানান শ্লথগতির উল্লেখ করেন, যেমন, কেমন করে কারখানায় আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়ে দেয় মজুররা, অথবা চা বা কফি খেতে যাবার ছুতো করে কিছুক্ষণের জন্য কেটে পড়ে! রেলওয়াগনের সমাগম কমে যাওয়ায় অথবা বিভিন্ন এককগুলোর মধ্যে সুসমঞ্জ যোগাযোগের অভাবে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি কীভাবে ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না, তা নিয়ে সে কী তিক্ত তীব্র নালিশ ফেটে পড়ে। ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগগুলো ঘ্যান-ঘ্যান করে সরকার প্রবর্তিত অর্থহীন সব বিধিনিষেধ নিয়ে, যা খামকাই দুর্মূল্য সময় ও কর্মোদ্যমের অনেকটাই নষ্ট করে ফ্যালে। প্রতিদিন, কোনো মান্যবর বা অন্য কেউ আমলাবাজির কালান্তক লালফিতে ও নিয়ম-কানুনের জবড়জং প্রবণতার নিন্দেয় মুখর হয়ে ওঠেন, যা সব সৃষ্টিশীল চেষ্টায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়। ম্যানেজমেণ্ট বিশারদেরা কর্মনীতির ভাঙন দেখে বিলাপ করেন; প্রধানমন্ত্রী গালাগাল দেন অপচয় আর অনীহাকে, আর সরকার-নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগগুলোর, যার মধ্যে এমন-কি জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলোও আছে, কর্মচারীদের কাজ করার তাগিদ নেই দেখে তাঁর রাতের ঘুম টুটে যায়। হয়তো প্রধানত পুঁজিরচনার অপ্রতুলতাই অর্থনৈতিক অচলাবস্থার জন্য দায়ী, কিন্তু অর্থনীতিবিদরা সবসময়েই সেইসঙ্গে অন্তর্নিহিত অযোগ্যতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন, যেমন উৎপাদন-ক্ষমতার ব্যবহারে করুণ ব্যর্থতা ইত্যাদি।

ক্রিয়াচার, পালাপার্বণ আর ঢিলেমি অবশ্য একসঙ্গেই চলে। সমাজ যেখানে আদিম উপজাতিদের ধরনে গঠিত, টোটেম আর ট্যাবু সেখানে অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে—এমন-কি জরুরি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের চেয়েও। কাজ হয়ে ওঠে গৌণ, অনাবশ্যক, পার্বণের আচারটাই হয়ে ওঠে মুখ্য। সাধারণ মর্তমানবদের পক্ষে সামাজিক ব্যবহারবিধির মধ্যে শ্রেণীবিভাজন অসম্ভব। যত বার প্রধানমন্ত্রী কোনো স্থলে পদার্পণ করেন, স্বাভাবিক কাজকর্ম—এমন-কি অত্যাবশ্যক অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুদ্ধু—আদেশবলে থেমে যায়, আর পার্বণের আচার সবকিছু দখল করে নেয়। এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক প্রচল: কোন্‌টা কার চেয়ে বেশি জরুরি, কোন্‌টা সর্বাগ্রে, কোন্‌টা তা নয়—এইসব তখন ঠিক হয়ে যায়। এই প্রচলনই তখন চুঁইয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন জৈবকোষে। কঠোর জরুরি অর্থনৈতিক লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়াটাই স্পষ্টত অনেক বেশি মূল্যবান বলে বোধ হয়, তার বদলে যদি পাওয়া যায় অমুক নেতা যুগ-যুগ জিও-জাতীয় অতীব তৃপ্তিকর কোনো শব্দ-কল্পদ্রুম। গোড়ার কাজ, বাপু গোড়ায়।

প্রধানমন্ত্রীকে যা হাওড়ায় নিয়ে গিয়েছিল, তা একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই গীত গাওয়াটা কি অক্ষমণীয় অপরাধ হবে: বারো মাসে তেরো পার্বণ। দূরে ঠেলে শেষের সে ক্ষণ॥ এই সেদিন বাঙালুরে প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ একটি প্রস্তাব পড়ে শোনালেন, উপলক্ষ, পুনরায়, কোনো প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। তিনি প্রচার করছিলেন সমস্ত সংগতির সমীচীন সুব্যবহার মারফৎ সর্বময় শুভময় অর্থনীতি, যখন কি না তিনি নিজেই কোনো-কোনো অপচয়ের দুষ্কৃতিকে সাহায্য করছেন: এইটেই হল দৃঢ়সংলগ্ন, ব্যবহারজনিত স্ববিরোধ, যা থেকে কেউ যে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াতে উৎসুক, এমন কদাচ মনে হয় না। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, কিংবা কোনো কারখানা বা মেছোহাটার বোতাম-টিপে-শুভ-সূচনা ঘোষণা করতে গিয়ে মন্ত্রীরা যে-পরিমাণ সময় খুইয়ে বসেন, তা নিশ্চয়ই আরো সুসমঞ্জ অর্থনৈতিক পরিচালনা বা নীতি প্রকল্পে সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা

যেত। সময়—এবং সংগতির—অপচয়ের ফলে দ্বিতীয় আরেকটি পরিণামকে এইভাবে আহ্বান জানানো হয়। এ-সব উদ্বোধনী তামাশায় যোগ দিতে গিয়ে মন্ত্রীরা নিজেদের সময়, এবং বলাই বাহুল্য, সরকারি অর্থ অপচয় করেন; যেহেতু মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য দাবি করে যে তাঁদের রথ পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় সাধারণ লোক সব কাজকর্ম থামিয়ে দিয়ে আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম ঠুকবে—আরো সময় ও সংগতি গোল্লায় যায়। প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে, অন্য আরো কতগুলো ধারণা জাতির চৈতন্যপ্রবাহে প্রোথিত হয়ে যায়, যেমন, বাহ্যরূপই বাস্তব, আচার-অনুষ্ঠানেই জৈব পুষ্টি, আর গুণকীর্তনই অর্থনীতির সারাৎসার। এর প্রত্যেকটিই বিপজ্জনকরূপে বিপথচালক বা অসত্য হতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের সংস্কৃতি এইরকম থাকবে, ততদিন এর দীর্ঘবিসারী শোষকশুণ্ড-গুলোর কাছ থেকে রেহাই নেই।

সব শক্তিই জনগণের। জনগণ যদি স্তাবকতার ওপর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সে তাদের ব্যাপার, যদিও আমরা বাস করছি বিংশ শতাব্দীতে এবং তার তৃতীয় পাদও শেষ হয়ে এল। বস্তুত, আধা-রাজবংশগুলো এখনও বহাল তবিয়তে থেকে গিয়েছে, দু-একটা পুরোটা-রাজবংশের সঙ্গে। মধ্যযুগীয়তা আর উপজাতীয়তার এই সম্মেলনটাই যে বিপদ আর মনোযাতনা ছড়িয়ে দেয় তা অবশ্য না-মেনে উপায় নেই, কেননা তখনই স্তবস্তুতি আর অর্থনৈতিক ঢিলেমি, অবিভাজ্য, যুগ্ম ফসল হিসেবে দেখা দিতে থাকে। এই যুগ্ম জোগানের সত্যিকার তাৎপর্য হাড়ে-হাড়ে টের পেতে জনগণের আরো সময় লেগে যাবে। তারপর, আবার, অবশ্য সিদ্ধান্তটা নেবে তারাই। অর্থনৈতিক প্রগতির বদলে তারা যদি পার্বণ আর ক্রিয়াচারই পছন্দ করে, তবে আপনার আমার সেখানে নাক গলাবার কোনো অধিকার নেই; আপনি আমি মৃত্যু-পিপাসার কীই বা জানি।

৩০

অন্তিম প্রতিকার

আপনাদের কি সেই আমেরিকান সেনাপতির কথা মনে পড়ে যিনি ভিয়েৎনামের একটি গ্রাম রক্ষা করার জন্য তাকে ধ্বংস করেছিলেন? সেই ধরনের একটা ব্যাপার আরো অনেক বিরাট মাপে আমাদের দেশে ঘটছে। ভারতবর্ষের মানুষকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে হবেঃ এই শুভ সমাধানকে এগিয়ে আনার জন্য দেশের বেশির ভাগ লোককে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং হবে।

মনে করুন একজন ভারতীয় শুধু শস্য খেয়ে প্রাণধারণ করে; কারণ প্রাণরক্ষার জন্য অন্য যা সম্ভাব্য খাদ্য, তার সবই বর্তমান ব্যবস্থায় শস্যের চাইতে মাগ্‌গি। পুষ্টিবিজ্ঞানবিশারদরা তো দিব্যি গেলে বলেন যে একজন মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজন দিনে ২,২৫০ ক্যালরি মাপের খাদ্য; তাঁরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকের জন্য বছরে ২৪৫ কিলো-গ্রামের মতো শস্যের ব্যবস্থা করে দেবেন। রাষ্ট্রসংঘের শুঁটকো দিগ্‌গজদের মতেও টিঁকে থাকার জন্য দেহের চাহিদা অন্তত দৈনিক ১৩ আউন্স শস্যজাত খাদ্য; অর্থাৎ বছরে গিয়ে ২২৫ কিলোতে দাঁড়ায়। এডগার স্নোর সাক্ষ্য অনুযায়ী চীনে কাজের ধরনের ওপর নির্ভর করে ৩০ থেকে ৪৫ পাউণ্ড পর্যন্ত শস্য প্রতি মাসে প্রত্যেকের বরাদ্দ। সর্বনিম্ন বরাদ্দের পরিমাণ ধরলেও চীনে প্রত্যেকে বছরে ১৬৫ কিলো শস্য পায়।

পুষ্টিবিশেষজ্ঞদের কথা বাদ দিন, রাষ্ট্রসংঘও চুলোয় যাক। ধরুন আমরা দেশের লোকের জন্য বছরে ততটাই শস্য বরাদ্দ করতে চাই একজন চীনা গড়পড়তায় যেটুকু পেয়ে থাকে। আমাদের সুবিধার্থে এটাও না-হয় ভুলে যাব যে চীনারা শস্য ছাড়াও অন্য খাদ্য খায়, এবং

বেশ বেশি পরিমাণেই খায়। সরকারি পরিসংখ্যানের যাথার্থ্যে সন্দেহ করাটা দেশপ্রেমিকের লক্ষণ নয়; কাজেই বাদবিতণ্ডা বন্ধ রেখে ধরে নিন পঞ্চম যোজনার খসড়া যখন তাই বলে তখন নিশ্চয়ই বর্তমান বছরে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১১৪,০০০,০০ টন ছোঁবে। মেনে নিন প্রচলিত হিসেব, যাতে ধরে নেওয়া হয় যে মোট শস্যের শতকরা ১২·৫ ভাগের কিছু অংশ বীজ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার হবে, কিছুটা বরবাদ হবে। তাহলেও ৫৮ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার মতো ১০ কোটি টন খাদ্যশস্য থাকার কথা। এর থেকে মাথাপিছু বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৭০ কিলো। অর্থাৎ চীনের নেতারা তাদের দেশের মানুষকে যে-পরিমাণ খাদ্য জোগাতে পারে, নিছক গণিতের হিসেব মাফিক, ভারতবাসীদেরও তার চেয়ে কম পাবার কথা নয়।

এই হিসেবে কি কোনো গোল আছে? জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য তবেই পৌঁছনো যেতে পারে যদি তাদের ক্রয়ক্ষমতায় কুলোয়। চলতি মরশুমে রেশন দোকান ও ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে যে-দরে খাদ্যশস্য বিক্রি হবার কথা, সেদিকে তাকান। মোট শস্য এতই কম সংগৃহীত হয়েছে, যে হিসেব থেকে তা বাদ দেওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে সাধারণ মানের চালও দেড় টাকা কিলোর কমে দেশের কোথাও বিক্রি হবার সম্ভাবনা কম। গমের ব্যাপারে যাদের কায়েমি স্বার্থ আছে তারা প্রতি কুইন্টলের জন্য অন্তত একশো টাকা দর হাঁকবে বলে তৈরি হচ্ছে; অর্থাৎ তারও বিতরণ মূল্য প্রতি কিলোয় ১·২৫ পয়সার কম হবে না। বিভিন্ন শস্যের আনুপাতিক হার যাই হোক-না কেন এই মোট হিসেবের মধ্যে সরকারি দরে রেশন দোকানের মাধ্যমেও যদি আপনি আপনার পুরো বরাদ্দটা পান, তবু ১৬৫ কিলো অর্থাৎ চীনারা যা পায় তার সমান পেতে হলে আপনাকে খরচ করতে হবে বছরে অন্তত ২২০ টাকা। যদি আধা-পরিমাণ সরকারি দরে পান ও বাকি অর্ধেক তার দেড়া দামে কিনতে হয় তাহলে আন্দাজ ২৭৫ টাকার মতো পড়বে। আর যদি এক-চতুর্থাংশ রেশন দোকান থেকে ও বাকি তিন-চতুর্থাংশ বাইরে থেকে দেড়া দামে কিনতে হয় তাহলে আপনার

খরচ তিনশো টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এখন সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ১ কোটি টনের বেশি শস্য বাজারে আসে না। অর্থাৎ সরকারি দরে পাওয়া যাচ্ছে মাথাপিছু বরাদ্দের এক-দশমাংশ মাত্র। তাছাড়া সরকারি বিতরণ ব্যবস্থাও খুব বাঁকা পথে চলে। হয়তো ৯০ লক্ষ টনই চলে গেল দেশের সবচাইতে বিত্তবান শতকরা দশভাগের কাছে। দারিদ্র্যসীমা নিয়ে যতই-না কেন বাদানুবাদ থাকুক, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আজ এমন এক অবস্থার সম্মুখীন, যাতে জীবনধারণের জন্য দরকারি ন্যূনতম পরিমাণের খাদ্যশস্য কিনতে হলেও তাদের বর্তমান আয়ের চাইতে অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হবে; অন্যান্য প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর কথা তাদের ভুলে যাওয়াই ভালো।

পরিসংখ্যানের কারচুপিতে এই বাস্তব ঢাকা পড়বার নয়। চলতি বছরে কী হচ্ছে দেখুন। খরিফের মরশুম এখন পুরোদমে চলেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে চালের দর ৩ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত যা খুশি উঠছে। গম যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে দাম ২·৫০ টাকা। উৎপন্ন শস্যের মোট পরিমাণ অনুযায়ী আমাদের মাথাপিছু বরাদ্দ চীনাদের চাইতে কম হবার কথা নয়, কিন্তু সেটা পাবার জন্য খরচ করতে হবে বছরে ৪৫০ টাকা। এই রাজ্যের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ লোকের আয়ের মাত্রা এর চাইতে ঢের কম। কাজেই অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে এই পরিমাণ ব্যয় করা তাদের সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে। গত চব্বিশ মাসে খাদ্যশস্যের দাম শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত চড়ে গেছে, অন্যদিকে নিছক টাকার হিসেবেও অধিকাংশ লোকের আয় স্থাণু হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যা একমাত্র করণীয়, লোকে তাই করছে: খাবারের দাম যত চড়ছে, শস্যজাত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ তারা ততই কমিয়ে দিচ্ছে। খাদ্যশস্যের ব্যবহারের হার নিচের থেকে আরো নিচে যাচ্ছে। অনেক সংসারে কিছুদিন পরে খাবার সানকি থেকে শস্যজাত খাদ্য পুরোপুরি উধাও হয়ে যাচ্ছে; খিদের জ্বালা জুড়োনোর জন্য তার জায়গায় যথাসম্ভব শাকপাতার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার কথা বলার কি কোনো অর্থ আছে? স্বয়ম্ভরতা কাদের

জন্য, দামের কোন্ চূড়ায় উঠে সেটা লভ্য? আতঙ্কে সরকারের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলেই মনে হয়, অন্য-সব বুলিকে আজ ডুবিয়ে দিচ্ছে এক নতুন বুলি—শস্য সংগ্রহে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ক্রয়মূল্য চড়াতে হবে। ধান ও চালের যা সংগ্রহ মূল্য ধরা হয়েছে—আর গমের জন্য যা ধার্য করার কথা বিবেচিত হচ্ছে—তাতে, বিশেষত দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ধনী চাষীরা শতকরা সত্তর, আশি, একশো ভাগ কি তারও বেশি মুনাফা লুটবে। বিতরণ মূল্যও সংগ্রহ মূল্যের সঙ্গে যদি তাল রাখে, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে দেশের খামারে উৎপন্ন শস্য দেশের অধিকাংশ লোকের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাবে। গ্রামাঞ্চলে সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে আরো বেশি ফসল বিতরণে সরকারের অনীহা কিংবা অক্ষমতার কারণ এটাই—এই ব্যবস্থা আরো বেশি চালু করে লাভ কী, যদি সরকারি দরে বিতরিত শস্যও লক্ষ-লক্ষ ছোটো চাষী এবং খেতমজুরের নাগালের বাইরেই থেকে যায়?

কাজেই গণিতের হিসেবে থেকে যে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল, তা মরীচিকা মাত্র। মাথাগুনতির হিসেবে চীনের সমান শস্য আমাদেরও আছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, যতক্ষণ বিতরণে অসমতা আছে। এ-দেশে উৎপন্ন শস্যের বণ্টনে অসমতা থাকবে, কেননা আয়ের অসমতা আছে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন গত কয়েক বছরে এই অসমতা আরো বেড়েই গেছে। আয়ের হিসেবে জনসংখ্যার যে শতকরা দশ, পনেরো কি কুড়ি ভাগ সবচেয়ে ওপরে আছে তারা তাদের বছরে ১৭০ কিলো মাথাপিছু বরাদ্দের চাইতেও বেশিই ভোগ করতে থাকবে। অন্যদের আহারের পরিমাণ কিন্তু রোমহর্ষকভাবে কমে যাবে। এবং খাদ্যশস্যের মোট ক্রয়ক্ষমতা অবসন্ন হয়ে আসার পর বাড়তি মজুত শস্য সম্ভবত ইঁদুরকে খাওয়ানো হবে। শস্যের দাম ধরে রাখার জন্য শস্য নষ্ট করা তো এমন-কিছু অসাধারণ ঘটনা নয়; বিভিন্ন দেশের কুলাকরা এ-ব্যাপারে রাস্তা দেখিয়েছে। উৎপাদন সীমিত করা না-গেলেও জোগান নিয়ন্ত্রণে রাখা সব সময়েই সম্ভব।

কৃষককে যথেষ্ট উৎসাহ দেবার প্রক্রিয়াটা কোথাও থেমে যাবার নয়।

শতকরা ৭০, ৮০ বা ১০০ ভাগ মুনাফায় একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে লাভের মাত্রা আরো বাড়াতে না-চাওয়ার কোনো কারণ নেই। সরকারের সঙ্গে কুলাকদের এই প্রণয়লীলা চলতে থাকলে এ-দেশে ফসলের ফলনও হয়তো পুনর্জীবন পেতে পারে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বহুল প্রচারিত লক্ষ্যগুলির একটি হল খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনতে হলে দেখা যাচ্ছে দাম বাড়াতেই হবে। দাম যতই বাড়ানো হবে, ততই উৎপন্ন শস্যের ভাগ নেবার ক্ষমতা আরো বেশি-বেশি লোকের হাতের বাইরে চলে যাবে। ভিয়েৎনামের রক্ষার্থে তাকে ধ্বংস করার মার্কিনি দাওয়াই কি এর সার্থক তুলনা নয়? একটি দেশের লোককে অনাহার থেকে বাঁচানোর জন্যই তাদের অনাহারে রাখতে হবে। এই খুড়োর কলটি দু-দিকেই কাজ করতে পারে। একদিকে দাম বাড়াবার সঙ্গে আশা করা যায় উৎপাদনও বাড়বে, অন্যদিকে দাম বাড়ার ফলে বেশি লোক যদি না-খেয়ে মরে, তাহলে খাদ্যের মোট চাহিদাও সেই হারে কমবে। যে-পথেই হোক, আমরা অন্তিম প্রতিকারের দিকে এগিয়ে চলেছি।

৩১

উপরি দু-টাকার জন্য

দু-বছর আগেও কলকাতার দেয়ালে অভিনন্দিত হতেন চীনের চেয়ারম্যান, যিনি অলিগলির তরুণ উৎসাহীদেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। গত বছর এই সময়ে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে-পড়া দেয়াললিপিগুলির বিকল্প কাজ ছিল ইন্দিরা গান্ধীর জয়ঘোষণা। আর এ-বছর তাদের ঘোষণার বিষয় নাসবন্দী। অতীতের সব প্রচার ছাপিয়ে একটা এলাহি প্রচার চলেছে; দেয়ালে শূন্যস্থান আর নেই বললেই চলে। চলে আসুন, চলে আসুন যে-কোনো নির্দিষ্ট হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, দেশের কথা ভাবুন, পুরুষ হলে ভ্যাসেকটমি, মেয়ে হলে টিউবেকটমি করিয়ে ফেলুন। প্রতি অপারেশনের জন্য চল্লিশ টাকা দেওয়া হচ্ছে; শুধু তাই নয়, চল্লিশ টাকার ওপরেও চূড়ান্ত প্রাপ্তিযোগ আছে, যাতায়াত বাবদ উপরি দু-টাকা। নগদ উৎসাহের চাইতে ফলপ্রসূ আর-কিছুই নয়; প্রাচীরপত্রটি আহ্লাদে ফেটে পড়তে চাইছে; তার ভাবখানা এই, যে আমাদের মহান দেশে এমন লোক আর কে আছে ঐ উপরি দু-টাকার লোভানি যে অগ্রাহ্য করতে পারবে? কাজেই পরিবার পরিকল্পনার জয়জয়কার এবার ঠেকানো যাবে না।

পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর দেশপ্রেমের ফলশ্রুতি তাহলে গর্ভপাত, তাও সেটা বাণিজ্যিক কারবারে পরিণত, চুক্তিপিছু বেয়াল্লিশ টাকার মামলা। বেসাতপুজোর এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী আছে? আর সরকারকে বোধহয় বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই, যে এটা অশ্লীলতারও চরম উদাহরণ। প্রতি নাসবন্দীর মূল্য বেয়াল্লিশ টাকা। দেশি হুইস্কির বোতলের এক-পঞ্চমাংশ ঐ দামে কেনা যায়।

এমন অনেক মন্ত্রী এবং শিল্পপতি আছেন যাঁদের দৈনিক ধূমপানের খরচ বেয়াল্লিশ টাকার বেশি। যে-বরাঙ্গনারা হুজন বা চারজন করে সাহেবি কেতার রেস্তোরাঁগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাঁদের এক প্রহরের চা-পেস্ট্রির জন্য বেয়াল্লিশ টাকার বেশি বিল ওঠে। যে-কোনো বড়ো শহরে বেয়াল্লিশ টাকা মানে প্রতি হু-ঘণ্টায় ট্যাক্সির ভাড়া। এই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ভারতবর্ষে বেয়াল্লিশ টাকা—যা নাকি বর্তমান মুদ্রা-বিনিময়ের হারে পাঁচ মার্কিনি ডলারের সমান—আবার একটি বাড়তি মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনার মূল্যও বটে ; তার মধ্যে, মনে রাখবেন, যাতায়াতের ভাড়াও ধরা হয়েছে।

এখানে যে শুধু সামাজিক অসাম্যের মাত্রাটাই আমাদের আঘাত করে, তা নয়। এমন-কি যাদের জন্য এ-সব দেয়াললিপি আর ঘোষণা, সেই গরিবরা যে কত গরিব সেই উপলব্ধিটাও সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। এর মধ্যে আমাদের শাসকগোষ্ঠীর যে-অশিষ্টতা প্রকাশ পাচ্ছে, সেটাই আমাদের ধৈর্যের শেষ সীমায় নিয়ে আসে। নির্বাচনে গরিবদের সবারই একটি করে ভোট আছে, সেই ভোটের দাম একজন লক্ষপতির ভোটের চাইতে কিছু কম নয়। এটা এই সমাজ ব্যবস্থারই একটা হুর্ভাগ্যজনক উৎকেন্দ্রিকতা। পরিবার পরিকল্পনার প্রচারে অন্তত এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখা হয়নি ; ছোটোলোকদের আমাদের মতোই ভোটাধিকার থাকুক, তবু ওরা অন্যরকম। ওদের আত্মসম্মান বা সংবেদনশীলতা কোনোটাই নেই। চল্লিশ টাকায় যদি ওদের ভোট কেনা সম্ভব হয়, তাহলে ঐ চল্লিশ টাকার টোপ ফেলে ওদের নির্বীজকরণেও আমরা রাজি করাব। তাতেও যদি ওরা নারাজ হয়, তাহলে না-হয় যাতায়াত ভাড়া বাবদ আরো বাড়তি হুটো টাকা ঐ সঙ্গে ফেলে দিও। শাদাসিধে কণ্ডোমে যদি কাজ না-হয়, তাহলে রঙবেরঙা কণ্ডোম বের করা যাক। কণ্ডোম যেন লজেঞ্চুস, আর এদেশের গরিব লোক, যারা এই সার্বভৌম রাষ্ট্রের সর্বাধিক ভোটের অধিকারী, তারা যেন বুদ্ধিহীন শিশু। যেখানে জনসাধারণ কেবল অবজ্ঞার পাত্র, সেখানেই শুধু প্রচারলিপির মাধ্যমে এ-রকম নিচু অশ্লীলতা চালানো যেতে পারে।

সারাক্ষণই জাতির বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলা হয়। ভরতনাট্যম্ ও সেতারের মহিমা তামাম দুনিয়া জেনেছে। মন্ত্রীরা বেদ-উপনিষদ্ থেকে বাণী ঝাড়েন। ভারতীয় সভ্যতায় সূক্ষ্ম রসবোধের উদাহরণ হিসেবে মন্দির-ভাস্কর্যের কথা তোলা হয়। এইসবের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা প্রচারকদের এই অপমানজনক অসৌজন্য আপনি কী করে মেলাবেন? এটা ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে যে গরিবদের রুচিবোধ বা সম্মানবোধ কোনোটাই নেই। এটা কোনো চিন্তার বিষয়ই নয়, এটা ধরেই নেওয়া যায় যে কানের কাছে অভদ্রভাবে টাকা ঝমঝম করলেই গরিব লোকেরা তাদের পুরুষত্ব কিংবা নারীত্ব সাময়িকভাবে বরবাদ করার প্রস্তাব মেনে নেবে। এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু একজন বাড়তি গরিব লোকের মূল্যমান বেয়াল্লিশ টাকা মাত্র।

কিন্তু তথ্যের দিকে এবার তাকানো যাক। প্রচারের এই পুঞ্জীভূত আক্রমণ নয়, যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সত্যি-সত্যি কী ঘটছে গ্রামে মফঃস্বল শহরে আর মহানগরগুলিতে। জন্মের প্রকৃত হার কত, সেটাই ভাবনার কথা। সমস্ত সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রমাণ করা কঠিন হবে যে দশ-বিশ বছর আগে যা ছিল সে তুলনায় প্রকৃত জন্মহার লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। মোট তথ্যকে আমল না-দিয়েও, যে-সব এলাকা পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রচারের আওতায় এসেছে সেখানে বাস্তব ফল কতটা হয়েছে প্রশ্ন করা যাক; সে-রকম ক্ষেত্রেও জন্মহারের ওপর তার দর্শনীয় প্রভাব পড়েছে এটা দাবি করতে হলে অনেকটাই বিশ্বাস্যতার দরকার হবে। কোনো-কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকায় এই হারের ঈষৎ হ্রাস হয়তো চোখে পড়ে, কিন্তু পরিসংখ্যানের দিক থেকে এই নিম্নগতিকে প্রচারের সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে যোগ করা কঠিন।

তাছাড়া পুরো ব্যাপারটা কীরকম বিসদৃশ ভাবুন। চতুর্থ যোজনায় পাঁচ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে যে খরচ নির্ধারিত হয় তা ২৪০ কোটি টাকারও কম, সেখানে পরিবার পরিকল্পনার তহবিলে রাখা হয়েছিল ৩৫০ কোটি টাকার মতো এক সুবৃহৎ অঙ্ক। বহু অর্থনীতিবিদ্,

সমাজবিজ্ঞানী ও জনবিজ্ঞানী বহুদিন ধরে সরকারকে বুঝিয়ে চলেছে যে শেষপর্যন্ত জন্মহার নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় জীবনযাত্রার মানের সামান্যতম উন্নতি আর শিক্ষার প্রসার। এমন-কি, তাঁরা এ-বিষয়েও একমত যে অর্থনৈতিক উন্নতি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন দুইই অনেকাংশে শিক্ষার প্রসারের উপর নির্ভরশীল। সংবিধান অনুযায়ীও আরো আগেই স্কুলে যাবার মতো বয়সের সব ছেলে-মেয়েদের আবশ্যিক অর্থনৈতিক শিক্ষা চালু করার কথা ছিল। কিন্তু সরকারি প্রকল্পে অগ্রাধিকারের নড়চড় হয় না, পরিবার পরিকল্পনার স্থান প্রাথমিক শিক্ষার আগে।

এই পরিস্থিতির অন্তত গোটাতিনেক আলাদা কারণ অনুমান করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য হতে পারে। তার ফলে উৎপাদনের সম্ভাবনা বাড়া সম্ভব, প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন আঙ্গিকগুলি লোকের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজতর হতে পারে, এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে যাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকের কাছেও পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন কিছুটা বোধগম্য হয়। কিন্তু আবার প্রাথমিক শিক্ষার কিছু বিপদও আছে। গ্রামের দিকে খেতমজুর বা ছোটো চাষীকে আর শহরের দিকে বস্তিবাসীদের সামান্য শিক্ষা দেওয়ারও অর্থ সামাজিক অসংলগ্নতার বোধকে বাড়তে সাহায্য করা। প্রাথমিক শিক্ষা দরিদ্রের নির্বাক ক্ষোভকে ভাষা দিতে পারে। দরিদ্র, কৃষক, অদক্ষ শ্রমিক এবং বেকারের বাহিনীকে সংগঠিত হতে, রাজনৈতিক দিক থেকে মুখর হতে, উৎসাহ দিতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার ফলে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে না-থাকার মন্ত্র পেতে পারে তারা।

পরিবার পরিকল্পনার প্রচারে তেমন কোনো বিপদ নেই, বিপ্লবের বীজ তাতে অনুপস্থিত। আরো-একটা সুবিধা আছে এটার : এ ব্যবসাটা বিদেশীদের আকর্ষণ করে, আকর্ষণ করে বিদেশী মুদ্রাও। বাইরে থেকে আর্থিক সাহায্য এবং দক্ষ কর্মী অবাধে আসতে থাকে। টাকাকড়ির ঢালাও ব্যবস্থা হয়। আপনি প্রাথমিক শিক্ষার একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করুন, টাকার সে-রকম ঢালাও সরবরাহ পাবেন না। সাক্ষরতার প্রসার একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজ। তার মধ্যে কোনো

উত্তেজনা নেই। নাসবন্দীর ব্যাপারটায় হয়তো আছে। মার্কিনিদের ঢঙে বলতে গেলে, পরিবার পরিকল্পনার যে যৌন আবেদন আছে, প্রাথমিক শিক্ষায় তা মোটেই নেই।

তাছাড়া, পরগাছা-প্রধান এই সমাজে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার আকৃষ্ট করে জনসংযোগ-বিশেষজ্ঞ নামের বিরাট একদল পরভোজী জীবকে। নগদ টাকা নয়-ছয় করার প্রচুর সুবিধা এ-ধরনের প্রচারে। কাজটা চুক্তি করে জোগানদারদের হাতে তুলে দেওয়া হল, তারাও আবার জোগানদারদের সঙ্গে চুক্তি করল। এইভাবে সমাজের ওপরতলা থেকে বাছাই-করা লোকদের খুশি রাখা হল। প্রায়ই তারা শহরে যায়, রোজই নির্বীজকরণের বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার নতুন-নতুন ফিকির নিয়ে হাজির হয়। চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার ব্যাপারে যতটা উৎসাহ দেখা যায়, নিছক বাগ্‌বিস্তারেও প্রায় ততটাই। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এ-রকম কোনো সরল পন্থা নেই। কিছু কথার ফুলঝুরি ছড়ানো সেক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তার জন্য দরকার আমূলবিস্তৃত দেশব্যাপী একটা সংগঠন, দেশের পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রামের প্রতিটির সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই, শহরের প্রতিটি বস্তিতে অনুপ্রবেশ করা চাই। সেটা তাহলেই সম্ভব, যদি একটা সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো থাকে, একটা সৎ রাজনৈতিক যন্ত্র থাকে, আর থাকে এমন-এক সরকার যে ধরতে পারবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে কোন্‌টা মৌলিক সমস্যা আর কোন্‌টা ওপরচালাকি। কে জানে হয়তো পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারেও সফল হবার জন্য ঠিক এই জিনিসগুলিই দরকার।

চীনের রাস্তা আজ আমাদের কাছে বন্ধ। চীনেও এখন জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রচার চলছে, সম্ভবত আমাদের তুলনায় বেশি ফলও পেয়েছে তারা; যতদূর খবর পাওয়া গেছে গত কয়েক বছরে চীনের মোট জন্মহার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। রগ্‌রগে দেয়াললিপি সেখানে না-থাকলেও নিঃশব্দে, মানুষকে বোঝানোর মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে, নৈতিক ব্যবহার ও সামাজিক শৃঙ্খলার অনুশীলনের সাহায্যে, রাজ-

নৈতিক নেতা ও প্রশাসকরা তরুণ-তরুণীদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। চীনেও মেয়েদের জন্য গর্ভনিরোধক বড়ি এবং পুরুষদের জন্য কণ্ডোম বিতরণ করা হয়, কিন্তু তাই নিয়ে এভাবে ঢাক পেটানো হয় না। গল্প আছে, জনৈক মার্কিন জনবিজ্ঞানী কিছুদিন আগে চীনে বেড়াতে গিয়ে কোনো-এক সমাজসেবককে জিগ্যেস করেন, অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে ঐ বড়ি বিতরণ করা হয় কিনা। বিস্মিত জবাব আসে, কিন্তু তারা তা দিয়ে কী করবে। এই জবাবের মধ্যে যে-নৈতিক ও সামাজিক বোধের ইঙ্গিত আছে, তা বোধহয় আমাদের চিন্তারও অগম্য। কিন্তু তাহলেও নাসবন্দী সংক্রান্ত দেয়াললিপির অশ্লীলতা আমাদের কেন সহ্য করতে হবে, তার কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমন-কি আমরাও আরেকটু ভদ্রতা প্রত্যাশা করতে পারি।

৩২

এ-পথে আমি যে গেছি বার-বার

এ-সব আগেও অনেকবার হয়ে গেছে। খরিফ শস্যের রেকর্ড উৎপাদন দুনিয়ার কাছে জাহির করতে গিয়ে মন্ত্রীদের মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে। নয়াদিল্লির সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীরা পরস্পরের পিঠ চাপড়ালেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন এবং আলোচনার মাধ্যমে শস্যসংগ্রহের দর শতকরা ত্রিশ ভাগ বেড়ে গেল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রসংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। রবিশস্যের মরশুমে যে-বিপৎপাত ঘটেছিল রাজনৈতিক নেতারা সম্ভবত তার থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁদের কাজের ধারা তাঁরা সংশোধন করেছেন, শূন্যগর্ভ মতাদর্শ-প্রচারের মেঠোপথে না-গিয়ে, খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ের আমূল অধিগ্রহণের প্রসঙ্গ না-তুলে, এই মরশুমে ব্যবসায়ী ও বড়ো চাষীদের সামনে উচ্চতর সংগ্রহমূল্যের টোপ ঝুলিয়ে রাখাই হবে আমাদের নীতি। মন্ত্রীদের মুখের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে তৈলাক্ত আত্মতুষ্টির ক্ষরণ লক্ষণীয়; খরিফ শস্যের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য সব তৈরি। ঢাকঢোলের শব্দে আকাশ ফাটছে। চাল সংগ্রহ করা হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ টনের কম নয়; অন্য মোটা শস্য এই প্রথম অন্যূন ১৫ লক্ষ টন সংগ্রহ করার দৃঢ় প্রচেষ্টা করা হবে। এমন-কি ডিসেম্বর পর্যন্তও কৃষিভবন এই আস্থা প্রকাশ করেছিল, যে চাল ও অন্যান্য মোটা শস্যের ক্ষেত্রে আদৎ সংগ্রহ লক্ষ্যকেও ছাড়িয়ে যাবে।

কিন্তু এ-সব আগেই বহুবার—বার-বার হয়ে গেছে। খরিফ সংগ্রহের সবচেয়ে জমাট মরশুম প্রায় অর্ধেক শেষ। চাল সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র আঠারো লক্ষ টন; যে-সব মোটা শস্য গরিবের খাদ্য, সেগুলির ক্ষেত্রে কাজের গতি আরো হতাশাব্যঞ্জক। চাল সবচেয়ে বেশী সংগৃহীত হয়েছে

পঞ্জাব ও হরিয়ানায়, যেখানে ঐ শস্য খাওয়া হয় কম, এবং ফসলের অধিকাংশ রপ্তানি করা হয়। সংগ্রহমূল্য খোলা হাতে বাড়িয়ে দেওয়ায় বড়ো চাষী ও ব্যবসায়ীরা খুব খুশী, কারণ ঐ মূল্য স্থানীয় বাজারে যে-দর পাওয়া যেত তার চাইতে ঢের বেশি। অন্যদিকে যে-সব রাজ্যে ধানের চাষ চিরাচরিত ব্যাপার, সেখানে কিন্তু সরকারি সংগ্রহমূল্যের মোটা বৃদ্ধির দরুন কোনো তফাৎই দেখা যাচ্ছে না। এই ধরনের বেশির ভাগ রাজ্যেই সংগ্রহের হার গত বছরের চাইতেও নিচু। বাজারদর এক বছরের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ বেড়েছে, সংগ্রহমূল্যও বেড়েছে এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ বাজারদরের সঙ্গে সরকারি দরের আপেক্ষিক তফাৎ কমে এসেছে। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? বড়ো চাষী এবং ব্যবসায়ীরা তো নিরেট বোকা নয়; শস্য আটকে রেখে এবং তারপর বেসরকারি ক্রেতার কাছে তা বেচে তারা যদি দ্বিগুণ মুনাফা লুটতে পারে, তাহলে সরকারি প্রতিনিধির হাতে মজুত শস্য স্বেচ্ছায় কে তুলে দেবে, বিশেষত সরকারই যেখানে এদের ঋণ পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে মজুতদারিকে একটা নিখরচার উদ্যোগে পরিণত করেছে?

এই কারণেই দেশে উৎপাদন যখন গত দশ বছরে কাগজে-কলমে শতকরা চল্লিশ ভাগ বেড়েছে, তখনও সংগ্রহের মাত্রা কিন্তু মহিমান্বিত স্থাবরতায় দাঁড়িয়ে; বরাবরই তার পরিমাণ ছিল ত্রিশ লক্ষ টনের কাছা-কাছি। কেবল গত বছর প্রধানমন্ত্রীর মহান নেত্রীত্বে জাতি তার অমোঘ আস্থা প্রকাশ করার পরেই তা হঠাৎ দশ লক্ষ টনে নেমে যায়। এ বছর রেকর্ড ফলন হওয়া সত্ত্বেও, যে-হারে কাজকর্ম এগোচ্ছে তাতে মনে হয় এ-বছরেও সংগ্রহের মাত্রা পঁচিশ লক্ষ টনের বেশি হবে না। দুর্ভিক্ষের আঁচ লাগা ১৯৬৫-৬৬ আর ১৯৬৬-৬৭ সালেও সংগ্রহের পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি ছিল, এ-কথাটা বার-বার বলতে বলতে পচে গেছে। আর অন্য মোটা শস্যের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো; এগুলো আদৌ সংগ্রহ করার ঝামেলায় গিয়ে দরকার কী, যদি গরিবের প্রয়োজন না মেটে? গরিব বাঁচলেই বা কী, মরলেই বা কী।

সত্যি কথা বলতে গেলে, উৎপাদন বা মূল্যহারের সঙ্গে সংগ্রহের

কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ একপেশে। টাকা খরচ করা হয় সেচের সুযোগসুবিধা বাড়ানোর জন্য, টাকা খরচ করা হয় বড়ো চাষীদের বেশি উৎপাদনক্ষম বীজ জোগান দিতে, টাকা ঢালা হয় নিয়মিতভাবে কীটনাশকের আমদানি অব্যাহত রাখার স্বার্থে, দুর্লভ বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দামি সার আসে, কিন্তু ভূমিসংস্কার চলে ঢিমে তেতালায়, আকাট বিশেষজ্ঞের দল যদি ভূসম্পত্তির ওপর শুল্কের হার বাড়ানোর প্রস্তাব দেয় কিংবা জমি সংক্রান্ত নথিপত্রগুলির হালফিল হিসাব দাবি করে, তাহলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেই চলে। উৎপাদনের আসল খরচ সংক্রান্ত তথ্যগুলিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে শস্যের সংগ্রহমূল্য অসংগতভাবে বাড়ানো হয়। এর ফলেই বড়ো চাষীরা ফলন বাড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু কিসের জন্য? এই বাড়তি ফসলের একটুও রাজ্য তার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে না। না তাতে উপকৃত হয় ন্যায্যমূল্যের বণ্টনব্যবস্থা, না তাতে ক্ষুধা মেটে গ্রামের দরিদ্র লোকের। বরং উল্টোটাই দেখা যায়। সরকার মূল্যের মাত্রা বাড়ানোর ফলে সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধির একটা ঝোঁক সৃষ্টি হয়, বাজারদরও সংগতি রক্ষার জন্য ওপরের দিকে উঠতে থাকে; গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র লোকের বেতন বা আয় যদি বাজারদরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না-বাড়ে তাহলে ঐ-সব এলাকায় দুরবস্থা ঘনীভূত হয়। তাছাড়া এই দরিদ্র দেশে খাদ্যশস্যের দামই প্রধানত জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে, ফলে মূল্যবৃদ্ধি সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। কলাকৈবল্যবাদের সনাতন সূত্রটির এর চেয়ে লাগসই উদাহরণ কমই আছে: উৎপাদন বাড়াতে হবে উৎপাদন বৃদ্ধির খাতিরেই, সংগ্রহমূল্য বাড়াতে হবে বাড়ানোর জন্যই; কেউ যেন ভেবে না-বসে যে এর কোনোটার ফলে সংগ্রহের হার বাড়বে, অথবা ঐ ধরনের কোনো স্থূল জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ হবে।

এ-সব আগে অনেকবার—বার-বার হয়ে গেছে। আগামী জুলাই আগস্ট মাসে সরকারি বণ্টনব্যবস্থা আরেক সংকটের সম্মুখীন হবে। প্রতি বছরে মূল্যবৃদ্ধি এবং সরকারি সূত্র থেকে ঢালাও ঋণের সম্ভাবনা

বাড়ার সঙ্গে ধনী চাষী ও ব্যবসায়ীদের মজুত করার ক্ষমতা আরো বেশি হবে, সেইসঙ্গে বাজারে খাদ্যশস্যের লভ্যতা হ্রাস পাবে এবং খেতমজুর ও ছোটো চাষী—যাদের আকালের মাসগুলিতে বাজার থেকে কিনে খেতে হয়, তারা অনশনের কিনারায় এসে দাঁড়াবে। আগামী জুলাই, আগস্ট মাসে খাদ্যের আশায় তারা শহরের পথে পাড়ি দেবে। রবিশস্যের মোট পরিমাণ বা সংগ্রহ যতই কেন না হয়ে থাকুক আরেকটি সংকট ঘনিয়ে আসবে। সুতরাং আবার একটি সরকারি প্রতিনিধিদল জরুরি পরিস্থিতির পটভূমিকায় খাদ্যশস্য আমদানির বিষয়ে কথাবার্তা বলতে রাশিয়ান, ক্যানাডিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে দৌড়বে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নতুন অর্থ করা হবে। মাথাপিছু খাদ্যশস্যের লভ্যতা বাড়বে, কিন্তু তাই বলে কি আমদানির ওপর প্রতিটি মানুষের নির্ভরতা হ্রাস পাবে? তা মোটেই নয়। ভারতীয় প্রথায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা মানেই স্বাবলম্বন নয়। দেশে যতই বেশি খাদ্যশস্যের ফলন হবে, ততই সরকারি বণ্টনব্যবস্থা চালু রাখার জন্য আমরা অন্যদের ওপর আরো বেশি-বেশি করে নির্ভর করব।

দেশে যতক্ষণ খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে, সরকারের ঘোষিত মূল্য যাই হোক-না কেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তার অন্তত সামান্য অংশও অধিগ্রহণ করা অসম্ভব নয়, এমন-কি শতকরা দশ ভাগ বা তার কম হলেও চলে। কিন্তু তা করতে গেলে জাতীয় স্তরে অনেক বেশি শৃঙ্খলার প্রয়োজন। যথা, শস্যের মালিক, ব্যবসায়ী, মিলমালিক প্রভৃতির ওপর কর বসাতে হবে, এবং তা আদায় করতে হবে। এলাকায়-এলাকায় কর্ডন করে দিতে হবে, তালুক ও জেলার সীমানা দিয়ে শস্য পাচার বন্ধ করতে হবে, মুনাফাবাজির বদনাম আছে এমন লোককে ঋণ দেওয়া চলবে না, পার্টির লোক যদি কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধি হয় বা অপরাধ-জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকে তাদের প্রতি আনুকূল্য দেখানো বন্ধ করতে হবে। রেখে-ঢেকে বলে আর লাভ কী? ইদানীংকালে প্রতি বছর এই শৃঙ্খলার অবক্ষয় ঘটেছে। যেখানে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং নির্ভর লুটেরাবৃত্তি, সেখানে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা কার্যকরী করাই মুশকিল; কারণ

সেখানে সমস্ত সরকারি যন্ত্রটিই ধনী চাষী ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকলের কাছে এক কল্পতরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ। যে-মুহূর্তে প্রশাসন উপকৃত শ্রেণীগুলির কাছ থেকে কিছু প্রতিদান চায় অমনি তারা খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। কে না জানে, হালে কংগ্রেস পার্টির চরিত্র আমূল বদলে গেছে। নীতিগত চিন্তাভাবনার ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে বাকি নেই। সব সময়েই এটা ছিল ঘুষখোরের পার্টি, কিন্তু দু-কান কাটা নির্লজ্জতাটা নতুন। এই পার্টির সদস্য সদস্যারা, অথবা যারা সমর্থক, তারা সবাই বুঝে নিয়েছে, সরকারের অস্তিত্বই তাদের তুষ্টিবিধান করার জন্য। এই পরিবেশে বাধ্যতামূলক লেভি বা ঐ জাতীয় ব্যবস্থার কথা উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র। অতএব খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারটা তার নিজের মতে চলতে থাকে, সমঝদার লোকে বলবে এটা ফরাশি পদ্ধতিতে 'ইণ্ডিকেটিভ প্ল্যানিং', অর্থাৎ সরকারের দিক থেকে সরাসরি 'উদ্যোগের সংকোচন' করে 'খবরদারি যোজনা'র একটা উদাহরণ।

অন্যেরা বলবে, ঘটনাটা তা নয়। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কর্মীদের প্রসঙ্গে সরকার যে-দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে তাতে কি আগের অভিযোগ নাকচ হয়ে যায় না? কর্তৃপক্ষ অনমনীয়; কর্মীদের ওপর লক-আউট তুলে নেওয়া হয়নি; ইউনিয়নগুলিকে কোনোরকম অনুগ্রহ করা হয়নি; বেশির ভাগ কর্মচারী মাথা নিচু করে আবার কাজে যোগ দিচ্ছে, এই অসাধারণ ব্যাপারও আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানেও নীতিনির্ধারণের মাপকাঠি ছিল একদিকে ঐ কর্মীদের—অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের শ্রেণীচরিত্র। কর্মীদের তথাকথিত আলস্য, অকর্মণ্যতার ভুক্তভোগী হল সমাজের ওপরতলার মানুষ—ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, বয়োজ্যেষ্ঠ প্রশাসক এবং সম্পন্ন পেশাদার লোক। কর্মীরা গো-স্লো আন্দোলন চালানোর সময় বিমানঘাঁটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকা পড়ে গিয়ে তারা চড়া মেজাজ দেখিয়েছে; তাদের কর্মসূচি ওলটপালট, মধ্যাহ্ন-ভোজ বা সায়াহ্নভোজের নিমন্ত্রণ বানচাল, অন্য শহর থেকে তাদের ফেরার অপেক্ষায় তাদের স্ত্রীরা দীর্ঘ এবং কষ্টকর সময় কাটিয়েছে, ডুন বা উডস্টক কিংবা মেয়োতে তাদের বাচ্চাদের মাত্র এক মাসের ছুটি নয়-ছয়

হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে যে-প্রচার চালানো হচ্ছে তা সত্ত্বেও বিমান-সংস্থাগুলিতে উচ্চবেতনের কর্মীর সংখ্যা খুবই অল্প, বেশির ভাগ কর্মীই কম মাইনের কেরানি, টেকনিশিয়ান বা পোর্টার। সরকার তাদের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে, তার সমর্থক যে-শ্রেণী, তাদেরই খুশি করেছে। এখন তাদের মালপত্রের জন্য পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হবে না, ফ্লাইটের জন্য অনির্দিষ্টকাল হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে না। শৃঙ্খলারই জিৎ; কিন্তু সুনির্দিষ্ট কারণবশত এ-ধরনের শৃঙ্খলা চালু করার কোনো কথাই ওঠে না যখন খাদ্যসংগ্রহে গলতি ঘটতে থাকে, আর গরিব মানুষকে উপোস দিতে হয়। যারা পায়ের তলায় আছে তাদের লাথি মারো, জাতভাইরা দুধে-ভাতে থাক। সাপ্তাহিক রেশনের আশায় হাঁ করে বসে থাকাটা স্বাভাবিক, তার জন্য তেড়ে ওঠার কী দরকার? কিন্তু প্লেন থেকে লটবহর নামাতে দেরি হওয়া অসহ্য, তার সমাধান চাই। আগের কাজ আগে। জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ণয় কি আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির প্রথম কথা নয়?

৩৩

বছরের সেরা ভোজবাজি

এই মরশুমের প্রধান প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার জন্য কোনো ভণিতার প্রয়োজন নেই, তবু আসুন আমরা এবার সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে তাকাই, জাতীয় স্তরে খাদ্যশস্য সংগ্রহের সমস্যা থেকে এই রাজ্যের দুর্দশায় আসা যাক। বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গে ধানের ফলন হয়েছে অভূতপূর্ব : বিজয়গর্বে জনসাধারণকে জানানো হয়েছে ফসলের পরিমাণ সত্তর লক্ষ টন। গত দশ বছরে রাজ্যে ধানের ফলনের পরিমাণ বেশ ওঠানামা করেছে : ১৯৬৪-৬৫তে ছিল ৫৮ লক্ষ টন ; ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ এই দুই খরার বছরে নেমে এসেছিল যথাক্রমে ৪৯ লক্ষ, ও ৪৮ লক্ষ টনে ; আবার ১৯৬৮-৬৯ সালে একলাফে হয়েছিল ৬২ লক্ষ টন ; তার পরের হিসাব ১৯৬৯-৭০এ ৬৪ লক্ষ, ১৯৭০-৭১এ ৬১ লক্ষ, ১৯৭১-৭২এ ৬৫ লক্ষ এবং ১৯৭২-৭৩এ ৫৭ লক্ষ টন। এখন এই ১৯৭৩-৭৪এর মরশুমে ফলন ৭০ লক্ষ টন পরিমাণের মহৎ চূড়ায় পৌঁচেছে। ফলনের সঙ্গে কিন্তু শস্যসংগ্রহের অনুপাতের কোনোই সংযোগ নেই। ১৯৬৪-৬৫ সালে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩৩৫,০০০ টন ; ১৯৬৫-৬৬ সালে খরা সত্ত্বেও প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর শিশুসুলভ সারল্যে সেটাকে ঠেলে তুলেছিলেন ৫৮৪,০০০ টনে। পরের বছর কিন্তু সংগ্রহের পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১২৩,০০০ টন, কিন্তু ১৯৬৭-৬৮তে আবার ২৬৫,০০০ টনে পৌঁছায়। মূলত যুক্তফ্রণ্টের প্রশাসনিক প্রচেষ্টার ফলে ধানের সংগ্রহ উঠেছিল ১৯৬৮-৬৯ সালে ৪৩৪,০০০ এবং ১৯৬৯-৭০এ ৪১১,০০০ টন পর্যন্ত। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে আবারও তা ১৯৭০-৭১ সালে ২৬৬,০০০ টন এবং পরের বছরে ২৫০,০০০ টনে নেমে যায়। ১৯৭২-৭৩এ যখন কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসীন এবং

বলা হচ্ছিল যে রাজনৈতিক স্থিরতা ফিরে এসেছে, আগের বছরের চাইতে সংগ্রহ ১০০,০০০ টন কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১৫০,০০০ টন। বর্তমান বছরে রেকর্ড ফলন সত্ত্বেও জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে ৬০,০০০ টনেরও কম। মরশুম শেষ হয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে এখন একমাত্র প্রশ্ন এটাই, যে এবারে কি মোট সংগ্রহ তাহলে ১৯৬৬-৬৭ সালের চাইতেও কম হবে? গত দশকের মধ্যে সর্বাধিক ফলনের বছর দেখা যাচ্ছে সর্বনিম্ন সংগ্রহের বছরও হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মরশুম শুরু হবার আগেই রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল ৫০০,০০০ টন ধান। অর্থাৎ মোট উৎপাদনের শতকরা সাত ভাগ সংগ্রহ করা হবে। ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে কিছু-কিছু আনাড়ি লোক তখন বলেছিল, যে লক্ষ্যটা বড়োই নিচু, মোট উৎপাদনের শতকরা দশ ভাগ অন্তত রাজ্যসরকারের হাতে থাকা উচিত। সেই সব সরল জল্পনার দিন শিগগিরই কেটে গিয়েছিল। ধানের বেশির ভাগটাই কাটা হয়ে গেছে। কেনাবেচার সবচাইতে রমরমে সময় শেষ। প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখা যায় কর্তৃপক্ষ কর্ডনিং-এর জন্য এবং মজুতদারি প্রতিরোধ করার জন্য নতুন-নতুন উপায় উদ্ভাবন করছেন। কিন্তু সবটাই ভোজবাজি। চিড়িয়া উড়ে গেছে; সংগ্রহের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছনোর মতো সময়ও আজ আর নেই।

মোট লক্ষ্য যদি হয় ৫০০,০০০ টন, তার মধ্যে চালকলগুলির দেয় অংশ ৩৬০,০০০ টন; বাকিটা বড়ো চাষীদের ওপর লেভি বসিয়ে আদায় করার কথা ছিল। গত সপ্তাহ পর্যন্ত চালকলগুলি সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে মাত্র ২০,০০০ টন। গ্রামের দিকে চাল বেচাকেনার কেন্দ্রগুলিতে গেলে দেখা যাবে, কলগুলিতে কোনো কাজ হচ্ছে না। শুনবেন, তাদের এবার বিক্রি নেই; ধান ও চালের সংগ্রহমূল্য যদিও অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু বাজারদরের তুলনায় তা শতকরা ২৫ বা ৩০ ভাগ কম; কাজেই চালকলগুলিতে কেউ ধান আনতে চায় না; ধান যায় অসংখ্য ধান-ভানিয়েদের কাছে, অথবা বাড়িতে-বাড়িতে ঢেঁকিতে ছাঁটা হয়। এটা অবশ্য একদিকের কাহিনী; অন্যদিকে আবার

এও শোনা যায় যে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায়, চালকলগুলি বেআইনিভাবে রাতের অন্ধকারেও কাজ করে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পরিস্থিতির কথা ভাবুন। ফুড কর্পোরেশনের প্রতিনিধি অসহায়, বেগড়বাঁই করতে গেলে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। চালকল-গুলির কাছ থেকেই সে কিছু জোগাড় করতে পারছে না, সেখানে বড়ো জোতদারদের কাছ থেকে লেভি আদায় করা তো দূরের কথা। আর যাদের লেভি দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা ভাগচাষীদের পিষেই আরো-কিছু বাড়তি ধানের সংস্থান করে নিচ্ছে। অবস্থাটা উদ্ভট। আপনি তো চেয়েছিলেন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ; সেটা এসে গেছে ; গ্রামের পর গ্রাম থেকে যত গণ্ডগোলের গোড়া ঐ বামপন্থীদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে ; ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুরদের টুঁ শব্দটি করবার জো নেই ; ক্ষমতা কংগ্রেস দলের কুক্ষিগত। কিন্তু এত সবেও কোনো লাভ হচ্ছে না ; সংগ্রহ চলছে গা-ছাড়াভাবে। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি কিছু আছে। এই তো সবে জানুয়ারি, এখনই রাজ্যের অনেক এলাকায় সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা বিপন্ন ; টানাটানির মাসগুলোতে হয়তো তা একেবারেই ভেঙে পড়বে।

যা ঘটেছে, তা স্বভাবতই পশ্চাৎপদতা সৃষ্টি করে। সংগ্রহের পরিমাণ সামান্য, কেন্দ্র থেকে খাদ্যের জোগান আসে অনিয়মিতভাবে, কাজেই লোকে বলছে সরকারি বিতরণব্যবস্থা ভেঙে পড়ল বলে। কিন্তু আবার ঠিক সেই কারণেই বড়ো চাষী, ছোটো চাষী, বড়ো ব্যবসায়ী, ছোটো ব্যবসায়ী, শহরের গৃহিণী, গ্রামের চাষী-বৌ—এক কথায় সবাই খাবার মজুত করতে সচেষ্ট। গ্রামের দিকে দরিদ্রতম মানুষও ঘটিবাটি বেচতে শুরু করেছে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য নগদ টাকায় কিছুটা খাদ্যশস্য যাতে কিনে রাখতে পারে। শহরে কেরানিরা একই কারণে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ভাঙতে শুরু করেছে। মজুত করো, মজুত করো, সামনে আকাল, সরকার তো তখন এসে বাঁচাবে না, কাজেই যেটুকু পারো সংস্থান করে রাখো। এই ব্যাধিতে প্রায় সবাইকে ধরেছে, ফলে বাজারে দাম চড়চড় করে বেড়ে যায়, সংগ্রহের কাজ আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটা

অস্পষ্ট ভয় হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা আতঙ্কে পরিণত হয়, আতঙ্ক অনিবার্য সর্বনাশের রূপ ধরে।

গ্রামের দিকে কংগ্রেস দলের শ্রেণীচরিত্রটা কেমন, সে-প্রশ্ন এই পরিস্থিতিতে এড়ানো যায় না। ধনী কৃষক ও ব্যবসায়ীরা চিরদিন এই দলের প্রাণস্বরূপ; বামপন্থী দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তারা গেছে; সেই ভয়াল রাত্রি কেটে গিয়ে আজ দিনের উজ্জ্বলতা দেখা যাচ্ছে, কিছুদিন তারা এই মুক্তবায়ু সেবন করে নিক। তাদের মজুত শস্য দিয়ে দিতে বলাটা অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন হবে। সংগ্রহমূল্য বাড়ানো হয়েছে ঠিকই; কিন্তু বাজারদরও তো একলাফে অনেকটাই বেড়ে গেছে। এটাও ঠিক যে বাজারদর বেড়ে যাওয়ার পুরো দায়িত্ব জোতদার ও ব্যবসায়ীদের নয়; সরকারের নানা কাজের ফলেও মূল্যবৃদ্ধি মদৎ পেয়েছে। অবশ্য সরকার তো ওদেরই; কাজেই ওদের মুনাফার হার বাড়ানোর জন্য এই সরকার সত্যবদ্ধ আছে। তারা প্রশ্ন করতেই পারেঃ তাদেরই নিজস্ব সরকার কেন তাদের বাধ্য করবে নামমাত্র দরে ফুড কর্পোরেশনের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে, যেখানে খোলাবাজারে শতকরা চল্লিশ বা পঞ্চাশ ভাগ বেশি দাম তারা পেতে পারে? তাদের ওপর জবরদস্তি করতে যাওয়াটা কংগ্রেসের চরিত্রবিরোধী কাজ হবে। কংগ্রেস আছে বিত্তবান্‌কে রক্ষা করার জন্য; ধোঁয়াটে বামপন্থী বুলি আউড়ে ঐ দলের মৌলিক শ্রেণীচরিত্রকে ব্যাহত হতে দেওয়া চলবে না।

অবশ্য এটা এখন একটা সর্বজনবিদিত সত্য, যে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ধনী চাষী ও ব্যবসায়ীদের চটানো খুবই কঠিন। তবু গ্রামাঞ্চলে আরো একটা জিনিস ঘটছে, যার ফলে কঠোর হাতে সংগ্রহসূচি চালু করা খুব কঠিন। যে-বেকার তরুণদের সাহায্য নিয়ে এ-রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে এসেছে, তারা অবহেলার যোগ্য নয়। তারাই আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকদের ছত্রছায়ায় অপরাধ জগতের শক্তিগুলির সঙ্গে মিলেমিশে বামপন্থীদের তাদের পুরোনো ঘাঁটিগুলো থেকে উৎখাত করে। দু-বছর আগে তাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলঃ রাজ্যে কংগ্রেসশাসন ফিরে এলে দুধ ও মধুর স্রোত বইবে, শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত হবে, কৃষির

শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, নানা সুযোগ বহুগুণ বেড়ে যাবে, যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছে ব্যাংক থেকে তাদের অপরিমিত ঋণ দেওয়া হবে, চাকুরি এবং আয়ের অন্যান্য পন্থা বাড়ানোর বহুবিধ পরিকল্পনা দেখা দেবে, এক-কথায় বাংলা আবার সোনার বাংলা হবে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বামপন্থীরা খতম হবার পরে যে-কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসে, তাদের কার্যকলাপ হয়েছে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। যে-তরুণেরা কাজ এবং সচ্ছলতার আশ্বাস পেয়েছিল, তারা এখন দেখছে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। যারা মন্ত্রীদের নিকট লোক অথবা দলের টাকাপয়সা যারা নাড়াচাড়া করেছে, সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কপাল খুলেছে। কিন্তু বেশির ভাগই থেকেছে বঞ্চিত। ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, কংগ্রেসের যুব গোষ্ঠী আজ তীব্রভাবে বহুধা বিভক্ত। বোমা-বন্দুক বেরিয়ে পড়েছে ; প্রতিদিন আভ্যন্তরীণ মারামারি চলছে, খুনও ঘটছে দু-একটা। বিবাদ মেটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ভগ্নাশ্বাস কর্মীদের ক্রোধের জের সামলাতে নেতাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

তাদের মধ্যে অনেকেই আজ যে যার স্বার্থ সামলানোর ভার নিয়েছে। এ-রাজ্যে শস্য সংগ্রহ সফল হতে পারে না, কারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসা যে-তরুণরা কংগ্রেস দলের ঝটিকাবাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল, তাদের হাতেই আবার চালের রাজ্যজোড়া চোরাকারবার। সম্পন্ন গ্রাম থেকে হাভাতে গ্রামান্তরে, উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী এলাকাগুলি থেকে অনটনের এলাকায়, গ্রামাঞ্চল থেকে স্ট্যাটুটারি রেশনিং-এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে, রাজ্যের সীমান্ত থেকে বিহারের জামশেদপুর, সিন্ধ্রি, বারৌনি প্রভৃতি স্বতন্ত্র, উচ্চমূল্যের এলাকায় চাল পাচার হচ্ছে, এবং তা নিয়ন্ত্রণ করছে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা, হয় স্বাধীনভাবে, নয় আরো উঁচুমহলের নির্দেশে। ক'মাস আগে ঢাকঢোল বাজিয়ে বলা হয়েছিল, পঞ্চাশ হাজার যুব কংগ্রেসীকে নিয়োগ করা হবে সরকারি প্রতিনিধিদের শস্যসংগ্রহের কাজে সাহায্য করার জন্য। মোটামুটি হিসেবে বলা যায় বর্তমানে পঞ্চাশ হাজার কংগ্রেসকর্মীই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে ; তাদের কাজ কিন্তু সংগ্রহের কাজে বাধা দেওয়া। তাদের

প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত, নয়তো কোনো একটি বিশেষ পুলিশ থানার অন্তর্গত এলাকায় চোরাই চালের অবাধ গতিবিধিতে সাহায্য করতে চুক্তিবদ্ধ। শর্তগুলি নাকি আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। দশ মাইল পর্যন্ত দূরত্বের মধ্যে প্রতি কুইন্টাল চালের অবাধ চালানে সাহায্য করার জন্য তোলা দিতে হয় একজন কংগ্রেস কর্মীকে সাত টাকা ও পুলিশি সাঙ্গোপাঙ্গদের তিন টাকা করে। পুরোটাই একটা অদৃশ্য মাকড়শার জালের বিপুল অংশ, তার নিজস্ব নিয়মাবলি আছে, কার্যকরী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটা ধারায় এগোয়, সাংকেতিক ব্যবস্থাও পুরোদস্তুর বর্তমান। উপরি খরচ এবং প্রয়োগকালীন অন্যান্য ব্যয় মোট লাভের মধ্যে থেকেই উঠে আসে। কলকাতার ঘেরাও এলাকার মধ্যে যখন এক কুইন্টাল চাল চল্লিশ মাইলের বেশি দূরত্ব থেকে চালান হয়ে আসে, তখন যে-গ্রাম থেকে ঐ চাল এসেছে সেখানে যা বাজারদর ছিল তার ওপর স্পষ্টতই আরো চল্লিশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

পালা করে এই চোরাকারবার চলতে থাকে, কখনো মানুষের মাথায়, কখনো সাইকেলে, নৌকায়, ট্রেনে, এমন-কি ক্বচিৎ-কখনো ট্রাকে করেও। এটা একটা নিয়মিত, পুরোদস্তুর কার্যক্রম, আর কোনো-কোনো দিক থেকে সরকারি বণ্টনব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ। আইনত যে-সব জায়গায় স্ট্যাটুটারি রেশনিং বর্তমান, যেমন কলকাতা বা দুর্গাপুর, সেখানেও এই চোরাই রাস্তায় যা চাল আসে তা কোনো কোনো সপ্তাহে রেশনের দোকানের জোগানকে পরিমাণে ছাড়িয়ে যায়। ক্রেতাদের অবশ্যই এই চাল দু-তিনগুণ দাম দিয়ে কিনতে হয়। তবু বর্তমান টানাটানি এবং পাঁচ-ছ'মাসের মাথায় দুর্ভিক্ষের আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদার অভাব ঘটে না। যে-সব অঞ্চলে স্ট্যাটুটারি রেশনিং চালু নেই, এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ছে, সেখানে চোরাকারবারিদের দাক্ষিণ্যের ওপরেই নির্ভর করছে লোকের রোজকার খাওয়া।

এই সংকটময় ভারসাম্যকে নড়ানোর সাহস কারো নেই। তবু

কোথাও কোনো-একটা কিছু টলে পড়বেই ; পশ্চিমবঙ্গের ওপর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চাপানো হয়েছে, বামপন্থীরা ছত্রভঙ্গ ; তবু এর দাম দিতে হবেই। যে-তরুণরা বোমা-বন্দুকের সাহায্যে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছে, তাদের জন্য কাজ না থাকলেও তাদের খুশি রাখতে হবে ; ব্যবসায়ী, ধনী চাষী—এবং সরকার, সবার কাছেই এদের পাওনা বেড়ে উঠেছে। শহর ও মফস্বলের ক্রেতাদেরও নালিশ করার কিছু নেই ; এক অকেজো সরকারের জায়গায় অন্তত এক বিকল্প কর্তৃপক্ষের উদয় হয়েছে। আর যারা কালোবাজারের দরে শস্য কিনে খেতে অক্ষম, তাদের জন্য আছে উপোস করার স্বাধীনতা ; সেটা তো এ-দেশের ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা নয়।

৩৪

যঃ পলায়তে

যঃ পলায়তে, সঃ জীবতি ঃ এই হচ্ছে দেবভাষায় আর্যবচন। মধ্যবিত্ত বাড়ির তরুণরা স্পষ্টতই এই বাণীর কাছে বিকিয়ে আছে। বিদেশ যাবার বিধিনিষেধে দারুণ কড়াকড়ি ঃ একটা পাসপোর্ট পেতেই মাসের পর মাস কেটে যেতে পারে ; বিদেশী রাষ্ট্রগুলো—এককালে যারা মোটামুটি অতিথিবৎসল ছিল, এমন-কি তারা অব্দি—ক্রমে-ক্রমে বজ্র আঁটুনি আরোপ করছে ; যে-সব তরুণ-তরুণী দেশান্তরে যায় বেশির ভাগ সময়েই তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ; কিন্তু তাতেও তারা দমবার পাত্র, বা পাত্রী নয়। এ কেবল নিছক সুদূরের পিয়াসা নয় ঃ এভাবে ঝাঁপ খাবার পেছনে তাদের এমন আগ্রহটা অনেক বেশি গতানুগতিক। তারা তাদের স্বদেশ থেকে পালাতে চায়, পালাতে চায় এ-দেশের আশাহীন দম-আটকানো পরিবেশ থেকে। এই তরুণেরা একটি প্রায়-মরিয়া বেপরোয়া দল, আবেগ-অনুভূতির বাঁধন তাদের ঠেকাতে পারে না, তারা উত্তরাধিকারটা ত্যাগ করতেই চায়। রোজ তাদের দেখতে পাবেন ভিড় করে আছে বিদেশী দূতাবাসগুলোয়, অপমান হজম করছে, তাচ্ছিল্য গায়ে মাখছে না—এমন-কি একেবারে নিচের ধাপের লোকজনদের কাছ থেকেও।

এদের কাঠগড়ায় চাপাতে চান? এদের আত্মসম্মানবোধের অভাবকে খিস্তি করতে চান? চান এদের স্বার্থপরতার জন্য একঘরে করতে? এদের আদর্শহীনতায় আঁৎকে উঠছেন? তবে যে-কোনো সময়েই তো অন্যদের আচরণের বিচার করতে বসাটা একটু বিপজ্জনক কাজ, তত্ত্বকথা আউড়ে বা খোলাখুলি মনের কথা বলে কদাচিৎ নৈতিক প্রশ্নগুলোর

সমাধান মেলে। বেশির ভাগ সময়েই, স্বদেশপ্রেমের নমুনা মনে করায় সেই কবিতাটির কথা—আমি-তোমায়-নিজের-ধরনে-ভালোবাসি-সিনারা। এমন-কি, তরুণদের কেউ-কেউ আবার তর্ক জুড়ে দেবে যে দেশ ছেড়ে গিয়ে তারা বস্তুত দেশের বাকি লোকদের অর্থনৈতিক সমস্যাটা একটু হালকাই করে দিচ্ছে, কর্তৃপক্ষ এখন অন্তত 'তাদের' সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার দায় থেকে বাঁচবেন। এর বিরুদ্ধে পাঁয়তাড়া কষবে অ্যাদ্দিনে মুখস্থ হয়ে-যাওয়া যুক্তিটা : দেশ তার বিরল সংগতির অতখানি অংশ এত বছর ধরে এদের ওপর খরচ করল—এই তরুণ-তরুণীদের খাওয়ানো-পরানো থেকে শুরু করে লেখাপড়া শেখানো অব্দি—এদের তাই দেশ ছেড়ে যাবার কোনো এক্তিয়ার নেই—যে-পুঁজি এদের সর্বাঙ্গে, এদের অস্তিত্বে ওতপ্রোত মেশানো তা নিয়ে এরা কিনা বিদেশের মাটিতে চলে যাচ্ছে! এদের বড়ো করতে, লেখাপড়া শেখাতে খরচ পড়েছে : এদের চলে যেতে দেবার মানেই হল লগ্নীকৃত কিছুটা টাকা পুরোপুরি খুইয়ে বসা, এই গরিবদেশের পক্ষে এই বিলাস মানায় না। দু-পক্ষেই যুক্তি গজাবে জেল্লাদার, গরম-গরম। কোনো হবু-দেশান্তরী, তার এই পালাবার সিদ্ধান্তটার নৈতিক খোঁচগুলোয় খানিকটা বিচলিত বলেই হয়তো কড়ার করে বসবে যে সমাজ তার ওপর যত টাকা খরচ করেছে মোটামুটি তত টাকাই সে বিদেশ থেকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। কিংবা সে হয়তো ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টে খেঁকিয়ে উঠবে : জন্মটা দৈবাধীন, সেখানে তার কী করার আছে, তার দায় দেশের মাটির কাছে নয়, বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কাছে, আর তাকে যদি কোনো বিদেশী গবেষণাগারে বা কারখানায়, দেশের কোনো অসহনীয় ও বিরক্তিকর কর্মক্ষেত্রের বদলে বিপুলতর উপযোগী পরিবেশে কাজ করবার অনুমতি দেয়া হয় সে বরং বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিস্তর অবদান রেখে যেতে পারবে। সে এমনকি প্রচণ্ড যুযুধান হয়ে উঠতে পারে; দেশের যদি তার সম্বন্ধে এতই আগ্রহ, এতই মাথাব্যথা, বেশ, তবে তাকে তার গুণ অনুযায়ী বেতন বা সুযোগসুবিধে দিক—আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী। বেশির ভাগই, অবশ্য, তর্কাতর্কি থেকে দূরে সরে থাকতে চাইবে। তারা

তাদের সিদ্ধান্তকে কোনো যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে চাইবে না অথবা তার ওপর কোনো নীতির জোব্বাও পরাতে চাইবে না। তারা পালায় রুজিরোজগারের ধান্ধায়, কারণ সব অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, বিদেশে জীবন এখনও অনেক সহজ, দুর্নীতি এতটা উগ্রভাবে ছড়িয়ে নেই, আমলা-বাজির চামড়া এখনও এতটা পুরু নয়, আর চাকরিবাকরি এখনও তুলনায় সুপ্রতুল। হতে পারে জীবন সেখানে হয়ে উঠবে একঘেয়ে ও নামগোত্রহীন, হয়তো দেশে থাকলে যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা উত্তেজনার বোধ তাকে ঠেলে চালাত তার অভাব তাকে বিঁধবে, তবে আততি আর হতাশাগুলোও হয়তো এড়ানো যাবে, এড়ানো যাবে হীনতা ও তুচ্ছতার গ্লানি—আর উন্নতির সুযোগের এমন অপ্রতুলতাও সেখানে থাকবে না। সত্যি-তো, একটাই যখন জীবন, তখন তা থেকে যতটুকু জোটে সব নিংড়ে আদায় করে নাও—তাতে যদি নিজের দেশের বেশির ভাগ মানুষ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হয় তাও সই—যারা, বেচারিরা, তোমার মতো অতটা ভাগ্যবান নয়, তারা পালাতে পারেনি।

এর মধ্যে খানিকটা হৃদয়হীনতা আছে। এ-দেশে সম্পদ ও উপার্জন বণ্টনের যে কাঠামো, তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অচলাবস্থায় কেউ-কেউ অন্যদের চেয়ে আরো বেশি ভোগে, কষ্ট পায়। সুশিক্ষা ও পুঁজির বিসদৃশরকম বড়ো ভাগটা যাদের কবলে, তারাই এমন-কি কোনো ক্ষীয়মাণ ব্যবস্থা থেকেও খানিকটা কিছু নিংড়ে নিতে পারে। কোনো বিকাশ না-থাকা সত্ত্বেও তারা আদায় করে নিতে পারে অনেক কিছু—পণ্য ও পৌর সুবিধেগুলো, আর জীবনযাপনের মান, সেই অনুপাতেই অন্যদের পক্ষে কমে যায়, যারা দেখতে পায় তাদের যথার্থ আয় ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে। বাঁচতে যদি চাও, পালাও, এই হল আর্ষ-বচন। কিন্তু গরিবগরবাদের বড়ো অংশটাই বিদেশে পালায় না—পালাতে পারে না। এমনকি পালাতে গেলেও আপনার সংগতি চাই। শুধু যাদের সংগতি আছে—আর 'যোগসূত্র'—তারাই উড়াল দেয়।

কী? তাদের বিরুদ্ধে গর্জে-ওঠা উচিত? আদর্শের অভাব, অবশ্য, কোনো দণ্ডনীয় অপরাধ নয়। আর অবাধ গতিবিধির সুযোগের পূর্ণ

সদ্ব্যবহার করাই তো ব্যবস্থাটার একটা বিঘোষিত গুণ। আদর্শের কামান দাগার আগে নিজের নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে নেওয়াই উচিত। দেশপ্রেম কাউকে গেলানো যায় না—কারু তা থাকে, কারু তা থাকে না। এমন কোনো পাখি-পড়ানো ব্যবস্থা নেই, যেখানে প্রণামী দিয়ে, দেশকে কীভাবে ভালোবাসে তার পাঠগুলো শিখে নেয়া যায়। এ-দেশ আমার গর্ব—এই বোধ থেকেই কেউ দেশপ্রেমের কাছে গিয়ে পৌঁছোয়। এ-দেশে যাদের মধ্যে এ গর্ব ক্রমঅপস্রিয়মাণ তাদের সংখ্যা মোটেই তেমন নগণ্য নয়। এ-রকম কিন্তু চিরকাল ছিল না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এক ধরনের অদার্শনিক নৈরাজ্যবাদকে ডেকে এনেছে। দেশের কৃতিত্বে গর্বের অভাব ঘটে—হয়তো গর্ব করার বিষয়ও ক্বচিৎ জোটে। গর্বের অভাব থেকেই আসে সম্পর্কহীনতার, বিচ্ছিন্নতার বোধ। তরুণরা পালাতে চায়ঃ তাদের কোনো নৈতিক বন্ধন নেই। এখানে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। পালাও, চম্পট দাও, ক্যানাডায় যাবার হিড়িকে যোগ দাও, চেষ্টা করো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার ভিসা জোগাড় করতে, ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে হাতে-পায়ে ধরে জোগাড় করে নাও কাজ করার অনুমতিপত্র আর প্রবেশ-দলিল। কিছু-একটা ব্যবস্থা করো, আর যাও, যাও, পালাও, চম্পট দাও, দেশ থাকুক পড়ে তার দুর্গতির মধ্যে উদ্ধারবিহীন, ভারতে থাকার মানেই হল হতাশার দৈনন্দিন হাড়িকাঠে মাথা গোঁজা, সময় থাকতে পালাও, যতক্ষণ ভিসা আর প্রবেশ-দলিলগুলো তুলনায় সহজে হাতানো যায়।

রোখকে দুনিয়া, আমরা নেমে যেতে চাইঃ মধ্যবিত্ত বাড়ির এই তরুণেরা বলে। তাদের আরেক দল, তারাও দেশের গতিক দেখে সমান অসহিষ্ণু, অন্য পথ বেছে নেয়। তাদের মধ্যে যারা খুন হয় না, জেলে-জেলে পচে। এদের কাউকে—অথবা দু-দলকেই—বিচার করার সাহস হয় কারু? যারা দেশে থেকে যায় আর ন্যায়নীতি আদর্শের জন্যে লড়াই চালিয়ে যায়, তাদের কি যারা পালাচ্ছে, সহজেই ও স্বচ্ছন্দেই পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের চেয়ে বেশি পছন্দ করা উচিত নয়? কিন্তু সেও তো হবে মূল্যবোধের দুই ব্যবস্থার মধ্যে কাকে বেছে নেবেন, নিছক তারই

একটি ব্যায়াম। এক অস্পষ্ট জগৎ এটা, অনির্ণেয়তায় আচ্ছন্ন। অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের হারকে যে প্রায় শূন্যের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে, এই উক্তির সঙ্গে কোনো নৈতিক প্রশ্ন জড়ানো নেই ঃ এটা একটা নির্ভেজাল তথ্য। ফলপ্রসূ কাজের সুযোগ যে প্রায় সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে, 'এটাও আরেকটা তথ্য। দুর্নীতি ঝাড়ে-বংশে বেড়েছে—ক্ষমতার দুর্গে বা তার বাইরে, দুয়েতেই, এ-কথাও সমান নির্জল তথ্য। সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা এতটাই ক্ষয়ে গেছে যে অনেকে তাকে প্রহর ঘোষণার দায়িত্বটাও দিতে চাইবে না, এই কথাটাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, এইসব আশ্বাসের বাইরে, আর কী আছে যাকে কেউ আঁকড়ে ধরতে পারে? বিষাদ আর আস্থার অভাব, কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না, এমন-একটা বোধ ; আদর্শবাদ আর তার অভাব—এই দুয়ের মধ্যে বিভাজন-রেখাটা ঝাপসা হয়ে গেছে—এই অভিজ্ঞতাই তো রোজকার পথ্য। হয়তো কোনো-একদিন সরকারের কাজকর্ম আর জাতির আশা-আকাঙ্খাকে এক করে দেখার একটু বাড়াবাড়িই ছিল। ঠোঁট বেঁকিয়ে কেউ বলবেন, এ-ই হল সমাজতান্ত্রিক বাতেলার উচ্ছিষ্ট। এখন সরকারকে সোজাসুজি চিনে নেওয়া গেছে বলেই অবস্থার সমূহ বিনাশ সব কিছুই সঙ্গে করে টেনে নামিয়েছে অধঃপাতে। দেশটা ভণ্ডে ঠাসা ঃ এই প্রস্তাবে একবাক্যে সবাই হাত তুলে সায় দেবে। দেশটাকে সবলে দখল করে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুচক্রীদের এক বদমায়েশ দল ; এ-কথাটাও আবার সকলের সায় পাবে। দেশে ন্যায়নীতির কোনো বালাই নেই, নেতারাই দেশটার এই হাল করেছে ঃ আবারও সিদ্ধান্তটা সর্ববাদীসম্মত। দেশ আর তোমায় টানে না এখন, তাই সে আর তোমার আনুগত্য দাবি করতে পারে না। পুঞ্জ-পুঞ্জ এই অনৈতিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বেড়ে চলেছে প্রাতিস্বিক অনৈতিকতার ভয়াবহ সমাহার। একে ব্রেন ড্রেন বলতে চান বলুন, একে প্রতিভার দৈবায়ন বলতে চান বলুন ; দেশের মাটিকে ত্যাগ করার এই হিড়িক কিন্তু চলতেই থাকে, আর আপনাকে শাসানো হয়, মশাই, নৈতিক বিচার স্থগিত রাখুন। পি-ফর্ম-এর কড়াকড়ি জোয়ার রোধ করতে পারে না। দেশের নাগাল এড়িয়ে

পালাবার কত বিচিত্র উপায় জানে লোকে। এখানকার সবকিছু থেকেই তারা পালিয়ে যায়।

পালিয়ে যারা যায় তারা একবারও থমকে ভাবে না পালাতে যারা পারেনি সেইসব কোটি-কোটি মানুষের কী হবে—সেই যাদের পড়ে থাকতে হবে পেছনে, আর শাসকশ্রেণীর জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হবে। এই মুহূর্তটি এই মুহূর্তই, অন্যকিছু নয়, আর সবাই যে যার পথ দেখুক, কী ছেলে, কী মেয়ে। যারা পালায়, চম্পট দেয়, তারা শিখে ফেলেছে, যারাই পালায় তারাই বাঁচে। পেছনে যারা পড়ে রইল তাদেরও বেঁচে থাকার সমান অধিকার আছে কি না—এটা এমন এক চিন্তা যা এদের আটকাতে পারে না ; এই নিঃসাড়তা তারা পেয়েছে পরিবেশ থেকেই, আর পরিবেশ মানে দেশ। এই বিশ্বনিন্দাবৃত্তিই তিলে তিলে গড়ে তোলে ভারতীয় ট্র্যাজেডির উপাখ্যান। অতীত বা ভবিষ্যতের দিকে হৃদয় বুঁজে রাখো ঃ এখন, মানে এখন। আরো খারাপ, ঠিক হচ্ছে ভুল আর ভুল হচ্ছে ঠিক, আর চোখে দেখেই কেউ বলে দিতে পারে না কোন্‌টা কি। যে-দিকেই তাকানো যাক-না কেন পরিমাণটা দেখাই যায়। শব্দগুলো থেঁৎলে পিষে এমনভাবে মণ্ড বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তাদের আদি মানেগুলো মিইয়ে গেছে। ডাহা স্বৈরাচার এখন মানবতাবাদের নামে চলে যেতে পারে ; ফাশিস্ত হাবভাব সমাজতন্ত্রের নামে বাহার দেখায় ; গরিবদের ওপর আরেকটা রূঢ় মোচড় তূর্যনাদে ঘোষিত হয় রাজনৈতিক সমতাবাদের দিকে আরেকটা অগ্রসর ধাপ বলে। ফেরেব্বাজদের পুরস্কৃত করা হয় জাতীয় সম্মানে ; সুবিধেবাদকে উন্নীত করা হয়েছে জাতীয় সংহিতায় ; ন্যায়বিচারের যে-ব্যভিচার শুধু কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর সেবায় লাগে, সরকারি মঞ্চ থেকে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হয়, শাসনপ্রক্রিয়াকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে বেঁকেচুরে নেয়াকে বলা হয় মৌলিক অধিকারেরই অপর নাম ; বাইরে থেকে প্রচণ্ড ধার করে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে বিকিয়ে দেয়া হচ্ছে আর এই মহৎ কর্মটিকে বর্ণনা করা হচ্ছে স্বনির্ভরতার দিকে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ বলে। গর্ব গেছে, কারণ এটা নয় যে দেশটা গরিব, এটাও নয়

যে কোনও ক্ষেত্রেই দেশের কোনো কৃতিত্ব জাহির করার নেই, গেছে শুধু এই কারণে যে সে—না, সে নয় বরং তার স্বনির্বাচিত নেতারা—নতুন নীতিবোধের সততার অভাবকে মধ্যমণি বলে তুলে ধরেছে। যে বিশেষ আস্থার সংহিতায় আমরা ভর দিয়েছিলাম অন্তর্ঘাতে তার বিনাশ ঘটানো হয়েছে, আর আশপাশে কোনো বিকল্পও দেখা যাচ্ছে না। সঠিক কেউই জানে না কদ্দিন এই মন্বন্তর চলবে, কিংবা লোকে যেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেই সুড়ঙ্গটাই কারু বাকি জীবনটার সমার্থক কি না। সামাজিক ব্যবহারবিধির কোনো বিশেষ সমন্বয় সূচকই যেহেতু আর দেখা যাচ্ছে না, লোকে যে যার নিজস্ব নীতি তৈরি করে নেয়। যারা দলছুট, পেছিয়েপড়া, সত্যি-বলতে যারা পুরোনোপন্থী, এখনও যোগ দেয় মিছিলে, স্বপ্ন ছ্যাখে, জেলখানায় ভিড় জমায়। অন্য যারা মুক্তপ্রাণ, মহাপ্রাণ, হয় কালোবাজারে টাকা কামায়, মন্ত্রীদের ঘুষ দেয়, সরকারকে কিনে নেয়—আর নয়তো দেশ ছেড়ে চলে যায়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর কার কী পছন্দ তার কোনো মানচিত্র নেই বলে কে মশাই বিচার করবে এদের মধ্যে কোন্ জন সাধুপুরুষ আর কোন্ জন মহাপাপী? ভারতনাট্যের চূড়ান্ত সংঘাতের মুহূর্ত এসে গেছে, মিথ্যা শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়, যা ভুল তা-ই ঠিক, যা ঠিক তা-ই ভুল, শুধু চোখে দেখেই কেউ কি সব কথা বলে দিতে পারে?

৩৫

তথ্য যা বলে

বিশেষণ বাদ দিন, দেখুন তথ্য কী বলে। সন্দেহ নেই যে এই অভাবের মরশুম শেষ হলে কোনো এক ধরনের দুর্ভিক্ষ-তদন্ত-কমিশন বসানো হবে, এবং এ-বছরের বিয়োগান্ত কাহিনীর সবদিকগুলি বিশ্লেষণ করে যথা-সময়ে একটি বিবরণীও পেশ করা হবে। জাতীয় নমুনা পরিদর্শন সংস্থা অনশনে মৃত্যুর জেলাওয়ারি, তালুকওয়ারি ও গ্রামওয়ারি নমুনা সংগ্রহ করে তাই নিয়ে গবেষণা চালাতেও পারে। প্রশ্নাবলির যে-ফর্দ থাকবে তাতে সকলের চমক লেগে যাবে; পরিবারের বিবরণ, তারা কৃষিজীবী না অকৃষিজীবী; তাদের জমি আছে কি নেই, জমি থাকলে তার পরিমাণ কত, ঘটনার আগে তাদের মাথাপিছু খাদ্যশস্য ব্যবহারের মাসিক বা ত্রৈমাসিক হিসাব; পরিবারের স্বত্ব কী কী, তার কোনো জিনিস বিগত সপ্তাহ, পক্ষ এমনকি বিগত তিন মাসের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে তাহলে নগদে বা জিনিসে তার কী দাম পাওয়া গেছে; বিগত সপ্তাহে, মাসে বা তিন মাসের মধ্যে অনশনে মৃত্যু আর ঘটেছিল কিনা, এইসব মৃত্যুর সময়ে ডাক্তারের কোনো লিখিত সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল কিনা; যদি না-নেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ; যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তারটি অ্যালোপ্যাথ না হোমিওপ্যাথ, ডিগ্রিধারী না লাইসেন্সপ্রাপ্ত; মৃত্যু ঘটেছিল কি (ক) খাদ্যের অভাবে, (খ) সুসমঞ্জস খাদ্যের অভাবে না (গ) অন্য অজ্ঞাত কারণে; ঐ গ্রামে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল কিনা, যদি গ্রামে না-থাকে বাসস্থানের ১০ মাইল ১৫ মাইল বা ২০ মাইলের মধ্যে ছিল কিনা, গ্রামে বা তালুকে সরকারি লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল কিনা, না-হয়ে থাকলে

বাসস্থানের ১০, ১৫, ২০ মাইলের মধ্যে কি তা ছিল? আগের সপ্তাহে, মাসে, তিন মাসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চালের দর কত ছিল, গ্রামে বা তালুকে বিগত সপ্তাহে, মাসে, তিন মাসের মধ্যে কাজ পাওয়া যাচ্ছিল কিনা, কাজ থেকে থাকলে গ্রাম ও তালুক এলাকায় পারিশ্রমিকের হার নগদে বা জিনিসে কী রকম ছিল।

তথ্য অতি পবিত্র জিনিস। তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। আমাদের পরিসংখ্যান ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্টগুলির একটি; আমরা তথ্য সংগ্রহ করব বৈ-কি। ইতিমধ্যে মৃত্যুর পূতিগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গরিবদের খাদ্য নেই; তারা শ'য়ে শ'য়ে মারা যাচ্ছে। তারপর যথাসময়ে গাণিতিক তথ্যগুলি হাতে আসবে, এমনই নিখুঁত যে সেগুলি ভুল হতে বাধ্য, তাতে থাকবে বরফ-শীতল সুষমা, চটকদার শূন্যতা, প্রাণহীন উৎকর্ষ।

প্রাণহীন উৎকর্ষ ছাড়া আর কিছুই আমরা পাব না তা থেকে। কারণ ইতিমধ্যে বোধহয় জাতীয় নমুনা পরিদর্শন সংস্থার তদন্তের বিষয়ীভূত হবার জন্যই হুগলির অন্তর্গত ডানকুনি থানার গরলগাছা গ্রামের হরিপদ দলুই তার পাঁচ বছরের ছেলেকে পুকুরে ছুড়ে ফেলেছে; ছেলেটা ডুবে মরেছে; বিগত ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কিছুই খেতে না-পাবার ফলে সে খাবারের জন্য বায়না করছিল। একই জেলার আরামবাগ থানার হরাদিত্য গ্রামের দিনমজুর বিনোদ বারুই, যার পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, মাথা ফাটিয়েছে নিত্যানন্দ মাঝির; সেও দিনমজুর। পরিবারের লোকসংখ্যা ছয়। দুজনেরই বৌ-বাচ্চা সাতদিন ধরে উপোস দিচ্ছিল, একই ঝোপ থেকে মেটে আলু তুলতে গিয়ে আলুতে কম পড়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যে মারামারি বাধে, মারামারি করছিল তারা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো, প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় হিংস্র জানোয়ারের মতো। কোচবিহার জেলার দিনহাটা সাবডিভিশন, গ্রাম খরুভোজ; বত্রিশ বছরের চুনিবালা দাসী তার ঘ্যানঘেনে দু-বছরের মেয়ের গলায় আধ সিদ্ধ বুনো জই-এর শিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। চুনিবালার স্বামী গত সপ্তাহে পুড়ে মরেছে, চুনিবালা শেষ ভাত খেয়েছে

তিন মাস আগে, পাশের গ্রামের অঞ্চল-প্রধান ভোজ দিয়েছিল, সেখানে পাতকুড়োতে গিয়ে। ঐ জেলারই সাহেবগঞ্জ তালুকের কংগ্রেস নেতা হরিশ্চন্দ্র রায়বর্মণ বাড়িতে রান্না করে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে; রান্নার গন্ধে বাড়ির চারপাশে বড়ো বেশি ভিখিরি জড়ো হয় বলে সে চোরের মতো হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার চিনিগ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিধবা কমলরাণী চক্রবর্তী তার কোণার দিকের চালাঘরের ঢেউতোলা টিনের ছাত খুলে ফেলতে ব্যস্ত, সেগুলো বাজারে বিক্রি করলে চল্লিশ টাকা পাবে, তাই দিয়ে দশ কিলো চাল কেনা যাবে। পুরুলিয়া জেলার বীরশা গ্রামের আদিবাসী দিনমজুর টুড়ু সোরেন নগদ পঁয়ত্রিশ টাকায় স্ত্রী রঙ্গিয়া সোরেনকে বেচতে চাইছে, পঁয়ত্রিশ টাকায় আট কেজি খাদ্যশস্য বিক্রি হচ্ছে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সদর হাস-পাতালের সামনে স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর বিরাট ভিড়ঃ আমাদের ফ্রি ওয়ার্ডে থাকতে দিন, তাহলে নিদেনপক্ষে দিনে একবার খেতে পাব, নইলে অন্তত কিছু ভিটামিন দিন; ভিটামিনের ভাণ্ডারও সীমিত, বরাদ্দ বেঁধে দিতে হয়। চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ সাবডিভিশনে গোবর্ধন থানায় গতকাল বারোজন মারা গেছে; পরশু মরেছে ন-জন, আজ বেলা একটা পর্যন্ত সাতজন, চৌকিদাররা টহল দিতে বেরিয়েছে, সন্ধ্যার আগে আরো খবর পাওয়া যাবে। জেলা বাঁকুড়া, থানা রানীবাঁধ, গ্রাম শালহাটি; প্রকাশ মালো বিষ্ণুপুর শহরে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে শুনে বৌ, তিনটি বাচ্চা ও দুটি কুকুর সঙ্গে নিয়ে সেদিকে রওনা হয়; শুধু একটি বাচ্চা ও কুকুরগুলিকে নিয়ে সে যথাস্থানে পৌঁছতে পেরেছিল। বাকিরা রাস্তাতেই মারা যায়। মৃতদেহ আপনার বাঁয়ে, মৃতদেহ আপনার ডাইনে, আপনার সামনেও মৃতদেহ। অবশ্যই কিছু কিছু মৃতদেহ আইনত এখনও জীবিত, ধড়গুলি দুই ঠ্যাঙে ভর দিয়ে ছ্যাঁচড়াতে-ছ্যাঁচড়াতে অথবা হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে যেদিকে খাবারের কিছু আশা আছে, অথবা অন্য কেউ তাদের টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। এদের

নিয়ে মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করবেন না, রাত্রি আসার আগেই এরা মরে যাবে।

বিশেষণ বাদ দিন। কিন্তু তার বদলে আর কীই-বা করার আছে? কোনো একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে আপনি কী আশা করতে পারেন? আপনার জ্ঞাতার্থে সে আরো নামের ফর্দ দিতে পারে, যারা মরেছে তাদের নাম, সপ্তাহের অর্ধেক কাটতে না-কাটতে নিশ্চিত অনশনে যারা মরবে, তাদের নাম। কিন্তু শুধু নামে—বিশেষত গরিব দুর্ভাগা মানুষের নামে—পরিচয়হীনতাই সূচিত হয়। সাড়া জাগানোর মতো নাম নয় সেগুলি, একটির থেকে আরেকটিকে আলাদা করার মতো কোনো বৈশিষ্ট্যও নেই তাদের, তাছাড়া মৃতের তালিকা দীর্ঘতর করার বেশি প্রয়োজনীয়তাও নেই। একদিক থেকে গল্পটা সরল। এই দেশ যে-বহুমূল্য খাদ্য উৎপাদন করে, গরিবদের তা কিনে খাবার পয়সা নেই; অতএব তারা খেতে পায় না; আবার খেতে পায় না বলেই তারা ক্ষুধায় কাতর হয়; তখন সেই ক্ষুধার বশে তারা অখাদ্য খেতে শুরু করে; খাদ্যের অভাব এবং অখাদ্য ভোজনের ফলে নানা গণ্ডগোল হতে থাকে; অবিলম্বে তারা মরে।

এক্ষেত্রে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক কী করবে? তার কি নিজের সামাজিক বিবেককে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত, না নিজের চরকায় তেল দেওয়া উচিত? ব্যক্তিগতভাবে সে তার নিজস্ব আয় ও খাদ্যের কিয়দংশ এইসব অনশনক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করতে পারে। তার জানাচেনা অনেকেই নিঃশব্দে সে-রকম করে থাকে, খবরের কাগজের শিরোণামায় যাতে তাদের নাম না বেরিয়ে যায়; তাদের দলে যোগ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু স্পষ্টতই এইসব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সীমিত হতে বাধ্য। তাছাড়া শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যেও যারা ছোটখাটো অবস্থার মানুষ, তারা আগে যার যার ঘর সামলানোর কথাই ভাববে। মুদ্রাস্ফীতি হবার সঙ্গে-সঙ্গে জীবন-যাত্রার মান দ্রুত ক্ষয় পাচ্ছে, অনেক শিক্ষিত লোকেই এ-রকম মনে করে না যে সরকারের বিবেক রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব তাদের;

ক্ষুধার্ত ও মৃত্যুপথযাত্রীদের দেখবে সরকারি কর্তারা, শিক্ষিত লোকেরা স্বজাতির স্বার্থই আগে রেখে চলবে। যাদের সততা সন্দেহাতীত এ-রকম অনেক লোকও এই অঙ্কটা আগে থেকে কষে রেখেছে, যে জাতীয় খাদ্যভাণ্ডারের যে-অংশ তাদের জন্য খরচ হয়, তা এতই নগণ্য যে তাদের খাওয়া এবং ব্যয় কমানোর অনুরোধ করা নিরর্থক।

তাহলে কি শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা শুধু ভারতের সেই প্রাক্তন প্রাধানমন্ত্রীর লেখাগুলি পড়বে, যিনি দেখে তাজ্জব হয়েছিলেন যে ১৯৪৩ সনে বাংলার মানুষ নিঃশব্দে বিনাপ্রতিবাদে না-খেয়ে মরছিল, কিন্তু তবু চালভর্তি গুদাম লুঠ করেনি? এ-দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে এ-যাবৎ যিনি মহত্তম, তাঁর এই সতর্কবাণী আক্ষরিক অর্থে নিয়ে শিক্ষিতেরা তবে কি আজ ব্যারিকেডে গিয়ে দাঁড়াবে? কিন্তু এবংবিধ প্রচেষ্টাও কি ব্যর্থ হতে বাধ্য নয়? আইনশৃঙ্খলার রক্ষকরা কি সঙ্গে-সঙ্গে তাদের তুলে নিয়ে যাবে না? যারা মৃতপ্রায়, তাদের অবিরল মৃত্যু তো এতে বাধা পাবে না। তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেরই শিক্ষিতদের সঙ্গে জেলে যাওয়ার মতো শারীরিক বা মানসিক জোর থাকবে। তাছাড়া ওই শিক্ষিতদেরই একাংশ যুক্তি দেখাবে, যে নয়াদিল্লির সরকার কোনভাবে বিব্রত বোধ করতে পারে এ-রকম যে-কোনো প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত দেশের ভিতরে ও বাইরে সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলিকে মদত জোগাবে। কাজেই বিরোধী দলগুলি গরিবের জন্য খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করছে বটে, কিন্তু তারা অপরিণামদর্শীর মতো কোনো কাজ করতে নারাজ; তাছাড়া তাদের তেমন-কিছু করার ক্ষমতাও নেই। আবেগ পরিহার করুন। তথ্য বিশ্লেষণ করুন। ১৯৬৬ সালে টাকার দাম পড়ে গেল; মন্দা শুরু হল। সেই সময় থেকে অর্থনীতিতে যে-অসামঞ্জস্য ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে তারই চূড়ান্ত রূপ আজকের এই সংকট। সে-সময় থেকেই লগ্নির ছাঁচে নানারকম বিকৃতি ঢুকে পড়েছে, আজ সেগুলির সংশোধন দরকার; তার মানে পঞ্চম পরিকল্পনার মূল-সূত্রগুলিকেই রক্ষা করতে হবে। এটাই আজকের কর্তব্য। কড়া কথা বাদ দিন; দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার দুর্ধর্ষ প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে

বামপন্থী দুঃসাহসিকতারও মোকাবিলা করতে হবে। নির্মোহভাবে দেখতে গেলে ১৯৭৪ সাল ১৯৪৩ সালে প্রভেদ অনেক। আফসোসের বিষয় যে গরিব লোকগুলো মরতে শুরু করছে; প্রত্যেক থানায় আরো বেশি-বেশি করে লঙ্গরখানা খোলার দাবি জানাতে হবে আমাদের···

এখানে কিন্তু গলদ থেকে যাচ্ছে। লগ্নির ধরনটাই ভুল ছিল, এটাই আজকের দুর্ভিক্ষের আসল কারণ নয়। খাদ্যশস্যের টানাটানির দরুনও এটা ঘটেনি। দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন কিছু লোভী লোক শস্য মজুত করছে, যা-খুশি-তাই দর হাঁকছে এবং নিজেদের পকেট ভারি করছে। অবাধ-নীতির আমলে নিজের নিজের পুঁজি বাড়ানোর কোনো সুযোগই ছাড়া যায় না; সেটা ধর্মসংগত হবে না। ভেবে দেখতে গেলে, লঙ্গরখানা খোলাটাও নিজের প্রভাব বিস্তারের উপায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। দলের মধ্যে আবার যারা পেটোয়া লোক তারা আগেভাগে এসে লঙ্গরখানাগুলির ভার নিতে পারে। খিচুড়িতে জল মিশিয়ে, পরিমাণ কম দিয়ে বেশ ভালই লাভ করা যায়। উল্টোদিকের লোকেরাও অবশ্য চোখে একই স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দুই দলই সরকার-বাহাদুরের প্রিয় এবং কোনোদিকেই প্রীতির কমবেশি নেই। কাজেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, প্রস্তাবিত লঙ্গরখানার অনেকগুলোই খোলা পর্যন্ত যায় না। ফলে, উপোসীদের কয়েকজন তো মরবেই।

নখদন্তহীন ভদ্রলোকদের পরিণাম বিবেচনা করে কাজ করতে হয়; বিশেষণ তাদের পরিত্যাজ্য; কিন্তু যখন রাস্তার ধারে মৃতদেহের ভিড় জমছে আর মুমূর্ষুদের আর্তরবে আকাশ ফেটে যাচ্ছে তখন তাদের কী করা উচিত? তারা কি বসে মোৎসার্টের জি মাইনরের ২৫ নম্বর সিমফোনি শুনবে, না মৃত প্রধানমন্ত্রীর মনোরম গদ্যপাঠে আবার মন দেবে?

৩৬

রসিক উজির

শীত শেষ ; অসন্তোষের ঋতু, অবশ্য, সবে শুরু হল। দেখে মনে হয়, প্রায় প্রত্যেকেই কাজ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, বেশি মাইনের জন্য আন্দোলনে ঃ রেলের গার্ড, বিদ্যুৎকর্মী, এনজিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক, পৌরকর্মী, সবাই। জবুথবু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অকস্মাৎ সম্প্রতি আবিষ্কার করে বসেছে তাদের জীবনযাপনের মান বাঁচাবার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন কতটা জরুরি। যে দুর্ভাগা মজুর সম্প্রদায় মাঝে-মধ্যেই ধর্মঘটের আশ্রয় নিত, তাদের সম্বন্ধে এককালের সেই বাঁকা কটাক্ষ আর নেই। মুদ্রাস্ফীতি, বলাই-বাহুল্য, সবাইকেই ছেঁটে সমান করে দিয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে প্রস্তাব করা যায়—করা হচ্ছেও—যে, যা ঘটছে তা এক ডাহা কেলেঙ্কারি। গ্রাম-গঞ্জের গরিব মানুষ আর অসংগঠিত শহুরে প্রোলেতারিয়েত মূল্যবৃদ্ধি আর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তাতে কী? মুদ্রাস্ফীতির জন্য যারা সবচেয়ে মার খেয়েছে, তারা যদি কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু না-করে, কিংবা যদি-বা করেও থাকে, তা যদি ডাক্তার বা এনজিনিয়ার নামক কৃতবিদ্যদের আন্দোলনের মতো জোরদার না-হয়, তার কারণ এটা নয় যে এই-যে মুচড়ে-মুচড়ে দাম বেড়ে যাচ্ছে, এ অবস্থাকে খুব গরিবরা খুব-পছন্দ করে ঃ তাদের সাংগঠনিক শক্তির অভাবই তাদের প্রতিবাদের দুর্বলতা। শক্তি যাদের আছে তারা তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করবেই। তাছাড়া মানবস্বভাবের মৌল প্রকৃতিটাই এ-রকম যে সে কখনো যারা তার চেয়ে নিচে পড়ে ধুঁকছে তাদের দুর্ভোগের সঙ্গে নিজের অবস্থার কোনো তুলনা করে না ; তুলনাটা

চিরকালই উলটো দিকে ফিরে তাকায়। এই দুঃসহ দারিদ্র্যের আতঙ্ক যদি নাও থাকত, যারা বছরে দশ-পনেরো হাজার টাকা আয় করে, তারা তবু বিচার করে দেখত, আপেক্ষিক মানদণ্ডে তাদের অবস্থা কেমন। তারা আবিষ্কার করে বসে যে এই কিছুকাল আগেও যারা তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা উপার্জন করত, তারা এখন কী করছে; শেষোক্তরা আবার এই ভাবনাতেই সারা হয়ে যায় যে কিছুকাল আগে যাদের আয় ছিল লক্ষ টাকা তাদের তুলনায় তারা কতটা পেছিয়ে গেল। আর এইভাবেই চলে, অনন্ত অব্দি। এই দশা যখন আবহাওয়ার, নীতির দোহাই তখন অচল হয়ে পড়ে। নিজেদের আখের গোছাও, ১৯২০র যুগে রুশী কুলাকদের ভজিয়েছিলেন এন. বুখারিন। নিজেদের আখের গোছাও, এই বার্তাটাই মনে হয় দেশের শাসকরা এখন উদ্বৃত্তফলানো বড়োচাষী, ব্যবসাদার আর শিল্পপতিদের কানে পৌঁছে দিয়েছেন। মুদ্রাস্ফীতির সুযোগ নিয়ে এই শ্রেণীর লোকদের আখের গুছিয়ে নেয়াটা যদি অনুমোদনযোগ্য হয়—এবং গুছোতে গিয়ে তারা যদি মুদ্রাস্ফীতির আগুনটাকে আরো উশকে দেয়—তবে নিজেদের জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখবার জন্য রাস্তায় নামতে শুষ্কপ্রায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীও কোনো নৈতিক অস্বস্তিতে ভোগে না। প্রেমে আর যুদ্ধে সবকিছুই চলে। মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধই, তার চেয়ে কম কিছু নয়। প্রত্যেকেই তাই যে যার নিজের জন্য—কি ছেলে, কি মেয়ে।

আসন্ন মাসগুলোয় যখন খাদ্যের জোগানে আরো টান পড়বে, এই তুমুল বিপদটার মুখোমুখিই দাঁড়াতে হবে দেশকে। মুদ্রাস্ফীতি খারাপ, অর্থনীতিবিদরা জানান, কারণ তা বিনিয়োগের সূত্রগুলোকে পেল্লায় একটা ল্যাং কষায়, আর লগ্নি করার মতো টাকা যাদের হাতে আছে তারা প্রলুব্ধ হয় উৎপাদন না বাড়িয়ে ফাটকা বাজারে টাকা খেলাতে : তাতে পণ্যের অভাব আরো বাড়ে, আর টাকার উপার্জনের বেগমাত্রা আধাবেতালা হয়ে ওঠে। তবু, এ-সব অর্থনৈতিক ফলাফলগুলো তো নিছকই একটা ঢাকনা বা রোগলক্ষণ মাত্র; এই প্রক্রিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যগুলো আরো মারাত্মক। উৎপাদনের চাকা যারা

ঘোরায়, যারা চালু রাখে দেশের অর্থনৈতিক ওপরকাঠামো, যারা বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে বোতাম টেপে অথবা সেচব্যবস্থার জলের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, মুদ্রাস্ফীতির মড়ক ছড়ালেই তাদের আয় যখন আর জিনিসপত্রের দাম চড়ার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না, তারা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে থাকে রাস্তায়। যেখানে তারা আক্ষরিকভাবে বেরিয়ে যায় না, সেখানে তারা কাজ করে কেমন নেতিয়ে-পড়া ভাবে, হালছাড়া, ব্যাজার-মুখ; সন্তোষজনক হারে উৎপাদন বাড়ল কি না-বাড়াল, কিংবা যন্ত্রপাতি-গুলোর ঠিকমতো তদারক হল কি না হল, তাতে তাদের বয়েই যায়। ভারতই একমাত্র সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত দেশ নয়; উৎপাদন প্রক্রিয়ার যে ধরনের সামগ্রিক, সর্বগ্রাসী অবক্ষয় আমরা এখানে এখন দেখছি, তা অন্যত্রও ঘটেছে, যখন কর্মীদের বেতন আর দামবাড়ার হারের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। এ-রকম অসহায় অবস্থায় কারু মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ জাগাবার চেষ্টা করাটাই বৃথা। কোনো ডাক্তার বা এনজিনিয়ার বা রেলের গার্ড দেশকে ভালোবাসে, তার নিজের মতো ক'রে, খবর-কাগজে তার নাম ফলাও করে বড়ো-বড়ো হরফে ছাপা হয় না বটে তবু সে দেশকে ভালোবাসে। কথা বলে দেখুন তার সঙ্গে, দেখবেন সেও হয়তো স্বীকার করবে যে মূল্যবৃদ্ধি সামাল দেবার জন্য তার এই যে বেতনবৃদ্ধির আব্দার তা হয়তো শাসকদের আরো সমস্যায় ফেলতে পারে। কিন্তু সে অবশেষে এমন-একটা স্তরে এসে পৌঁচেছে, যখন তার আর কিছুই এসে যায় না। কোনো সরকার তার নাগরিকদের কাছে কিঞ্চিৎ বিচার-বিবেচনা সহযোগিতার দাবি করতে পারে—এবং তা পেতেও পারে—যদি, বা যখন, দেশের লোক তর্কাতীতভাবে বুঝতে পারে যে, তাদের সীমিত উপায় সত্ত্বেও, গদিতে যারা হেলান দিয়ে আছেন তাঁরা সত্যি-সত্যিই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য চেষ্টা করছেন, অথবা মুদ্রাস্ফীতি-জনিত দুর্ভোগটাকে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করছেন। একবার এই মূল আস্থাটা উঠে গেলেই প্রায়শ্চিত্ত করেও পরিস্থিতি আর সামাল দেয়া যায় না।

সরকার যে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, সবচেয়ে শেষেরটির ওপর থাবা

বসাবার জন্য ডেকে এনেছে শয়তানকে, আশেপাশে তাকিয়ে দেখে এই বোধটা থেকে পার পাওয়া বেশ শক্ত। মুদ্রাস্ফীতির পিঠে চড়ে বেড়াতে গেলে এক বিশেষ ধরনের প্রতিভা লাগে। অ্যাদ্দিনে লাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশই বুঝে গিয়েছে বার্ষিক শতকরা ৩০ বা তারও বেশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মোকাবিলা কী করে করতে হয়, কারণ তাদের যে সেই কত বছর ধরে এই কাজটাই করে আসতে হচ্ছে: দেশের কৃষি-কাঠামোকে মুদ্রাস্ফীতি থেকে পুরোপুরি পৃথক করে রেখে বাকি-সব পুঞ্জ-পুঞ্জ সমস্যার রাশ টানা যায় মাঝে-মাঝেই মুদ্রার বিনিময় মূল্য নতুন-ভাবে বিন্যাস করে অথবা বিদেশ থেকে সংগতির সংস্থান করে। এমনকি লাতিন আমেরিকার দেশগুলোও এখন এ নিয়ে আরেকভাবে ভাবছে: ব্রাজিলের মুদ্রাস্ফীতির হার, উদাহরণত, ষাটের দশকের মাঝেকার শতকরা একশো থেকে এখন মোটামুটি শতকরা বারোতে এসে নেমেছে। আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্য উইকেটটা আরো আঠালো আর বিপজ্জনক। মুদ্রাস্ফীতি সামাল দেবার জন্য বিশেষ দক্ষতা চাই—ক্ষমতা চাই, এমন ধরনের ক্ষমতা যা নির্ভর করে যতটা মনোভঙ্গিমার ততটাই কর্মপ্রক্রিয়ার ওপরে, আর সে-সব, এখনো, এদেশে অনুপস্থিত। মাথাগুনতি হিসেবে, লাতিন আমেরিকার কোনো দেশে বার্ষিক যত বিদেশী সম্পদের সংক্রমণ হয়, এখানে তার শতকরা পাঁচ ভাগও হয় না। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে দেশের কৃষিবুনিয়াদকে বিচ্ছিন্ন করবার প্রায় কোনো চেষ্টাই হয়নি এ-যাবৎ। জনশ্রুতি, সাধারণের মধ্যে, মোটামুটি স্থানীয় মূল্যে, খাদ্যশস্যের বিলিব্যবস্থা না কি যারা সহজে দুর্ভোগে পড়ে সেই শ্রেণীর উদ্দেশেই আয়োজিত: কারু, অবশ্য, সন্দেহ হতেই পারে যে গ্রামীণ গরিবরা—তারা দেশের শতকরা ৪০ অংশ হওয়া সত্ত্বেও—তা থেকে কতটুকু পায়: সাধারণের জন্য নিয়োজিত বিলিব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য-শস্যের আভ্যন্তরীণ দশ কোটি টন উৎপাদনের মধ্য থেকে, দশ লক্ষ টনও পায় কিনা সন্দেহ।

তাই, মূল প্রশ্নটাতেই ফিরে আসতে হয়। এই গরিব দেশে, আপনি যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতেই চান, আপনাকে শুরু করতে হবে

খাদ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেই। মাথাগুনতি জাতীয় আয় বছরে যদি মাত্র ৪ কুইন্টাল খাদ্যশস্যের দাম মেটাতে পারে, অথবা দেশের অন্তত অর্ধেক জনসংখ্যার গড় উপার্জন বছরে এমনকি যদি ২ কুইন্টাল খাদ্যশস্য কেনবার পক্ষেও যথেষ্ট না-হয়, তবে বুঝতেই হবে যে কোথাও নিশ্চয়ই আশাহীন-ভাবে গোল বেধে আছে। মুখ্যমন্ত্রীরা বৈঠকে বসেন এবং শস্যের দাম আরো বাড়াবার সিদ্ধান্ত করেন; যেহেতু, তাঁরা এই সিদ্ধান্ত মারফৎ গরিবগরবাদের আয় বাড়াবার জন্য কুটোগাছটিও নাড়ান না, তাঁরা শুধু এক ধাক্কায় আরো কয়েক লক্ষ লোককে দারিদ্র্যসীমার নীচে পাঠিয়ে দেন, আর অন্য অনেকেরও জীবনযাত্রার মান কয়েক ধাপ নিচে নেমে আসে। তাদের কেউ-কেউ, যারা সংগঠিত হবার ও অটল থাকার ক্ষমতা রাখে, তারা মুখ বুজে তাদের জীবনযাত্রার মানের এই অবলম্বন সইতে অস্বীকার করে। তারপর থেকে তো, যে যা পারো, গুছিয়ে নাও। ব্যবসাদার ও বড়োচাষীরা, যাদের মজুত করার ক্ষমতা আছে, খাদ্যশস্য গুদোমে আটকে রাখে—তাতে আরো দাম বাড়াতে তাদের সুবিধে হয়। গ্রামীণ গরিবরা, যাদের না-আছে শস্য ভাণ্ডার না-বা অটল লড়ে যাবার ক্ষমতা, কষ্ট পায়, মুখ বুজে দুর্ভোগ পোহায়, ডাক্তার এনজিনিয়ার, রেলকর্মী পৌরকর্মী এবং অন্য-সবাই—যাদের খানিকটা লড়ে যাবার ক্ষমতা আছে—ধর্মঘট করে, উৎপাদন বন্ধ করে, আর এইভাবে অংশত কিছুটা মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী হয়ে ওঠে। বড়োচাষী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যে-সরকার তার কড়ে আঙুলটাও তুলবে না, বরং তাদের আরো লাই দেবে, আশকারা দেবে, তার অবশ্য এই আন্দোলনকারীদের কাঠগড়ায় চাপাবার নৈতিক অধিকার সামান্যই।

এই-তো সবে ফাল্গুন-চৈত্র, সত্যিকার টানাটানির সময় আসতে বেশ বাকি। কলকাতার ভাঙাচোরা পথঘাট তবু প্রতিদিন দুপুর থেকেই ভিড়ে ভরে যায়। মিছিল করে আসে শিক্ষক, কারখানার মজুর, ঘরের বউ, এনজিনিয়ার, ডাক্তার, পৌরকর্মী; শ্লোগানে ফাটিয়ে দেয় আকাশ; প্রত্যেকেই চায় তার নিজের গোষ্ঠীর জন্য ভরতুকি, বেতনসংস্কার অথবা দ্রব্যমূল্যের অবনমন। তাদের সত্যি খানিকটা সাহায্যের ব্যবস্থা করা

জরুরি। নাজারেথে জিসাসকে ক্রুশে লটকাবার জন্য, রসিক উজিরদের, পন্তিউস পিলাতেদের, অবশ্য তবু কোনোই অভাব নেই। জনসাধারণকে অন্য-কোনো ধরনের সাহায্য দেয়া দূরে যাক, রেলমন্ত্রী ঠিক করেছেন পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর যাতায়াতের ভাড়ার হ্রাস মূল্যের সুবিধে ফিরিয়ে আনবেন। আপনি যদি রুটি জোটাতে না-পারেন, তো পাহাড়ে চলে যান, গিয়ে ঠাণ্ডা হোন।

৩৭
ব্রাজিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন

আগে থাকতেই এ-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত। দেবতাদের আধিপত্য আবার ফিরে এসেছে, ভারত সরকারের স্নেহচ্ছায়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ জোরদার হয়ে উঠছে, আজ আমাদের পথের নিশানা কে দিতে পারে ব্রাজিল ছাড়া, যে ব্রাজিল মুলাটো, নিগ্রো এবং রেড-ইণ্ডিয়ান শ্রমজীবী জনগণকে ব্যবহার করে লক্ষ-লক্ষ ক্রীতদাসের মতো? সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত এই উচ্ছ্বসিত ব্রাজিলপ্রীতি নয়া উপনিবেশবাদের একটি উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিন পত্রপত্রিকা আর সংবাদপত্রগুলি ডেলফিম নেট্রির মস্তিষ্কপ্রসূত 'ইনডেক্সেশন' পদ্ধতির কথায় পঞ্চমুখ; মিলটন ফ্রীডম্যান এবং শিকাগো-ঘরানার পণ্ডিতরা লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে। আমরাই বা থাকব না কেন?

মুদ্রাস্ফীতি—বিশেষত অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি—সমাজের ধনী লোকদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। এর সুযোগ নিয়ে ধনীরা যখন ফায়দা ওঠায়, চাকুরিজীবীদের তখন নাভিশ্বাস ওঠে, দরিদ্র কৃষক ও দিনমজুরির ওপর নির্ভরশীল ভূমিহীন চাষী বিপদে পড়ে, সংগঠিত মজদুরশ্রেণীও শুধু দীর্ঘ লড়াইএর মাধ্যমেই তাদের প্রকৃত আয় রক্ষা করতে পারে। ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলির দিক থেকে দেখতে গেলে মুদ্রাস্ফীতিটা আয় পুনর্বণ্টনের একটা সচেতন খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজের নিচুতলার গড় আয়ে ক্ষয় ঘটিয়ে তার বড়ো অংশটা উঁচু-তলার দিকে পাঠিয়ে দেওয়াই এই খেলার উদ্দেশ্য। যে-কোনো সমাজেই লক্ষ্মীমন্তদের লোভের বহরটা তাক লাগিয়ে দেবার মতো; সেই বেশি চায়, আছে যার

ভূরি ভূরি। যে-কোনো সমাজেই এটাই বোধহয় বিপ্লবের মূল কারণ, সে বিপ্লব সফলই হোক, বা বানচালই হয়ে যাক। যারা মানুষকে শোষণ করে বাঁচে, তারা প্রায়ই এটা ভুলে যায় যে অন্য যে-কোনো জিনিসের মতোই শোষণেরও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াটা মারাত্মক।

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত, ওদিকে হিংস্র উপায়ে শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, এরই মধ্যে হঠাৎ হর্তাকর্তাদের চোখ চকচক করে উঠল। বিত্তবান্দের চোখ এখন ব্রাজিলের দিকে। মুদ্রাস্ফীতি ভালো জিনিস, পকেট আরো ভারি হয়ে ওঠে, দরিদ্রের ওপর দিনে ডাকাতি করা যায়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে যখন 'মুদ্রাঘটিত সংশোধন'-এর মণিকাঞ্চন যোগ হয় তখন ব্যাপারটা হয় আরো ভালো। গাছেরটা খেতে ভালই লাগে; কিন্তু গাছেরটা খেয়ে যদি তলারটাও কুড়োনো যায়, তাহলে সে স্বর্গ। 'ইন্ডেক্সেশন' নামক ব্রাজিলদেশীয় কলটির এটাই হল মূলকথা। অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে, লগ্নীকরা মূলধনের ওপর রাঘববোয়ালরা যা লাভ করে তার অঙ্কটা এক বছরের মধ্যে শতকরা আট থেকে আশিতে ঠেলে উঠেছে। তবু এও যথেষ্ট নয়। এই বছরের মধ্যে সাধারণ মূল্যতালিকাতেও শতকরা চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং যখন আয়কর নির্ধারণ করা হবে, তখন ঐ রাঘববোয়াল-জাতীয় জীবদের আয়ের অঙ্ক সংগতি রক্ষার জন্য কমিয়ে দেখানো হবে, অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যনুপাতে ঐ আয়কে তালিকাভুক্ত করা হবে, যাতে প্রমাণ হয়, যে আয়করের ওপর কিছুটা ছাড় তার পাওনা আছে। কাজেই খাজনা হিসেবে তহবিলে যতটা আসার কথা ছিল তার চাইতে কম আসবে। অন্যদিকে ঐ রাঘববোয়ালের স্ত্রী যদি নির্ধারিত সুদে সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করে থাকে, তাহলে তা 'মুদ্রাঘটিত সংশোধন'-এর আওতায় পড়বে; অর্থাৎ ঐ ঋণপত্রগুলির ক্রেতাকে কখনও বাজারের হিংস্র ঠেলাঠেলির সম্মুখীন হতে হবে না। রাঘববোয়ালটির যদি ব্যাংকে আমানত করার মতো খুচরো টাকা থাকে, তাহলে ঐ টাকার ওপর ব্যাংকের যে-সুদ দেওয়ার কথা, তারও পুনর্বিন্যাস হবে, যাতে আমানতের হারে মুদ্রামূল্যের যেটুকু হ্রাস হয়েছিল সেটা

পুষিয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক নেই, ধনীদের জন্য ধনী-দেরই উদ্ভাবিত এই কল, যার কল্যাণে মুদ্রাস্ফীতিতে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মুনাফা বৃদ্ধি, যে-কোনো লগ্নীর ওপর অসম্ভব রকমের লাভ ইত্যাদি মুদ্রাস্ফীতির যা যা সুবিধা সবই তারা নেবে। অন্যদিকে সুদের প্রকৃত হারের অবক্ষয় এবং মূল্যবৃদ্ধির অন্যান্য যা সাধারণ ঝামেলা সেগুলো থেকে তারা পুরোপুরি গা বাঁচিয়ে থাকতে পারবে। ধনীরাই ধন্য, কারণ 'ইন্‌ডেক্সেশনে'র সাহায্যে তারা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করবে।

কিন্তু 'ইনডেক্সেশনে'র আমলেও একটা কোথাও সীমারেখা টানতে হয়। নতুন পদ্ধতির মোহে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়া ঠিক নয়। বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব বলেও একটা জিনিস আছে। বিত্তবান্ শ্রেণীর পক্ষে 'ইনডেক্সেশন' সুবিধাজনক, কিন্তু শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে নয়। দেশে এখন শিল্পে শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-অশান্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে তার পিছনে আছে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার দাবি। বস্তুত ব্রাজিলে উদ্ভূত 'মুদ্রাগত সংশোধনে'র তত্ত্বেরই এটা একটা প্রতিধ্বনি। কিন্তু ব্রাজিলের মতোই এখানেও কর্তৃপক্ষ এবং তাদের চামচারা আঁৎকে উঠবে, যদি তাদের মহামূল্য তত্ত্ব হতভাগ্য শ্রমিকদের আয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার কথা হয়। সংগতির প্রশ্নটাকে কোনো উদ্ভট আতিশয্যের দিকে টেনে নেওয়া অনুচিত। কাজেই একদিকে জমির মালিক এবং পুঁজিপতিরা মুদ্রাগত সংশোধনের আশীর্বাদ পাবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের বেলায় মূলনীতি হবে, উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরি নির্ধারণ করা। জমির মালিকের উৎপাদনশীলতার মাপকাঠি কী হবে, জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধিতে ফাটকাবাজদের অবদানই বা কতটুকু, তাই নিয়ে কাউকে গায়ে পড়ে প্রশ্ন করতে দেওয়া হবে না। বিত্তবানের বেলায় উৎপাদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবমাননাকর; একমাত্র শ্রমজীবীদের বেলাতেই ও-সবের একটা যৌক্তিকতা আছে। যদি সময় আসে ট্রেড-ইউনিয়নগুলি পরিসংখ্যানগত প্রমাণ দিতে পারবে, যে ১৯৫৩-৫৪ সাল

থেকে শুরু করে গত কুড়ি বছরের মধ্যে নতুন পুরোনো প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে টাকার হিসেবে মজুরিহারের পুনর্বিন্যাস শুধু মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতেই নয়, উৎপাদনবৃদ্ধির অনুপাতেও গুরুতরভাবে পেছিয়ে রয়েছে। কিন্তু এ-সব অসুবিধাজনক তথ্যকে আলোয় না আনাই ভালো'; সংবাদ-পত্রগুলিকেও এ-সব তথ্যকে গুরুত্ব না দেওয়ার, অথবা পুরোপুরি চেপে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হবে।

একটা দূষিত হাওয়া বইছে আজকাল। কিন্তু যেটা আরো ভয়ের ব্যাপার তা হল সাধারণ সামাজিক বোধের দীর্ঘায়িত অপমৃত্যু। একটি রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্গত শ্রেণীসংস্থানই তার চরিত্র নির্ধারণ করে। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি থেকে নিরাপত্তার ব্যাপারে ধনী ও গরিবের মধ্যে যে বৈষম্যমূলক আচরণ কর্তারা করছেন, তাতে বিস্ময়ের ভান করে লাভ নেই। কিন্তু কিছুদিন আগে হলেও বিষয়টার অবতারণা করতে গেলে কয়েকবার ঢোক গিলে নিতে হত; আর আজ ওই ব্রাজিলীয় সমাধানের প্রবক্তাদের যে-পরিমাণ শ্রদ্ধা দেখানো হচ্ছে, সেটা তাক লাগানোর মতো। আগে হলে বক্তব্যটা হত এই রকম: হ্যাঁ, ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ভাবছি; জাতীয় আয়ের অন্তর্গত বেতনের যা মোট পরিমাণ সেটা কমে গেছে, এ-বিষয়ে কিছু করা দরকার, ধনের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তবে এদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এত বেশি, যে বুঝতেই পারছেন, সময় লাগবে। ধনীদের যে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কোনো সরকারি নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে, এ-কথা কেউ বলতে গেলে সে উপহাসের পাত্র হত। কিন্তু এখন যদি কেউ এ-কথা বলে, তাহলে খবরের কাগজগুলিতে সে যথেষ্ট জায়গা পাবে। সরকারি পক্ষ থেকে তার মতামত নিয়ে আলাপ-আলোচনার আশ্বাস দেওয়া হবে, এমনকি হয়তো প্রধানমন্ত্রীও তাকে সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করবেন, এবং তার নির্দেশ মন দিয়ে শুনবেন।

অন্যদিকে কেউ যদি গোঁয়ার্তুমি করে দাবি করে যে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মাঝে-মাঝে শ্রমিকদের বেতনও বাড়ানো উচিত, তাহলে সে শান্তিভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে, ডি. আই. আর. এবং মিসার

কথা মনে করিয়ে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হবে। করদাতাদের টাকার শ্রাদ্ধ করে দেশের লোকের কাছে প্রচার করা হবে, যে এ-রকম বিপজ্জনক ধারনা যারা রাখে, তারা ঘরের শত্রু বিভীষণ; ১৯৬৫ বা ১৯৭১ সালে বাইরের শত্রুতে যে ক্ষতি করতে পারেনি, এই লোক এখন তা-ই করার চেষ্টা করছে। তার ওপর আবার এই লোক 'ইন-ডেক্সেশন' দাবি করছে—পুঁজিপতির মুনাফা বা ভূস্বামীর সুদের উপর নয়, শ্রমিকদের বেতনের ওপর। সর্বনাশ! সর্বনাশ! গেল, গেল, সব গেল!

এইটেই হল ব্যাপার। রেলশ্রমিকরা যখন ধর্মঘটে নামে, তখন নখে দাঁতে তাদের ঠেকানো হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা মজুত শস্য বার করতে না চাইলে ভদ্রতাসম্মত আহাউঁহুই ঢের। এই জরুরি পরিস্থিতিতে কিন্তু সৈন্যবাহিনী বা সীমান্তরক্ষীদের তলব পড়ে না, ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতিদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় মন্ত্রীর সঙ্গে পঞ্জাবের 'মণ্ডি'গুলিতে ঘুরে-ঘুরে ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের কাছে সরকারের হয়ে ওকালতি করার জন্য। সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আইন সংরক্ষকদের সঙ্গে অ্যাল্ কাপোনের বেআইনি মদের আড্ডায় যাওয়া এবং চোরা-কারবারীদের ধর্মোপদেশ দেওয়ার সঙ্গেই একমাত্র এর তুলনা হয়। অ্যাল্ কাপোনের কাছে পুরো ব্যাপারটাই নিশ্চয় একটা বিরাট রসিকতায় দাঁড়াত। সপ্তাহান্তে 'মণ্ডি'গুলির মধ্যে দিয়ে মোটর-বাহিনী নিয়ে ঘোরার সময়ে এফ. আই. সি. সি. আই-এর সভাপতির যে অন্যরকম মনে হয়, তা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ নেই।

অতঃ কিম্? এ-দেশ অশান্ত, তার সব চাইতে বড়ো কারণ এই যে দ্রব্যমূল্যের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির জন্য রেলশ্রমিক বা অন্য ধরনের শ্রমজীবীকে দায়ী করা যায় না। এমনকি দায়ী করা যায় না ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের নিম্নশ্রেণীর কর্মীদের। উৎপাদন এক জায়গায় থেমে আছে বলেই যে দাম বাড়ছে, তাও নয়; যে-বছর খরিফ শস্যের

রেকর্ড উৎপাদন হল, সে-বছরেই সব চাইতে ব্যস্ত মরশুমে মূল্যবৃদ্ধিও অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছল। স্বীকার করতে হবে, যে অনেক ক্ষেত্রে সরকার মূল্যবৃদ্ধি চেয়েছে বলেই দাম বেড়েছে ; হয় দাম বাড়ানোয় সরকারের ষড় ছিল, নয়তো ঢালাও ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা করে ও অন্যান্য 'সদাশয়তা'র মাধ্যমে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে বাজারে আগুন লাগে। অপরাধীরা আছে সরকারেরই মধ্যে। অথবা তার আশেপাশে। মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার সরকারেরই দায়িত্ব ; কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে বদমাইশির থেকে বোকামিকে আলাদা করাই কঠিন।

মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ ঠেকানোর তাৎক্ষণিক উপায় রোজই কেউ-না-কেউ যাচাই করতে আসছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য লাইন পড়ে গেছে, সহজে দু-পয়সা রোজগারের ফিকির নিয়ে নামজাদা ঠগ ও ভণ্ডরা প্রায় সবাই সেই লাইনে! বাজি রেখে বলা যায় যে, আজকাল যে-সব দাওয়াইয়ের কথা শোনা যাচ্ছে, তার বেশির ভাগই রোগটাকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। সরকার কিন্তু খুশি, ভণ্ডদের প্রতি ভালোবাসাটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর হতভাগ্য শ্রমিকরাই তার বিদ্বেষের পাত্র তবু এইভাবে যদি চলতে থাকে, শিগ্‌গিরই কি এমন সময় আসবে না যখন এই বলে গান গেয়ে চলতে হবে যে : মানুষের বিদ্বেষ কুড়োও, যদি বড়ো হতে চাও।

৩৮

মুষ্টিভিক্ষা চাই

মুঠিতে যত বেশি আঁটবে, মহিমাও তত বাড়বে। রুচিটাও খুব ব্যাপক ; ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। বড়ো হোক, ছোটো হোক সব দেশেরই দুয়ারে আমাদের নেতারা ভিক্ষাপাত্র পেতে রেখেছেন। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে যে-নাকউঁচু মনোভাব ছিল, আজ তা গেছে। সেদিন শুধু মার্কিনদেরই রেয়াৎ করা হত। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক শিখেছি। কাঙালের আবার বাছাবাছি কিসের? আজ আমাদের নেতাদের কেউ বাছবিচারের অপবাদ দিতে পারবে না। অথচ অন্য পরবে—অথবা একই পরবে অন্য মঞ্চে উঠে—ঐ নেতারাই স্বাবলম্বনের গুণ গাইবেন। বহুরূপী শিক্ষায় হয় না, বহুরূপী জন্মায়। এই মুহূর্তে আমাদের নেতারা অন্য কাজে ব্যস্ত, তাঁরা ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। সংবাদপত্রের গর্বিত শিরোনাম লক্ষ্য করুন : আমাদের ভিক্ষার অভিযান ক্রমেই সার্থকতালাভ করছে ; জাপানিরা ভাটিণ্ডায় আমাদের সহায় হবে ; পহলভিদের হাজার বছরের রাজ্যপাট অক্ষয় হোক, ইরানের শাহ্ মাদ্রাজের শোধনাগারের জন্য সাহায্য অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ; ইরাক আমাদের ওপর সদয় ; ইতিহাসে এই প্রথম আয়ারল্যাণ্ডের বাজেটে আমাদের জন্য সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আত্মতুষ্টির দেঁতো হাসিটা আর ঢাকা থাকছে না ; হাত পাতার বিদ্যেয় আমরা পৃথিবীর সবাইকে টেক্কা দিয়েছি ; মহান ভারতীয় জনগণের পক্ষে এর চাইতে বড়ো উত্তরণ আর কী হতে পারে?

অসম্মান আজ আর গায়ে বেঁধে না। আমাদের কানে তুলো, পিঠে কুলো। নয়াদিল্লিতে বসে যারা কলকাঠি নাড়ছেন, ভিক্ষার অকথ্য

অপমানটা তাঁদের বোধগম্য নয়। এই তো সেদিন পর্যন্ত আরবের শেখদের জমিদারি বিষয়ে ভারত-সরকারের মনোভাবটা ছিল পিঠচাপড়ানো তুচ্ছতাচ্ছিল্যের। সে-সব আজ আর নেই। এর চাইতে বড়ো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা আর ভাবা যায় না। কারও উদ্বৃত্ত একটি পয়সা থাকলেও ভারত আজ তার পেছনে-পেছনে যাবে। আমাদের ব্যক্তিগত চেহারার সঙ্গে জাতীয় চেহারা প্রায় মিলে যাচ্ছে। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় একটা দৃশ্য আজকাল প্রায়ই দেখা যায়ঃ একদল দরকচা-মারা চেহারার স্বদেশবাসী ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে বা সস্তাদামের দোকানে জটলা করছে, আর মুখে হ্যাংলামির ছাপ নিয়ে অভীষ্ট পণ্যগুলির জন্য প্রাণপণে দরাদরি করছে, যদি আর-একটু ছাড় মেলে, যদি আর শতকরা পাঁচ ভাগ দাম কমানো যায়। দেশের সরকারি চরিত্রটা এর চাইতে বেশি আলাদা নয়। ভারত সরকারের দূতেরা—দেখলেই যাদের অসৎ বলে মনে হয়—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, আর সমান আগ্রহে কব্জা করার চেষ্টা করছে ধনীদের, যারা ধনী বলে খ্যাত তাদের, এমনকি যারা অতটা ধনী নয়, তাদেরও। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে কাউকে লজ্জা দিয়ে যদি কয়েক ফোঁটা বেশি সাহায্য আদায় করা যায়, তাহলে তাকে লজ্জা দেওয়া হবে। আমাদের দূতাবাসগুলি তাদের পায়ে তেল দেবে, তাদের জ্বালাতন করে তুলবে, তাদের ভয় দেখাবে, আবার কাকুতিমিনতিও করবে। কিন্তু আত্মতৃপ্তির ভাবটা থেকেই যাবে। ভিক্ষাকে মহিমান্বিত করে দেখানো হবে, যেন উত্তমর্ণ দেশগুলিরই কৃতার্থ থাকা উচিত আর এই মহান ভারতবর্ষকে, এই সুউন্নত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-মণ্ডিত দেশকে, সাহায্য করতে পেরেছে বলে গর্ব বোধ করা উচিত।

এই উন্নত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ কিন্তু প্রায় যে-কারো কাছ থেকেই হাত পেতে অর্থ-ভিক্ষা করবে। চাদ যদি টাকা দিতে চায়, আমরা নেব। ফিজি দিতে চাইলেও তাইঃ জুলফিকার আলি ভুট্টো যদি বিদ্বেষ-প্রসূত বদান্যতায় দু-চার কোটি ডলার সাহায্য হিসেবে নয়াদিল্লিকে দিতে চায়, দেখবেন আমাদের রাজনৈতিক নেতারা তাও ফিরিয়ে দেবেন নাঃ ভিক্ষাটাকে অন্য কোনো নামে চালানোর ফিকির বার করা যাবে, কিন্তু

তাতে হাত পাতার বিস্তার সঙ্গে ভণ্ডামির বিস্তার পরিষ্কার সুদৃঢ় সম্পর্কই প্রমাণিত হবে।

নয়াদিল্লিতে বসে যারা দেশটাকে চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে অনেকের অনেক নালিশ আছে, তার কোনোটা সারগর্ভ, কোনোটা তুচ্ছ, কোনোটা ভাসাভাসা, কোনোটা বা আবেগপূর্ণ। কিন্তু সবচাইতে গুরুতর অভিযোগ—আর-সব যার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়—তা হল জাতির আত্ম-সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার। ব্রিটিশরা এর আগে এখানে দোর্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করে গেছে দেড়শো বছরেরও বেশি। সেটা ছিল বিদেশী শাসন, সম্পূর্ণ স্বাধীনতাহীনতার অপমান। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা বা ছোটোখাটো ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাও স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী ছিল না। কোনো ইংরেজ, স্কট বা আইরিশ অপোগণ্ড হয়তো এক কোটি লোক অধ্যুষিত চার হাজার স্কোয়ার মাইলব্যাপী একটি জেলার ওপর উঠে এসে জুড়ে বসল এবং একচ্ছত্র-অধিপতির রীতিতে শাসন করতে লাগল। বহু বছর ধরে এ-রকম চলল, যার ফলে এই জাতি পরাজিত, বিশীর্ণ ও পদদলিত। কিন্তু তবু তখনও কিছুটা আত্মস্থতা ছিল। অসংখ্য দরিদ্র মানুষের চেহারায় পরিষ্কার বঞ্চনার ছাপ। পরাধীনতার ক্ষত অদৃশ্য হলেও তার মুদ্রা হৃদয়ে অনপনেয়ভাবে লেখা। তবু আত্মসম্মান বর্জিত হয়নি। জাতির গর্ব কেউ কেড়ে নেয়নি। অবশ্যই কিছু পদলেহনকারী ছিল। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা মাথা নোয়াইনি। দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে বিদেশী শাসনে থাকলে ব্যবহারে কিছুটা সতর্কতা রক্ষা করা দরকার। ভারতীয় সমাজের নিজস্ব হৃদয়হীনতাও ছিল, কাঠামোর মধ্যেই ওতপ্রোত ছিল অসাম্য আর অযৌক্তিকতা। কিন্তু কিছু-কিছু গুণও অবশিষ্ট ছিল, সেটা খুব ফেলনা নয়। জাতি নিজের কাছেই এই পাঠ নিয়েছিল, যে দারিদ্র্য ও আত্ম-সম্মানবোধ পরস্পরবিরোধী নয়—যতক্ষণ আয় বুঝে ব্যয় করা হয়।

১৯৪৭ সালের পনেরোই অগাস্টের পর প্রায় সাতাশ বছর হতে চলল, আজ আমরা কোথায়? ভিক্ষায় ওস্তাদ, উত্তমর্ণের পিছনে দৌড়চ্ছি, আর দাঁড়াতে অনিচ্ছুক যে-কোনো পথচারী অবহেলায় ভিক্ষাপাত্রে যে

পয়সাটি ফেলে যাচ্ছে, তার দিকে তাকিয়ে আমাদের চোখ চকচক করে উঠছে। ইরাকি ও ইয়েমেনিদের কাছে আমাদের কাঙালপনা শুরু হয়ে গেছে, এরপর হয়তো আর্থিক দিক থেকে যারা প্রায় আমাদেরই সমকক্ষ, সেই নেপাল ও বর্মার দরজাতেও আর্জি পেশ করার সময় আসবে। এই ব্যবহারের উল্টোপিঠটাও আমাদের মধ্যে দেখা দেবে; যাদের ভিক্ষা দেবার মতো অবস্থা নয়, তাদের প্রতি আমাদের ভাবটা হবে অবজ্ঞার; নীতিজ্ঞানের নতুন মানদণ্ড সৃষ্টি হবে।

আর এর পটভূমিকা হল স্বাবলম্বন নিয়ে সফেন, ক্লান্তিকর বাক্য-স্রোত। আত্মশাসন ছাড়া স্বাবলম্বী হওয়া যায় না। আয় বুঝে ব্যয় করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তারপর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যাতে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই শুধু জাতীয় সম্পদের পুনর্বণ্টন হয়; এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্মম হতে পারলে তবেই মহত্তম সমতা এবং আত্মসম্ভ্রমবোধের প্রমাণ পাওয়া যাবে। কারণ একমাত্র এই উপায়েই ভিক্ষাবৃত্তির বিড়ম্বনা এড়ানো যেতে পারে।

অঙ্কটা খুবই সহজ। বিদেশী খাদ্যের আমদানি না-করেও দুর্ভিক্ষ এড়ানো যায়, যদি দেশের যে-সব অংশে খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে, সেখান থেকে তা সংগ্রহ করে অভাবগ্রস্ত অংশগুলিতে সমানভাবে বেঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিদেশী পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের ব্যবহার আমরা বাদ দিতে পারি—অথবা সেগুলির ওপর আমাদের নির্ভরতা আমূল কমিয়ে আনতে পারি, যদি বরাদ্দ বেঁধে দেওয়ার নিয়ম কঠোর হাতে কার্যকরী করা যায়, পেট্রলজাত শক্তি ব্যবহারের ধাঁচটা পাল্টানো যায়, এবং আমাদের যা আছে তাকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগানো যায়। বিদেশী যন্ত্রপাতি, স্পেয়ার পার্টস ও মালমশলার চাহিদা কঠোরভাবে হ্রাস করা সম্ভব; কিন্তু তাহলে সমাজের ওপর দিকের একটি ভগ্নাংশের ঈপ্সিত বহুবিধ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়। বর্তমান শিল্পব্যবস্থাকেই আরো বেশি ফলপ্রসূ করা যায়, যদি শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থার মধ্যে যৌক্তিকতা আনতে পারেন, যারা নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য উৎপাদন সীমিত রাখার পক্ষপাতী তাদের কড়া-

হাতে দমন করতে পারেন, এবং শ্রমিকদের তিক্ততা হ্রাস করার জন্য মূল্যবৃদ্ধি রোধে কিছু সৎ প্রচেষ্টা দেখান। খরচের হিসেব নিয়ন্ত্রণে রেখেও উন্নয়নের হার সন্তোষজনক হতে পারত যদি রফতানির পরিমাণ বাড়ানো যেত, কিন্তু তার জন্যও চাই ভিতর থেকে দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ। সক্রিয়ভাবে বৈদেশিক নীতিকে ভুল পথে চালানো না হলে যে-সব দেশ আমাদের সার বা তেল সরবরাহ করতে পারে তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কটা আরো সুষম বিনিময়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারত। অযৌক্তিক আতংককে যদি বিদেশনীতির আবশ্যিক অঙ্গ করে তোলা না হত, তাহলে প্রতিরক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান খরচের অন্ধকূপে দেশের মহামূল্য সম্পদ অর্থহীনভাবে নিক্ষেপ না করে আমরা সেই ধনবলকে ব্যবহার করতে পারতাম দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে। ধনীর আয়কর থেকে ষাট কোটি টাকা যদি না ছাড় দেওয়া হত, তাহলে বিদেশী সাহায্যের অংশ হিসাবে বাড়তি ষাট কোটি টাকা ভিক্ষা করার অপমান আমাদের ঘাড় পেতে নিতে হত না।

কিন্তু আমাদের সরকারের কাছে এ-সব কথার কোনো মানে নেই। সমাজের ওপর দিকের একটি ক্ষীণ অংশ কী চায় আর না-চায় তারই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় শৃঙ্খলার চাইতে এই অংশের বেশি পছন্দ জাতীয় অবমাননা। অর্থ নৈতিক ভিত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে গেলে পণ্যদ্রব্য ও চাকুরির ব্যাপারে, তাদের এখন যে অগ্রাধিকার আছে, তা ছেঁটে ফেলতে হবে; এই সবের পুনর্বণ্টনই জাতিকে বিদেশী জোগানদারির হাত থেকে রেহাই দিতে পারে। কিন্তু শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য সবাই সবচেয়ে আগে চায়। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অন্যদের কাছে হাত পাততে কুণ্ঠিত নয়, সকলের অবজ্ঞা কুড়িয়ে ভিখিরির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে তাদের সংকোচ নেই। অমার্জিত ও স্থূল মনোভাবের নিদর্শন তারা; নিজেদের তাৎক্ষণিক ভালো থাকা তাদের কাছে সব চাইতে বড়ো। জনসাধারণ তাদের এই ভিক্ষাবৃত্তির জাতীয়

লাঞ্ছনার ভাগ নিতে বাধ্য; কিন্তু তার সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে জনগণের বৃহদংশ চূড়ান্ত দুর্দশার স্তরে গিয়ে ঠেকেছে এই তত্ত্ব স্বীকার না করলেও, আরো সরল একটি প্রস্তাবনাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব; তা হল এই যে, মাথাপিছু হিসাবে জীবন-যাত্রার মান জাতির বৃহত্তর অংশের ক্ষেত্রে যেটুকুই বেড়ে থাকুক বিদেশী সাহায্য ছাড়াই তা বাড়ত; অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর অনুপ্রেরণায় জাতীয় সম্মানের যে-বিরাট অবক্ষয় ঘটেছে তার কোনো দরকারই ছিল না।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজগুলো জানাচ্ছে, একটা নতুন পথের হদিশ পাওয়া গেছে: তাহলে এবার কি সাইপ্রাস দয়াপরায়ণ হয়ে আমাদের সাহায্য করতে চাইছে?

৩৯

নেই-দেশের দিনপঞ্জি

কেউ কারু রক্ষক নয়। আপনি আপনার পথ দেখুন, আমি আমার। আমরা পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরি ঠিক তখনই, যখন আপনার স্বার্থ আর আমার স্বার্থ কোথাও গিয়ে মেলে, যেমন, যখন আবিষ্কার করে বসি স্বার্থটা হাসিল করা যায় একই জাতের রাজনীতি বা ফন্দিফিকিরে। যদি আমাদের পরস্পরের স্বার্থে কোনো ভয়াবহ অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, তখনই ঠোকাঠুকি লেগে যায়, চোখ লাল করে তাকাই আমরা পরস্পরের দিকে আর তুলকালাম মুখ ছোটাই। একবার যদি বিশেষ পরিস্থিতিগুলো বাদ দিয়ে দেখা যায়, দেশগুলো ঠিক বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির ভাড়াটেদের মতোই ব্যবহার করে। তার পড়শিদের কী হচ্ছে না-হচ্ছে কেউ যে সে-খবর রাখার সাহস পায় না তা নয়, কেউ বস্তুত তার কোনো তোয়াক্কাই রাখে না।

এ-বিমান ও-বিমান বদল করার মাঝখানে, মালপত্তর হারিয়ে ফেলে, কেউ যখন ভূমির বিমানসেবিকাদের তাড়ায় এক অবতরণিকা থেকে পরবর্তী উপক্রমণিকার মধ্যে হাঁসফাঁস করছে, জেটবিমানে করে বিদেশী-সব নির্বিশেষ সীমান্ত পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে, এই বোধটা উশকে উঠতে থাকে যে ভারতের প্রায় ষাট কোটি লোক আসলে এক প্রায়-অপ্রাসঙ্গিক ডাহা বিরক্তিকর পরিসংখ্যানের বিন্দু। দুর্যোগ, দুর্বিপাক—প্রাকৃতিক বা মনুষ্যরচিত—এখনও শিরোনাম হয়; যাত্রীভর্তি একটা বাস কোথায় কোন্ খাদে পড়ে গেছে, কোন্-এক দূরদেশের উপকূল ঝাঁটাচ্ছে বেলেল্লা ঘূর্ণিঝড়, দেশ থেকে দশ-পনেরো হাজার মাইল দূরে কোথাও-না-কোথাও মার্কিনরা যে সব সময়েই চৈতন্যহীন বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে

সেখানে ঘটেছে নতুনতম কোনো নৃশংস ও নির্বিচার হত্যা। কিংবা কাগজে বেরিয়েছে অদ্ভুত কোনো খবর বা দৃশ্য : একটা ট্রেন কোথায় যেন একটা গোরুকে ধাক্কা দেয়, ট্রেন থেমে যায়। ক্রুদ্ধ যাত্রিরা থেমে পড়ে গরুটাকে পাকড়ে কেটে-কুটে তার মাংস ঝলসে খেয়ে ফ্যালে : দূর হিমালয়ের ওপরে জনৈক রাজা বীরেন্দ্রর অভিষেকের প্রহসন ঘটে গেল, জনৈকা জ্যাকেলিন বুভিয়ে কেনেডি ওনাসিস পর-পর তৃতীয়বার তার স্বামী সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে—এবার সম্ভবত কোনো আরব শেখ।

এ-রকমই সরল সোজা ব্যাপারটা। যখন কয়েক হাজার লোক অনাহারে মরে ভারতে, সেটাও একটা দৃশ্য বটে, আমরা খবরে উঠে গেছি। যখন ভারতের শাসকশ্রেণী কোনো পারমাণবিক উদ্ভাবন ফাটায়, এটাও তখন আরেক খবর, এমন-একটা দেশের সে দৃষ্টান্ত যে নিজেকে দু-বেলা খাওয়াতে পারে না, অথচ তবু তার কী অহং আর ধৃষ্টতা দ্যাখো, একটা পারমাণবিক বোমা বানাতে যাচ্ছে—এ-যে ভাত দেবার কেউ নয়, কিন্তু কিল মারবার গোঁসাই। তবে ভারতের সঙ্গে এমনতর সাক্ষাৎকার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত, বেশি সময় নেয় না। অন্য অনেক দেশ আছে, অন্য অনেক খবর, সরাসরি ভাবিয়ে তোলার মতো অন্য-সব ঘটনা। তো, আপনি, দাদা, কেটে পড়ুন ; কেউ কারু রক্ষক নয়।

তাছাড়া, এ তো আরবদের দশক। আর পেট্রল-বেচা টাকার। বারো কোটি আরব—সমগ্র জনসংখ্যার এমন-কি শতকরা তিনভাগও নয়। কিন্তু তাতে কী। শেষ অব্দি অবশিষ্ট জগৎকে তো তারা পেয়ে গেছে হাতের মুঠোয়, আর নয়তো, বলতে পারেন, পায়ের তলায়, এবার একটা হিসেবনিকেশ হবে, একটা হেস্তনেস্ত। কিচ্ছু ভুলে-যাওয়া হয়নি ; নেপোলিয়ন-বোনাপার্টের আমল থেকে ইউরোপীয় বোম্বেটেরা যে-অপমান যে-নিগ্রহ চাপিয়েছে। পশ্চিমী অভিধান-গুলোয় তথাকথিত যৌন অনাচারের বিষয়ে বাঁকা কটাক্ষ, মার্কিন চলচ্চিত্র যেখানে বদমায়েশটা সব সময়েই আরব শেখ, নোংরা মনের

কাফিরদের ঘিনঘিনে ড্যাবডেবে চোখের সামনে আরব মেয়েরা যেভাবে বাধ্য হয়েছে তাদের উদর নগ্ন করে দেখাতে—সব মনে আছে; অবশেষে, এখন শোধ নেবার পালা। এক শশব্যস্ত দিশেহারা হেনরি কিসিংগার যখন এক আরব রাজধানী থেকে পরেরটায় পড়িমরি ছোটে, খবরের এই একমুখিনতা তাক লাগিয়ে দেয়। আচমকা, আস্ত জগৎটাই নিলেমে চড়েছে, আরবদের কাছে বিকিয়ে দেয়া হবে, তাদের আছে পেট্রোল, অতএব টাকা। হয়তো চিরকালই জগৎ বিক্রির জন্য ছিল—যারা তার ঠিক দর হাঁকতে পারত, তাদের কাছে। কিন্তু আরবদের কাছে, এ এক মধুর প্রতিশোধ: যেখানে চেয়েছিল, ঠিক সেখানেই পেয়েছে কাফিরদের।

এই চিত্রনাট্যে এখনও ভারতের কোনো ভূমিকা নেই, দেখে মনে হয়, ভারতের নামও কেউ শোনেনি। তা নিশ্চয়ই নিছক পেট্রোলের অভাবেই নয়। অন্য অনেক দেশই, পেট্রোল ছাড়াই, বেশ চালিয়ে যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক সমাবেশে তাদের আর্জির শুনানিও হয়। পেট্রোল না থাকার শূন্যতা পূর্ণ করে দেয় অন্য গুণপনা, যেমন তাকলাগানো অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অথবা কোনো আদর্শ আঁকড়ে থাকার সচ্চরিত্র, কিংবা হয়তো নিছক ভদ্রশালীন মার্জিত ব্যবহারই। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে ভারতের পুঁজির পরিমাণ ছিল প্রায় এখনকার মতই চোপসানো কিন্তু তার ছিল এক মহান সংগতি: সে ছিল সকলের মন খুলে কথা বলার মতো অবারিত এক কনফেশন-কুঠুরি। একবার কৃষ্ণ মেননকে সরিয়ে দিতেই, এই বিবেকের পেশাটাও ভারতের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে নাগালের বাইরে। শূন্য হারের অর্থনৈতিক বিকাশ বড়ো দুর্বল ভিত্তি, এর ওপর নির্ভর করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চাকরি জোটানো বড়ো মুশকিল। পারমাণবিক মুদ্গর নিদেন ব্যাজার কিছুটা শ্রদ্ধা জোটাতে পারত, যারা ঐ পরমাণু ফাটিয়েছে তারা নিশ্চয়ই এই আশাটার ওপর বড়ো একটা বাজি ধরেছিল, তার বদলে সে আনল নিছক তাচ্ছিল্য অপমান আর বাঁকা হাসি: পরমাণু ফাটানো, আর অনায়াসে দেশের কোটি-কোটি লোকের হাজার হাজারকে অনাহারে

মরতে দেয়া—এই দুটোর মিশেলকে কুরুচির চূড়ান্ত নিদর্শন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

যদি তাদের কব্জা করতে না-পারো তো তাদের দলেই যোগ দাও। প্রায় প্রত্যেকেই—এমনকি কাল অব্দি যে ইজরেএলের তেরিয়া সমর্থক ছিল, সেও বাদ যায়নি—লাফিয়ে গিয়ে উঠেছে আরবদের সার্কাসের গাড়িতে, আর নিজেদের দু-মুঠো জোটার সমস্যাটার সুরাহা করছে। আমরাও বিস্তর চেষ্টা করে যাচ্ছি ; নয়া দিল্লির মন্ত্রীরা অবিরাম যাচ্ছেন—আসছেন মেলিনা মেরকুরির ধরনে, অতিথি হবার জন্য উল্টে নেমন্তন্নও করছেন আরব শেখদের। এটা, অবশ্য, ভুঁইফোঁড় রামুর গল্পেরই দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে। দৃশ্যটা মনে করবার জন্য কোনো কম্পিউটারও দরকার নেই—কয়েক বছর আগেও হাজার-হাজার অপমান ছেটানো গেছে—আরবরা সয়েছে আর চিল্লানেসরাস ভারতীয়রা ছিটিয়েছে। নয়া উপনিবেশবাদী যথাযোগ্য অবজ্ঞার সে যে কী জমকালো প্রদর্শনী! ওহ, আবুধাবি, বাহ্‌রাইন—হুম, ওগুলো তো সে-সব জায়গারই নাম যেখান থেকে চোরাকারবারিরা আসে ; চোরাকারবারি, সোনাচোর, তাসজুয়াড়ি, নিদেন মামুলি ফেরেব্বাজ কতগুলো, আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে মিশে মান খোয়াতে পরি না। আরবরা ছিল অপমান আর অবজ্ঞা কুড়োবার জন্যেই। পশ্চিমী বিমানসংস্থাগুলোর একচেটে ব্যবসার কায়েমী দাপট কমাবার জন্য আরবরা এক পরিকল্পনায় নেমেছিল, চেয়েছিল আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার (I T L A) নির্ধারিত ভাড়ার ওপর বিস্তর ছাড় দিতে। মহান ভারতীয়রা একেবারে আঁৎকে উঠলেন ; এমনতর কোনো নোংরা কাজ-কারবারে মদত দিতে কি তারা পারেন? আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থাগুলোর জোট চিরকালই কায়েম থাকবে, আর এয়ার ইণ্ডিয়া I A T Aএর শাদা আদমিদের গায়েই লেপ্টে থাকবে, আরবদের সঙ্গে দহরমমহরম করে ঐতিহ্য আর সুনামে দাগ লাগাতে মোটেই রাজি নয়। বস্টন-ব্রাহ্মণবাদের এইসব উদাহরণ—এই-যে ভারতীয়রা দয়া করে কেবল ভগবানের সঙ্গেই মাখামাখি করবেন—বড্ড বেশিবার ঘটেছে। যেই অক্টোবর

১৯৭৩ থেকে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর শুরু হয়েছে অমনি ভারতীয়দের শতচক্ষুতে অনুতাপের অশ্রুজল; কিন্তু অ্যাদ্দিনে বোধ হয় বড্ড দেরি হয়ে গেছে; হয়তো অনুতাপের এই প্রদর্শনীটির পুরোটাই নিছক লোক দেখানো, পুরোটাই নিছক ধাপ্পা বলে বিবেচিত হচ্ছে।

আপনি যখন আপনার পরের বিমানটা ধরবেন বলে বিমানবন্দরে জীবাণুরোধক লাউঞ্জে বসে আছেন, আর আপনার পাশের চেয়ারের গদিটায় ডুবে-বসে-থাকা পাশের ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করেছেন, আপনাকে বিনীত কিন্তু দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দেয়া হবে, ঠিক কোন্‌খানে 'চমৎকার' ভারতীয়রা ভুল করেছিল। পিঠেটা তারা খেতেও চেয়েছে, আবার জমিয়েও রাখতে চেয়েছে : তারা দাবি করেছে তারাই তৃতীয় বিশ্বের অবিসংবাদিত চিরস্থায়ী নেতা হবে, আবার সেইসঙ্গে আড়ালে-আড়ালে বজায় রাখতে চেয়েছে পশ্চিমীদের সঙ্গে গোপন ও ব্যক্তিগত সব লেনদেনের বিশেষ সুবিধে। বিবেকের ঝাড়ুদার হতে চেয়েছে বখরাখোর দালাল, আর তৃতীয় বিশ্বের উত্তম পরিচালনা বাবদ প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদীদের কাছ থেকে চেয়েছে অবাধ লুঠতরাজের একটা টুকরো।

বিবেকের ঝাড়ুদার, বখরাখোর দালাল—দুটো ভূমিকাই এ্যাদ্দিনে পচে গিয়েছে। প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদীরা তদ্দিনই বখবার টুকরো বা হাড়গোড় ছুঁড়ে দেবে যদ্দিন তারা জানবে যে দালালি বাবদ যে-টাকাটা তারা দিচ্ছে তার বদলে ঠিকঠাক কিছু পাবে—যে তুমি সত্যি কিছু দিতে পারবে বিনিময়ে। একবার তুমি তৃতীয় বিশ্বে তোমার পাদানিটা খুইয়ে বসো, অমনি পশ্চিমের মারফৎ কলকাঠি নাড়ার সুবিধেটাও ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যাবে। তুমি IATAর সদস্য, কিন্তু তা তো এই কারণে নয় যে মধ্যপ্রাচ্য বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে অন্ধভাবে অ্যাসোসিয়েশনের মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গদের খামখেয়াল মেনে চলতে হবে। তুমি ভাবতেও পারো না কনফারেন্স শিপিং লাইন্‌স থেকে সরে আসার কথা, যাকে খুশিমাফিক চালাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক শক্তিগুলোই, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অন্যদেশগুলো তোমাকে কবে কোথায় কী মাথার দিব্যি দিয়েছিল যে তারা নিজেরাই স্বতন্ত্র ও

স্বাধীন কোনো কনফারেন্স লাইন খুলতে পারবে না। সেই যে বিলি হলিডে ব্লুজ গেয়েছিল, সেই কোন্ চল্লিশের যুগে, প্রেমিককিশোর, এই অন্যদেশগুলো, তোমাকে ছাড়াই, দিব্যি চালিয়ে নিতে পারবে।

কেউ কারু রক্ষক নয়, তার বেঁচে-থাকার জন্য ভারতের কাছে দোনো দাসখৎ লিখে দেয়নি জগৎ, তার কাছে কিছু তারা ধারেও না—তার তথাকথিত মহীয়ান ঐতিহ্য ও সভ্যতা সত্ত্বেও। নিজেই নিজের পথ ছ্যাখো-না বাপু। অল্প, সীমিত কিছুদিনের জন্য তুমি পরের কাঁধে চেপে চলতে পারো, ক-র কাছ থেকে একটু বখরা বা খ-র কাছ থেকে ট্যাঁ-ফো না-করার জন্য ছুটি কড়ি, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজার ক্রমেই আরো নিখুঁত সুঠাম হয়ে উঠেছে, দালালদের ভূমিকা ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে, অবান্তর হয়ে যাচ্ছে, আর এমনিতেও তো যত নিচের দিকে নামে তত বখরার হার কমে যায়, যেহেতু বাজার নতুন-কোনো, অভিনব-কোনো মূল্য তৈরী-করা বন্ধ করে দিয়েছে—এমনকি তথাকথিত বিনিময়-মূল্য শুদ্ধু—বেঁচে থাকার জন্য ওগো প্রেমিককিশোর, তোমাকে এবার কিন্তু উৎপাদনের যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসতে হবে, কেননা উৎপাদন আসলে যাবতীয় মূল্যের উৎস।

যতই ব্যাজার বা অনিচ্ছুক হোক, যারা দিশে-দেখানো সিদ্ধান্তগুলো নেয়, আসল সিদ্ধান্তগুলো নেয়, তাদের এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবেই। কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই, কারণ মুখরোচক না-হলেও ধরাবাঁধা কাজগুলো শেষ করতেই হয়—প্রায়-শূন্য তলটি থেকে স্বদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের হারটিকে বাড়াতে হয়। আর তার মানেই আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোটির সম্পূর্ণ ওলোটপালোট চাই, আর তাই চাই শ্রেণীসম্পর্কের কাঠামোরও পুনর্বিন্যাস। এর প্রত্যেকটা কথাই চিরচেনা, ধরতাই বুলি, হেজে-যাওয়া ক্লিশে, কিন্তু ক্লিশেগুলোর বদ্‌লি পাওয়াও দুষ্কর। ক্লিশের জৌলুশ নেই; সাধারণত সত্যেরও থাকে না।

৪০

বিশ্বের সবেধন হিন্দুরাজত্ব

এ একেবারে বিশুদ্ধ কাফকা : যেখানেই আপনি যান-না কেন, যে-দিকেই আপনি ফিরুন-না কেন, সে-কোন্ দরিদ্র দেশে আপনি এ-মুহূর্তে আছেন, কিচ্ছু ভাববেন না, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঠক্রম বা আলোচনাচক্র থেকে আপনার রেহাই নেই। যে দেশে এ-রকম পাঠক্রমের যত ছড়াছড়ি, যত বাড়াবাড়ি, সে-দেশে অর্থনৈতিক বিকাশের হারও বোধহয় সেই অনুপাতেই বিরল। কিন্তু এমনতর বিশ্বনিন্দাবাদ অর্থনীতিবিদ্‌দের অতিরিক্ত-জোগানে-জেরবার জগৎটির রীতিনীতি মোটেই পালটায় না; সে অর্থনীতিবিদ্‌দের বেশ-কিছু তালেবর ব্যক্তিই আবার, ধরে নেওয়া যায়, এ-দেশ ও-দেশের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সেদিন, নেপাল সরকারের চাকুরেদের চাহিদা মেটাতে আয়োজিত এ-রকমই এক পাঠক্রমে এই প্রস্তাবটি নিয়ে তুলকালাম তর্ক উঠেছিল। 'আমি যদি নেপাল রাজ্যের স্বর্গভূমে না জন্মাতুম তবে আমি ভারতে না জন্মে চীনে জন্মাতে চাইতুম।' এই আর্ষবাক্য অবশ্য উৎরোয়নি—তবে প্রায় গৃহীত হয়ে যাচ্ছিল আর কি : সমবেত আমলাদের রায় ছিল সাতের বিরুদ্ধে ছয়, দু-জন কোনো ভোট দেয়নি। ভারতীয় দূতাবাসের চামচারা আড়ালে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল : তাদের হাঁফ ছাড়ার আওয়াজ নিশ্চয়ই রক্সৌলি পেরিয়েও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

এই ভোটাভুটিই মোটামুটি বুঝিয়ে দেয় এখানকার দশা। ভারতীয় উপস্থিতি এখনো রাজনৈতিক ভারসাম্য হেলিয়ে রাখে, কিন্তু কোনোক্রমে —আবারও এটা একেবারে বিশুদ্ধ কাফকা : যেদিকেই মুখ ফেরাক-না কেন, লোকে এখানে ভারতের কবল এড়াতে পারে না। কাগজে-কলমে

দেশের যা রপ্তানি, তার শতকরা নব্বুই ভাগ যায় ভারতে ; আর ওখান থেকে আমদানি হয় পাঁচভাগের চার ভাগেরও বেশি। সরকারের বাজেটের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি টাকা আসে ভারতের সাহায্য ভাণ্ডার থেকে। নিম্নতরাইয়ের বিশাল অপ্রতিহত প্রসার—তার পাঁচশো কিছু মাইলের সবটাই, ভারতকে হাতছানি দেয়, ভারতেরই ছায়ার তলায় জিরোয়, ভারতের কাছ থেকে শুড়শুড়ি পায়, ভারত কর্তৃক প্রতিহত হয়। তল্লাটটা পুরোপুরিই চোরাচালানকারীদের স্বর্গরাজ্য। তৎসত্ত্বেও, আপনি রাজনীতিক ও সরকারি আমলাদের সঙ্গে কথা বলুন, দেখবেন তারা পুরোপুরি মনঃস্থির করতে পারেনি এই চোরাচালানকারীদের নিয়ে তারা কী করবে—ঘৃণা করবে, না বুকে জড়িয়ে ধরবে ; চাল উধাও হয়ে যায় ভারতে, সেটা খারাপ, কেননা তাতে সীমান্তের এ-পারে অভাব দেখা দেয়, ঘাটতি দেখা দেয়, তবে এর একটা ভালো দিকও আছে, কেননা তাতে ভারতীয় টাকার সমতায় ভাঁটা পড়ে না। চোরাকারবারিরা, তাছাড়া, ভারত থেকে নিয়ে আসে প্রচুর কাঁচা পাট, যেটা আবার রপ্তানির সাজে দেশ থেকে বেরিয়ে যায়, আর অভারতীয় বিদেশী টাকা পাবার সেটা একটা প্রধান উৎস। বাহুল্য বলা যে রাসায়নিক তন্তুতে তৈরি কাপড়ের সুপরিজ্ঞাত মামলাটাও আছে—তাছাড়া আছে চীনে ঝর্নাকলম ও কাপড়ের ব্যবসা। নেপাল টিঁকেই আছে বজ্জাত ও ধুরন্ধর ভারতীয় চোরাকারবারিদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর উদ্ভাবনী শক্তির ওপর, আর, শাসককুলের ওপরমহলের কথা অনুযায়ী নেপাল তাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে ; সে ঘৃণা করে তার নিজের অসহায় অবস্থাটাকে। সিরিল কনোলিই বোধ হয় বলেছিলেন—যে-কোনো মুহূর্তে খবর নিন, দেখবেন লোকে নিজেকে ঘৃণা করছে ; এ-সব মুহূর্তের যোগফলই জীবন। নেপালের বুকে আঁচড় কাটুন : সম্ভাবনা আছে যে সবখানেই আপনি এই একই মনোলিপি উৎকীর্ণ দেখতে পাবেন।

ফাঁদে-পড়া, চারপাশের ভূখণ্ডের মধ্যে বন্দী, কোনো দেশের দমবন্ধ অনুভূতির মনস্তাত্ত্বিক অনুমোদন আছে। কিন্তু সীমান্তের ওপারে, দক্ষিণ থেকে একটানা যে বর্বরতা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা এই

অবস্থাকে আরো ঘোরালো ও বেসামাল করে তুলেছে; গোষ্ঠীগতভাবে ভারতীয়রা বিশ্বের সবেধন হিন্দু রাজত্বটিকে একেবারে ধরেই নিয়েছে, বিশেষত যেহেতু ঐতিহ্য অনুযায়ী দেশটাকে দেশান্তরিত রাজপুত আর কুমায়ুনের ব্রাহ্মণদের ঢেউয়ের পর ঢেউ শাসন করে এসেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে যে-ষড়যন্ত্রকারী রাজারা দেশটাকে দাবিয়ে রেখেছিল, তাদের হাতের মুঠো থেকে উদ্ধার করে নেপাল বিষয়ে আর কিছুই ভাবেন নি জওহরলাল নেহরু। এ দেশ তাঁর অবশিষ্ট জীবদ্দশায় যে-কোনো দূর মহলের মতোই—যেমন ধরুন গোরখপুর জেলা—অশরীরী বা অলীক হয়ে উঠেছিল। এখন যখন তথাকথিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে নাকচ করা হয়েছে, নির্মমভাবে যখন ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে নেপাল জাতীয় কংগ্রেসকে, ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত তারা ভারতের কিছু-কিছু দুর্দশায় তির্যকভাবে আমোদ পেতে ছাড়ে না। যে-কোনো ভারতীয় অস্বস্তি—তা সে চীনের সঙ্গে যুদ্ধই হোক অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে হুকিতেই হোক—তাদের রুদ্ধ আবেগকে খুলে দেয়। না, অমিতব্যয়ী নন্দন পিতার পক্ষপুটে ফিরে আসতে চাইছে না—সুদূর ইতিহাস, সুদূর ইতিহাসই; আর কে কোত্থেকে দেশান্তরী হয়েছে সে নেহাৎই আপতিক এক পুরোনো কাশুন্দি যা নেপালের রাষ্ট্রকাঠামো রূঢ়ভাবেই গা ঝেড়ে ফেলে দেবে: তারা দাবি করে নেপালের স্বতন্ত্র প্রাতিস্বিকতার জন্য যোগ্য সম্মান—যা, তাদের সন্দেহ, মাঝে-মাঝে ইন্দিরা গান্ধির সানুগ্রহ সফর সত্ত্বেও, ভারত কিছুতেই তাদের দিতে চায় না।

অথচ, তবু, নেপালের সামনে প্রায় কোনো পথই খোলা নেই। দেশটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে বেহেড বেআক্কেলে বিদেশী জমি, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঁচু দূরাক্রম্য পর্বত, যার প্রধান রপ্তানি শুধু পাথর আর কাঠ, অন্ধ আক্রোশ তার কাছে একটা বর্জনযোগ্য বিলাস। নৃশংস রাজস্থানী সওদাগরদের ওপর তাই নেলসনি চোখ মেলে তাকাতে হয়; যত রূঢ় আর অসামাজিকই হোক-না কেন সর্দারজিদের ব্যবহার—তারাই তো প্রায় পুরো পরিবহণ ব্যবস্থাটার মালিক—তাকে মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। কারণ, সামনে যতদূর চোখ যায়, মনে হয়, চীনের

সঙ্গে তাৎপর্যময় অর্থনৈতিক লেনদেনের বিকল্পটা দিবাস্বপ্নই থেকে যাবে। লাসার সড়ক—যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার সাম্প্রতিক সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও—এখনও বেদম সুদূর; কিন্তু যে-সব পণ্যে নেপালিরা আগ্রহী তাকে আরো উত্তর থেকে আসতে হবে—চীনের একেবারে পূর্ব মহাল থেকে। ইদানীং কালে চীন থেকে যে-সব মাল এসেছে, তা বস্তুত এসেছে সমুদ্রপথে, হংকং থেকে কলকাতা, এবং সেখান থেকে মোহর-করা বন্ধ ওয়াগনে করে নেপাল সীমান্ত। এ-সবও এসেছে, প্রধানত, উত্তরের পড়শিদের একতরফা পণ্যমঞ্জুরি অনুদান থেকে, কিংবা চীনের উদ্যোগে নির্মীয়মাণ সড়ক প্রকল্পের জন্য স্থানীয় মুদ্রার বদ্‌লি হিসেবে। চীনের এই ভঙ্গিমার এক গুণক প্রতিক্রিয়া হয়েছে, কারণ এভাবে যে ঝর্নাকলম আর কাপড়চোপড় পাওয়া গেছে, সব চোরাপথে গিয়ে পৌঁছেছে বিহারে বা পশ্চিমবঙ্গে, নেপালের ভারতীয় মুদ্রার ভারসাম্য বাড়িয়েছে। কিন্তু এ তো সামান্য কিছু খুচরো। আপাতত, নেপালে এমন-কোনো পণ্য নেই যা কিনতে চীনের কোনও আগ্রহ থাকতে পারে; এমন কোনো পণ্য যদি আবিষ্কারও করা যায়, পরিবহণ-মূল্য এক অনতিক্রম্য সমস্যা দাঁড় করাবে।

অবসন্ন, মন-খারাপ, উৎকণ্ঠিত, নেপাল তাই ফিরে আসে ভারতেরই কাছে। কয়েক বছর পর-পর বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দরাদরি উত্তেজনাও অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। কলকাতার জাহাজঘাটায় নেপালগামী পণ্যের জন্য কতটা জায়গা তুলে রাখা হবে, অথবা কী থেকে গজায়—কিংবা গজায় না—বাণিজ্যিক বিপথগামিতা, তা নিয়ে তর্ক বাধে, কিন্তু এ-সব বিপদঝন্‌ঝনার সমাপ্তি পূর্বনির্দিষ্ট: এরিক অ্যামলারের রোমাঞ্চ কাহিনীর ক্ষুদে মস্তানদের মতো, নেপালি আমলারা লুফে নেয় যা-কিছু ঝড়তি-পড়তি বাড়তি বিদায়ী তাদের দিকে ছড়াবে বলে পেল্লায় প্রতিবেশী ঠিক করে দেয়, আর দেশে ফিরে এসে ব্যাজার হয়ে থাকে। বাংলাদেশ একটা মনোগ্রাহী পথ খুলে দিতে পারত সমুদ্রের দিকে, কিন্তু ভারতের চেয়ে ভালো শর্ত দেয়ার অবস্থা তার নেই, আর সীমান্ত এলাকায় কাঁচা পাট নিয়ে যে ইধার-উধার-কারবার চলবে তাও সে তেমন সুনজরে দেখবে না।

মার্কিনরা আসতে পারত, কিন্তু আসেনি, না-এসে বরং সেই একটা অন্য রাজত্বে গেছে, তাইল্যাণ্ডে, খোলা সমুদ্র বা ভিয়েৎনাম তুটোই যার নাকের ডগায়। অন্য পরিস্থিতিতে সোভিয়েত দেশ একটা জুতসই বিকল্প হত, কিন্তু চীনারা, তুর্ভাগ্যবশত সেটা মোটেই পছন্দ করবে না। যদি এমনকি সম্ভাব্য অর্থনৈতিক লাভের তুচ্ছ প্রকৃতিটাকেও উড়িয়ে দেয়া যায়, চীনের সঙ্গে বেশি মাখামাখির আবার জটিল রাজনৈতিক ফলাফল আছে : চীন যদি মনে ধরে যায় লোকের এবং একটা আভ্যন্তরীণ মহামারী শুরু হয়ে যায়—রাজত্ব নিয়েই তখন টানাটানি পড়বে। অ্যাদ্দিন ধরে ব্রাহ্মণ, মারোয়াড়ি আর শাহরাই কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় আর সব উর্বর তরাইতে একচেটেভাবে কায়েম হয়ে বসেছে, তারা আমলাতন্ত্রে ও অন্যসব পেশাতেও উঁচু গদিগুলো দখল করে বসে আছে। অ্যাদ্দিন অব্দি, উপজাতিগুলোর মতোই গুরুং আর গুর্খা আর ঠাকালিদের ভূমিদাস হিসেবেই ব্যবহার করা গেছে, আর তাতে কোনো আপত্তিও ওঠেনি ; কিন্তু, কে জানে, একবার যদি উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করে, কোত্থেকে কী হয়ে যাবে, কোথায় কোন্ ধস নেমে বসবে—বিশেষত এদিকে, যখন এ-সব উপজাতির অনেক লোকই বিদেশ গেছে, অন্যান্য দেশে ফৌজেপলটনে বা পুলিশে কাজ করেছে, আর ভ্রমণের দিকদারিও অনেক—সে তো মনের প্রসারটাকেও বাড়িয়ে দিতে পারে। নেপালে অঙ্গুলিমেয় শাসকরা সে-ঝুঁকি নিতেই পারে না।

কাঠমাণ্ডুর স্থায়ী সুর তাই একটা ব্যাজার, গোমড়া, হালছাড়া ভাব। এখানে আপনি ততটাই অভাব, হতশ্রী, তুঃসহ পীড়ন আবিষ্কার করবেন, যতটা করবেন কাটিহারে বা খিদিরপুরে ; এখনও তা প্রাসাদ-বিলাসী বা হোটেল সোয়াল্‌টির মরশুমি বিদেশী উপদেষ্টাদের ছোঁয় না ; তবে কেউ কি জানে সে-কোন্ লগ্ন প্রত্যাসন্ন, ঠিক কতটা দেরি হয়ে গেছে। মার্কিন তরুণ-তরুণীরা—পর্যটন ব্যবসার এরাই তলানি—এখনো হাওয়াই জাহাজ ঠাসাঠাসি হয়ে গাঁজার খোঁজে আসে, কিন্তু এখানেও অধিক জোগানের ফলে মুনাফা লোপাট হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের জোরকদম মূল্যবৃদ্ধির অস্বস্তিকর তুঃসংবাদ ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে

পৌঁছোয়। কাগজে-কলমে নেপালের উদ্‌বৃত্ত চালের বার্ষিক গড় তিন লক্ষ টন, যা ভারতে পাচার হয়, আর ধনীদের সব বিলাস বা আধা-বিলাস ভোগ্যপণ্যের আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির দাম জোগায়। এই অভাবের বাজারে, ভারত হয়তো আরো খাদ্যশস্য নিংড়ে নেবে—সেই বিপদটাও এখন চেতিয়ে উঠছে—আর তার মানে, ভেতরের তরাইতে আর দূর পাহাড়গুলোয়, উপজাতিদের জন্য ততটাই খাদ্য কম পড়বে। অতীতে, দাসানুদাস কীটাণুকীট এই হতচ্ছাড়াদের খাদ্যাভাবে কিছুই এসে-যায়নি। এখন থেকে, কে জানে, কিছু-একটা হয়ে যেতেও পারে।

৪১

প্লাস্টিক সার্জারি বিলকুল বরবাদ

অস্ট্রেলিয়ার এক সমাজতত্ত্বের অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় হংকং বিমানবন্দরে। এ-দেশগুলোর বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা আপনি বিচার করতে পারবেন অধ্যাপক গুনগুন করেন, বেশ্যারা কী দর হাঁকে, তাই দেখে। ব্যাঙ্ককে, ক্ষিপ্ত একটা বছরে, কোনো কলগার্লের একঘণ্টার ভাড়া কুড়ি থেকে দশ ডলারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে; সংবাহন-শালাগুলো সব অতীতের ভোজগৃহের মতো পরিত্যক্ত; হোটেল-গুলোয় লোক থাকে মাত্র তিরিশ ভাগ; কতগুলো নতুন হোটেল তৈরি হচ্ছিল, মাঝপথেই এখন কাজবন্ধ; ১৯৬০-এর শেষাশেষি বিপুল ও জমকালো ভিয়েৎনামি বাজার গরমের সময় যারা দু-পয়সা কামিয়েছিল, তারা এখনও একটা নির্মাণসূচি জিইয়ে রেখেছে, কিন্তু একবার এই বাড়িঘর বানাবার হিড়িক শেষ হয়ে গেলেই অবস্থা আরো বিগড়ে যাবে; আর, উটের পিঠে শেষ খড়, চালের রপ্তানিদরও ঘাড়মুখ গুঁজড়ে পড়ছে।

লিণ্ডন বেইন্‌স যে চকমেলানো সৌধ বানিয়েছিল, রিচার্ড মিলহাউস, প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হবার একান্তই স্বার্থপর কারণে, তাকে তড়িঘড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ এখনো পুরোপুরি গুটিয়ে আনা হয়নি বটে, কিন্তু এখন সে পুরোপুরি পুঁজি-প্রধান হয়ে উঠছে। মার্কিন ছোকরারা আর লড়বে না—জোরজুলুম করে তাদের যে ফৌজে ধরে আনা হবে, তাতে তারা একান্তই নারাজ; যদি জবরদস্তি করে তাদের ভিয়েৎনামের জাহাজে উঠতে বাধ্য করা হয়, তারা তবে হয় প্রতিরক্ষাদপ্তরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, নয়তো হেরোইন অভ্যাস করে। স্থানীয় বাটপাড়দের হাতেও আবার

যুদ্ধের ঠিকেদারিটা দিয়ে দেয়া যায় না। 'ভিয়েৎনামীকরণ' ত্বরিতেই তো ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে; সায়গনের স্যাঙাৎরা ডলার আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু লড়বার মতো মনোবল তাদের কখনোই ছিল না, মাঝখান থেকে অস্ত্রশস্ত্রগুলো পুরোপুরি গিয়ে পড়েছে দুশমনদের হাতে। এই একই কেচ্ছার পুনরাবৃত্তি হয়েছে কম্বোডিয়ায় আর লাওসে। বেগতিক অবস্থায়, অগত্যা, মরিয়া ওষুধ চাই। নিক্সন যুদ্ধটাকে আদ্যোপান্ত বিমাননির্ভর করে তুলেছে। খরচ বেশি পড়ে বটে, তবে তেমন লোক লাগাতে হয় না। এতে সম্পদের অপচয় ঘটে, ম্যাকনামারার বিখ্যাত মূল্য উশুল করার তত্ত্বটি অর্থহীন প্রমাণিত হয়; বোমা, বিমানচালক, ও ছত্রীবাহিনীর সময়বণ্টন বিমানের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি যাবতীয় উপসঙ্গ বাবদ ১,০০০,০০০ ডলার খরচ করে বসেন আপনি—কেন? না দশ ডলার দামের একটা কুঁড়েবাড়ি উড়িয়ে দিতে, অথবা দলছুট কোন মোষ বা কুকুর মারতে। তবে তাতে অন্তত জনসংখ্যার খরচটা বাঁচে, বেশির ভাগ ছোকরাকেই জাহাজে তুলে দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনি, নভেম্বরের প্রথম সোমবারের পরেকার দ্বিতীয় মঙ্গলবারের মধ্যেই।

যুদ্ধ চলতে থাকে; ভিয়েৎনামের গরীয়ান খুদে মানুষরা—অপরাজেয় তাদের আত্মা—লড়াই চালিয়েই যায়, কিন্তু মার্কিনরা প্রধানত দেশে চম্পট দিয়েছে, অথবা দিচ্ছে। তাদের চলে যাবার ঢেউ ধরে, দূরপ্রাচ্যের তুচ্ছ নগণ্য দেশগুলোকে পাকড়ে ফেলছে এক বিষম সংকট—গত দশ বছর ধরে এই দেশগুলো বেঁচেছিল আক্ষরিকভাবে অথবা অন্যভাবে, মার্কিনদের অসৎপথে দোহন করে উপার্জিত অর্থের ওপর। সে ব্যাঙ্ককই হোক, সায়গনই হোক অথবা ম্যানিলা—কাহিনীটা একই রকম। সায়গনের জীর্ণ গণিকারা আজ নেমে এসেছে প্রায় অনাহারের বিপাকে; মহান মার্কিন বেশ্যাসক্তির ঝলমলে দিনগুলোয় কোনো গণিকা যত আয় করতো, এখন করে তার মাত্র এক-দশমাংশ, কিন্তু বাড়িউলি 'মদাম' ছাড়ে না—সে তার উপার্জন এক পয়সাও কমাতে রাজি নয়—দালাল আর পুলিশরাও তাই। আর মার্কিনরা পেছনে

রেখে গেছে অবৈধ জাতকদের এক বিপুল ফসল—তাদেরও তো জিইয়ে রাখতে হবে। দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোয়, এখানে-ওখানে, অপ্রত্যাশিত কোনো রাস্তার মোড়ে, হঠাৎ-হঠাৎ, আপনার চোখে পড়ে যাবে পার্ল বাকের সংগঠনের দীন সব কার্যালয়—এক্রন, ডেটন বা ক্যানসাস সিটির দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাইদের ধর্মভীরু পরিবাররা যাতে দত্তক নিতে পারে এদের, তারই ব্যবস্থা করে এ-সব আপিস। সমস্যাটার বিপুলতার তুলনায় চেষ্টাটা নেহাৎই খোলামকুচি। কোথায় গেলেন, কেউ ভাবতে পারেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পূজারীরা? তাদের এই সংগ্রাম কি শুধু শাদা অ্যাংলো-স্যাকশন প্রটেস্টান্ট (WASP) বা ঐ ধরনের কোনো সমাজে আবদ্ধ—mrs কথাটা থেকে r খশিয়ে দেওয়াটাই বুঝি সব? এই নারীমুক্তির আদি ও চূড়ান্ত বাণী কি হবে কোনো মেডেনফর্ম অন্তর্বাসের দম আটকানো বন্ধন ঝরিয়ে ফেলার হাস্যকর সমান্তর? এই নারীমুক্তিকামিনীরা কি আদৌ জানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকানরা জগৎজুড়ে যে কুকর্ম আর অনাচার চালিয়েছে, তার মধ্যে দূরপ্রাচ্যের দেশের পর দেশে তারা যেভাবে অবজ্ঞাকুটিল, পাইকিরি, প্ল্যানমাফিক অত্যাচার চালিয়েছে নারীজাতির ওপর, নিছক পাশবিকতার ক্ষেত্রে কোথাও তার কোনো তুলনা নেই? মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো আর মার্কিন শাসককুল মানবাত্মার পবিত্রতা বিষয়ে সারাক্ষণ ফুলঝুরি ছিটোয়: সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ডাহা মিথ্যে কথাটি উচ্চারণ করতে তাদের জিভে আটকায় না; খবরকাগজ, বেতার, টি-ভি বাণী ছোটায়, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ নাকি নিজে থেকে বেছে নেবার স্বাধীনতা বাঁচাবার ও বজায় রাখার জন্যই চলছে। এ-রকম ডাহা-বাজে-কথা-ছিটোনো অসাধুতার যোগ্য পুরস্কার তবেই হয়, যদি পরের জন্মে—পরজন্ম বলে কিছু থাকলে—এরা সবাই তাইল্যাণ্ড, ফিলিপিন্স বা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের চাষী পরিবারের রোগা, কুঁকড়োনো, ভীরু মেয়ে হয়ে জন্মায়; যৌনতা—মার্কিনরা ধরে নিয়েছে—খাদ্যপানীয় বা গোরুভেড়ার

মতোই পণ্য মাত্র, ব্যবসার উপকরণ, মানবাত্মার অথবা মানবদেহের মর্যাদাবোধের কোনো সম্পর্কই নেই। এই তত্ত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে, তাড়া-তাড়া নোটের সমরসজ্জার সমর্থন পেয়ে, দেশের পর দেশকে পরিণত করা হয়েছে গণিকাবৃত্তির মনসবদারিতে। ম্যানিলার জাহাজ-ঘাটার-কাছ দিয়ে হেঁটে যান, দালাল আর বেশ্যাদের অবিশ্বাস্য সমাবেশ দেখে আপনার হয়তো মনে হবে যে নারীদেহের ব্যবসাই বুঝি দেশের প্রধান জাতীয় কর্মোদ্যোগ, অন্তত বিদেশী মুদ্রা অর্জন করার একটা বড়ো উপায় তো বটেই। অন্য আর-কিছুই হতে পারত না: এ-সব দেশের প্রত্যেকটির মুষ্টিমেয় শাসকরা ডলারের প্রলোভনে ভির্মি খেয়ে দেশের অর্থনীতি মার্কিনদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে, উৎপাদনটাকেও তাই হ'তে হয়েছে মার্কিন কামনাবাসনা অনুযায়ীই। মার্কিনরা চেয়েছে ঘাঁটি, আর যাতায়াতের অবাধ সুবিধে, মেয়েছেলে শুদ্ধু। যত মেয়ে চাই, সব পেয়েছে মার্কিনরা, তাদের 'বিশ্রাম' 'বিনোদনের' জন্য। মার্কিন সমরযন্ত্রের নাড়ির গতির ওপর নির্ভর করেই দেশগুলোর অর্থ-নৈতিক ও সমাজিক ব্যবস্থাগুলো রচিত হয়েছিল। যদি, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে আপনার আসল ও আদত অর্থনৈতিক অভিনিবেশগুলো হারিয়ে যায়, তো কী? আপনার পরিবারের কাঠামোটাই যদি ভেঙে পড়ে, তো কী? আপনি যদি আপনার দেশটাকে নারীমাংসের এক বিপুল বাজারে পরিণত করেন, তো কী? মার্কিনরা নগদ টাকা দিচ্ছে তো আপনাকে: তাহলে আপনাকে আবার কামড়াচ্ছে কিসে?

কিন্তু এখন, দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার জন্য, নিক্সনের সুবিধেবাদী গৃধ্নুতা সব বানচাল করে দিয়েছে। সৈন্যরা ফিরে যাচ্ছে দেশে, নৌসেনা ফিরে যাচ্ছে দেশে, মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো পাততাড়ি গোটাচ্ছে, মালমশলার জন্য মার্কিন চাহিদা ও কেনাকাটা পড়ে যাচ্ছে, মার্কিন গেরস্থালিতে চাকরি পাবার জো নেই, জয়েণ্ট ইউনাইটেড স্টেটস মিলিটারি অ্যাডভাইসারি গ্রুপ অথবা আমেরিকান আর্মি সাপোর্ট এলিমেণ্ট-এর আপিসগুলো গুটিয়ে যাচ্ছে। আর, বলাই বাহুল্য, একবার এই সৈন্যরা চলে গেলে তাদের 'বিশ্রাম' বা 'বিনোদনের' আর-

কোনো উপলক্ষও ঘটবে না। হোটেলগুলো ফাঁকা, সংবাহনশিবির বা 'দেহমন্দিরগুলো' শতকরা আশি ছাড় দিচ্ছে; কিন্তু তবু খদ্দের ধরা যাচ্ছে না; পানশালার মেয়েরা আর সবুজপিঠ ডলারের পুরুতাড়ার অথবা দামি পোশাক বা ফরাশি প্রসাধনদ্রব্যের স্বপ্ন ভাখে না, তারা মাথায় হাত দিয়ে ভাবে কোথায় কী করে কখন পরের বারের খাওয়াটা জুটবে। গত ছ-মাসে বেশ্যাদের বয়স এক ঝটকায় দশ বছর বেড়ে গিয়েছে; বিকল্প কোনো পেশার প্রায় কোনো সুযোগই তাদের নেই। তারপর আছে এমন-সব কাজে টাকা খাটাবার করুণ কাহিনী যেগুলো বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে; অনেক মেয়েই, মার্কিন রুচির মনোমতো হবে বলে, প্লাস্টিক সার্জারি করে চোখের বঙ্কিমা কমিয়েছিল অথবা স্তনকে উত্তুঙ্গ করে তুলেছিল। অর্থনীতিবিদ্‌রা ন্যাকামি করে যাকে বলে অন্তর্বর্তীকালীন বেকারিত্ব, তা এইভাবে প্রচণ্ড আকার নিয়ে বসেছে। গত দশ বছর ধরে যে অর্থনীতি বিভিন্ন ধরনের গণিকাবৃত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল, সে যখন সকরুণভাবে কোন ঘুল-ঘুলির ঢাকা খুলে পালাবার পথ খোঁজে, যে-কোনো পালাবার পথ, প্রতিদিনই বড়ো হতে থাকে বেকারদের সারি।

এক বিমানবন্দর থেকে আরেক বিমানবন্দর চলুন, এক শোকাতুর রাজধানী থেকে আরেকটায়। প্রত্যেকটাই আতঙ্কের এক-একটি উদাহরণ: কোথাও আতঙ্ক সুপ্রকাশ, কোথাও বা এখনও চাপা আছে ভেতরে। কেউ-কেউ হুড়মুড় করে পালাচ্ছে, অথবা মরিয়া-সব বেপরোয়া কৌশল আঁটছে। ওয়াকার হিলের জমজমাট গরম বাজার এখন অতীত কাহিনী, দক্ষিণ কোরিয়া সন্তর্পণে হাৎড়াচ্ছে বেঁচে থাকার উপায়, গরিব লোকের মাও‌ৎ সে তুং, কিম ইল সুঙের সঙ্গে দোস্তি পাকিয়ে। জাপান কোনো জলসা বিনাই তাইওয়ানকে তপ্ত ইটের মতো ত্যাগ করেছে, আর তানাকা, চৌ এন লাইয়ের কাছে বিস্তর ক্ষমাটমা চেয়ে অনুনয় করেছে চীন যেন প্রাক্তন পাপীদের প্রতি খুব একটা কঠোর না হয়। হংকঙে, স্টিভ, জিন বা নীল-এর শুঁড়িখানায় তিনপৌয়া মাতোয়াল সাংবাদিকরা আপনাকে একটু চোখ-টিপে বলবে, ব্যবস্থা সব

পাকা ঃ একবার বুড়ো চিয়াং কাইশেক চোখ বুজলেই, এমনকি তাইওয়ানও নিজেই মাতা চীনের পক্ষপুটে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে। তাইল্যাণ্ডেও আজকাল কাউকে পেছনের মায়া ত্যাগ করতে হয়, সিয়াটোর জলজ্যান্ত প্রত্নশালা সত্ত্বেও, তাকে হাল ফ্যাশনের জোটনিরপেক্ষতার দোহাই পাড়তে হয়, এই আশায় যে হয়তো বুলিগুলো চীনের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। মালয়েশিয়া আর সিঙাপুর এখনও নাছোড় নির্লজ্জতার সঙ্গে যুঝে চলেছে, তবে—ভারতীয় কেতায়—হঠাৎ গরিবদের দুর্দশা—প্রতিবেদনে আর আলোচনায়—শাসক ধনীদের প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠেছে, ফিলিপিন্‌সের প্রেসিডেণ্ট মার্কোস এমনকি এই গণ্ডিটার বাইরেও পা বাড়িয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের যেহেতু আর ছ-মাসও দেরি নেই, বিরোধীপক্ষ যেহেতু নির্মমভাবে তার উদ্দেশে গোলাগুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে, মুদ্রামূল্য অবনয়নের সাম্প্রতিক এক ঘোষণা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতির হার যেহেতু এখন শতকরা তিরিশ, প্রেসিডেণ্ট মার্কোস চাপিয়ে দিয়েছে সামরিক শাসনের বজ্রআঁটুনি। এটা হয়তো নিছকই কাকতাল—না কি ঠিক তা নয়, যে সংবিধান সাময়িকভাবে বরখাস্ত ; ফিলিপিন্‌সের জমির ব্যবসায় মার্কিন মালিকানার বৈধতার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেবার এক মাসের মধ্যেই সামরিক আইন জারি হয়ে গেছে। কিন্তু, স্পষ্টতই, মার্কোসের দেয়ালটিকে বাঁচাতে আরো ঠেক চাই, এক্ষুণি, অনিবার্যভাবেই। আজকাল, আশেপাশে, এটা একটা চেনাজানা অছিলা হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা সুকৌশল ছল; ফিলিপিন্‌সের প্রেসিডেণ্ট বাজারে ছেড়েছে গরিবি হঠাও-এর তৎরচিত সংস্করণ, আর বিশেষ করে চাইছে মলয়ালিদের নৃজাতিক আবেগতাড়নাকে উসকে দিতে, যারা এমনিতেই ইস্পানি বংশধরদের তুলনায় আর্থসামাজিক সিঁড়ির একেবারে তলার ধাপে পড়ে আছে। মার্কিনরা, তাই, আর উদ্ধারকর্তা নয় এখন ঃ এখনকার আনকোরা রক্ষাকবচ হল ছেঁদো কথা আর গরম জিগিরের আওয়াজ প্রতিআওয়াজ। আমরা ভারতীয়রা এই অবস্থায় আগেই পা দিয়েছি, গত কয়েক বছরে ঃ অকস্মাৎ কেউ, তাই, আবিষ্কার করে বসে দূরপ্রাচ্যের আবহাওয়া কেমন যেন চেনাজানা, বেশ ঘরোয়ামত।

৪২
দীন দুনিয়ার মালিক

ইবিরাপুয়েরা উদ্যান আপনার দেখা হয়েছে, ম্যুসেয়ুম ডে আর্তে আস্‌সিস শাতোব্রিয়ঁাতে আপনি পিকাসো, সেজান ও ডি কাভাল-কান্টির সৃষ্টি চোখ ভরে উপভোগ করেছেন, আর তেতাল্লিশ তলা উঁচুতে আকাশের গায়ে তের্‌রাকো ইতালিয়াতে চুমুক দিয়েছেন কফিতে, এর পর ওরা আপনাকে নির্ঘাৎ সারাদিনের জন্যে চক্কর দিতে পাঠাবে সান্তোসের বেলাভূমিতে, সেখানকার বন্দর থেকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কফি রপ্তানি হয়। অবশ্য কফি রপ্তানির চাইতেও সান্তোসের নামডাক তার ফুটবল ক্লাবের দরুন, এই ফুটবল ক্লাবেরই মধ্যমণি হলেন জাতির গৌরব পেলে, যে পেলের নামে তরুণীরা মূর্ছা যায়, আর তরুণদের পেশী টানটান হয়ে ওঠে। সাও পাওলো এলাকায় পেলে বিনা গীত নেই। যে যা বিক্রি করতে চায়—কফিই হোক, আর প্রসাধন দ্রব্যই হোক,—তার জন্য পেলের সাক্ষরিত প্রশংসাবাণী দু-এক কথায় হলেও চাই-ই চাই। ব্রাজিলের একটিই দেবতা—রক্ত-মাংসের দেবতা—আর তার নাম পেলে।

ব্যাপারটা উদ্ভট এই দিক থেকে, যে পেলে হলেন কালো, একেবারে নিকষ কালো। অবশ্যই, বাইরের দিক থেকে, ব্রাজিলের সমাজটা দেখলে মনে হয় আমেদুধে মিশে গেছে। অ্যালাবামা বা লুইসিয়ানার ভরন্ত পুরন্ত তুলোর জমিগুলিতে যারা বসত স্থাপন করেছিল, সেই ইংরেজ ভূস্বামীদের মতো পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকরা কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ রমণীকে এক রাত্রের প্রমোদের জন্য ব্যবহার করে পরদিন সকালে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি, বরং তাকে কিছু-কিছু আইনসংগত

অধিকার দিয়েছিল। তবু এইগুলো নেহাৎই বিক্ষিপ্ত ঘটনা; সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীত দলে-দলে যে নিগ্রোরা ক্রীতদাস হয়ে এসেছিল, তাদের বেশির ভাগই অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছিল। তাদের বংশধররা সমাজের প্রত্যন্তবাসী। তারা হুবহু নাচতে পারে সাম্বা নৃত্য; ব্রাজিলের সংগীতে মৌলিক প্রাণোচ্ছলতা জোগায় তারাই; তারাই ফুটবলে প্রায় একচ্ছত্র প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু তা বাদে তারা যেন বাইরের লোক। জমির মালিকানা প্রায়ই তাদের হাতে নয়, তারা জমিতে খাটে মাত্র। শিল্পে অদক্ষ শ্রমের বেশির ভাগটাই তারা জোগায়। অফিসগুলিতে তারা চাকর-বেয়ারার বিরাট বাহিনীকে পুষ্ট করে। শিক্ষাজগতে যারা শীর্ষস্থানীয়, তাদের মধ্যে একটিও কালো মুখ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চাকুরিজগতে আর আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে নিম্নতম ভিত্তিতে রয়েছে নিগ্রোরা; কিন্তু দেশের মালিক হল লাতিনজাতি। যে-সমাজের মূলমন্ত্রই হল 'তেলা মাথায় ঢালো তেল, রুখু মাথায় ভাঙো বেল', সেখানে কালোরা নিরুপায়। পেলে একটি ব্যতিক্রম মাত্র।

তার জন্য অবশ্য কারো রাতের ঘুম নষ্ট হচ্ছে না। আদিম ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলি—যতটুকু তার অবশিষ্ট আছে,—এমনকি নিগ্রোদের চাইতেও অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশি বঞ্চিত, তা নিয়েও কারো তেমন মাথাব্যথা নেই। বিশেষ করে সাও পাওলোতে ভাববার মতো অনেক বিষয় আছে; দরিদ্র ও বঞ্চিতদের আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে সেই বিপ্লবী প্রচারকের জন্য, যে কালো মানুষকে সাম্বার নির্বোধ ছন্দ থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে রাজনৈতিক সক্রিয়তার দিকে। বর্তমানে সবকিছুই উল্টো বুঝিলি রামদের খপ্পরে। ব্রাজিলের যে-সেনানায়কের স্বার্থ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দপ্তর এবং সি, আই, এ-র আদরের ধন, তারা ষাটের দশকের প্রথম ভাগে মার্কিন অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে অসম উন্নয়নের তত্ত্বের মূল কথাটা রপ্ত করেছিল। তারপর থেকে সেই একই ধারা চলে আসছে। ব্রাজিলের জনসংখ্যা ন-কোটির কাছাকাছি,

তার এক-চতুর্থাংশও সাও পাওলো-পোর্তো আলেগ্রো-রিও ডি জানেইরো সমন্বিত ত্রিকোণাকৃতি দক্ষিণ-পূর্ব ডগাটুকুতে বাস করে না। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? দুধের ওপরকার সরের মতো এই চারভাগের এক ভাগই হল জাতির লাতিন অংশের প্রতিভূ। দেশের চারিদিক থেকে প্রাণরস নিংড়ে এখানে অনবরত জমা করা হয়েছে, ঐশ্বর্যের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ত্রিকোণটিকে। কফি, তুলো আখ, সয়াবিন বা তামাক দেশের যেখানেই উৎপন্ন হোক-না কেন, অবধারিতভাবে এখানেই এসে হাজির হবে ব্যবহারার্থে প্রস্তুত হবার জন্য; এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মতো, সুতরাং দেশজ সম্পদ এখানেই জড়ো হোক। কিছুটা সরকারি সূত্রে, কিন্তু অনেকটা ব্যক্তিগতভাবে উত্তর গোলার্ধ থেকে এখানে প্রচুর অর্থ লগ্নি করা হয়েছে; স্বভাবতই এই দেশের, অন্তত দেশের এই অংশটির, বাজার রমরমা হয়ে উঠেছে। হয়তো সাও পাওলো এলাকার বাইরে জাতীয় আয়ের হিসেব-নিকেশের অস্তিত্ব বিশেষ নেই; তবু দেশের অর্থনীতি বছরে শতকরা দশভাগ হিসাবে উন্নীত হচ্ছে, এই তথ্যকে অস্বীকার করার কোনো বাস্তব যুক্তি পাওয়া ভার। আপনি যদি ইঙ্গিত করেন যে এই উন্নতিতে শুধু জাতির ওপরতলার শতকরা তিন বা চার ভাগ বিশিষ্ট মানুষের একচেটিয়া অধিকার, তাহলেও সেটা অযৌক্তিক হবে না। কাবাইয়েরোদের বরাত খুলে গেছে। পরিবারের এক ছেলে যদি সৈন্যদলে যোগ দিয়ে সেনানায়কের পদে উন্নীত হয়, তাহলে আর একজন আবার উর্বর তৃণভূমির মধ্যে দশ বা পনেরো হাজার একর জোড়া জমিদারির তত্ত্বাবধান করার জন্য ঘরে থাকে; আবার তৃতীয়জন মার্কিন বা জার্মানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিল্পপতিদের মধ্যে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে দেখা দিতে পারে; প্রাকা ডা রেপুবলিকা আর লার্গো ডে পাইস-সান্‌ডুর সর্বত্র তখন তার অফিস ছড়ানো থাকবে। টাকায় টাকা আনে, খুঁটির জোর থেকেই আরো খুঁটি তৈরি হয়ে যায়।

পঞ্চাশ বছর আগে সাও পাওলো ছিল এক জলাভূমি, আজ তা

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম শহর, লোকের ভিড়ও এখানে সবচেয়ে বেশি, আকাশচুম্বী বাড়ির ঠেলাঠেলি, প্রকাণ্ড চওড়া রাজপথগুলি এদিক ওদিক বেঁকে গেছে, উড়াল-পুলের জটিলতার চাইতেও বেশি জটিল যানবাহনের ভিড়; চালকদের জীবন দুর্বিষহ করে দেয় নানা গাড়ির সমারোহ। দোকানগুলি জিনিসপত্রে ঠাসা; দুশো নাইট-ক্লাব আছে এখানে, দেড়শো সিনেমা হল, পঁচিশটি থিয়েটার, নৃত্যের তালে ভেসে যাবার জন্য অসংখ্য রেস্তোরাঁ এবং মদ্যপানের আখড়া। কী এসে যায় যদি মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরেই মানুষের একমাত্র খাদ্য হয় কলা, যদি বিহারের দরিদ্রতম ছোটো শহরের সঙ্গে তুলনীয় হয় সেখানকার অভাবের চেহারা, আর যদি কালোদের মধ্যে এবং আদিম জাতিগুলির অবশিষ্টাংশের মধ্যে তলায়-তলায় তিক্ততা বেঁচে থাকে। অসম উন্নয়নের তত্ত্ব অনুযায়ী একটি অংশ সব সময়েই পুরো জিনিসটার চেয়ে বড়ো; একটি অংশ দিয়েই পুরো জিনিসটাকে চেনা যায়। মর্মরমণ্ডিত প্রাসাদ এবং বিলাসবহুল ফ্ল্যাটবাড়িতে শোভিত সাও পাওলোই হল সত্য; শৌখিন সেনোর এবং সেনোরাদের প্রাণশক্তির আওতাকে পেরিয়ে যে দারিদ্র্য, অস্তিবাদী অর্থে তা বাস্তব নয়। সুতরাং যতদিন পারা যায় এই ফুর্তিভরা জীবনটাকে উপভোগ করে নেওয়াই ভালো।

এই লাতিন প্রভুদের হাতে আর কতটুকু সময় আছে? কারণ সাও পাওলো এবং ব্রাজিলের এই এলোমেলো অর্থ নৈতিক অবস্থা একটা ঐতিহাসিক অসংগতি—যদিও তার বাইরের বেশভূষাটা আধুনিক। লাতিন মেয়েদের দেখতে ভালো, কিছু-কিছু মুলাটো মেয়েদের আরো ভালো দেখতে। যতদিন মার্কিনদের খুশি রাখা যাচ্ছে এবং সেনাধ্যক্ষরা প্রতিবাদকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে পারছেন, ততদিন ওই মেয়েরা আলস্য-ভরে মনোরম বেলাভূমিতে গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটাতে পারবে, এবং কলির কেষ্টরা চোখ ভরে বিকিনির শোভা দেখতে পারবে। কিন্তু সে কতদিনের জন্য? যারা পরিকল্পিত বৈষম্যের গুণগান করে থাকেন, তাঁদের মতে বিশেষ থেকে সাধারণ্যে হিতোপদেশ ছড়িয়ে দেবার কিছু-কিছু যোগসূত্র রয়েছে। এখন পর্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপকভাবে পেলের বেলায়

ছাড়া, এটা ঘটছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা একটা ঐতিহাসিক কাকতালীয় মাত্র; ইতিহাসের কার্যকারণ সূত্র পেলেকে দিয়ে বোঝা যায় না। তিনি মঞ্চ থেকে সরে গেলে সান্তোস ক্লাবকে সবাই ভুলে যাবে; রাস্তার ধারে কিংবা সিনেমার ছবিতে কোকো, পোলো শার্ট বা ঘুমের ওষুধের বিজ্ঞাপনগুলি থেকে ঐ টান-টান কালো মুখের আদল হারিয়ে যাবে; অন্য-কোনো কালো মুখ তার জায়গায় আসবে বলে মনে হয় না।

যেদিন প্রেসিডেন্ট গুলার্তকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাধ্যক্ষরা ক্ষমতায় এলেন, অর্থনীতিবিদ চেলসো ফুর্তাদোও সেদিন দেশ থেকে বিতাড়িত হন; দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের পদদলিত, উপবাসী মানুষের স্বার্থে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের এক বিরাট পরিকল্পনা ছিল তাঁর। এদেশে ভূমিসংস্কারের কথা বলা হয় না; বিষয়টা যদি কখনো ওঠে সেটা ভূসম্পত্তির ওপর দখল আরো জোরদার করার প্রসঙ্গে—শতকরা দশ ভাগ হারে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে যাতে ছোটো কৃষককে তার অল্প জমি থেকে উৎখাত করা যায়। ধনীরাই হবে দুনিয়ার সমস্ত জমির মালিক——মালিকানা তারা পেয়েও গেছে। চিরদিন সেটা ধরে রাখতে পারবে কিনা সেটাই প্রশ্ন।

কিউবাতে যে ধাঁচের বিপ্লব ঘটেছিল, তার কথা বলে লাভ নেই। বাতিস্তার দলবল ব্রাজিলের বর্তমান সেনাধ্যক্ষদের মতো ওস্তাদ কখনোই ছিল না; তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দপ্তর একবার ঠেকে শিখেছে, তাদের পাহারাদারিতে আর কোনো ফাঁক নেই। আই. টি. টি. জাতীয় বহু-জাতিক সংস্থাগুলিও আর ঠিকেয় ভুল করবে না। ব্রাজিল আদপেই চিলির মতো নয় তাছাড়া, এখানকার সেনাবাহিনী বেশ ভালোভাবেই জানে যে সংসদীয় খেলার অলস ধারাবাহিকতায় প্রশ্রয় দিতে নেই। পেরুতে সেনাবাহিনীর শিবিরের ভিতর থেকেই জনতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল, এখানে তার পুনরাবৃত্তি খুবই কঠিন। পেরুর সেনাধ্যক্ষেরা অফিসার স্তরে লোক ভর্তি করার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করতেন। কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর তরুণরা প্রবেশাধিকার

পাওয়ার ফলে ওপরতলার শ্রেণীচেতনা কিছুটা মিইয়ে গিয়েছিল। জমিদারি স্বার্থের সঙ্গে সেনাবাহিনীর হর্তাকর্তাদের স্বার্থের সমীকরণটা আর খাটছিল না। এখানে তেমন কোনো দুর্দৈবের সম্ভাবনা নেই; ব্রাজিলের সেনানায়কেরা হিংস্রভাবে দরজা আগলে রাখার পক্ষপাতী। তবে কি এদেশে বিপ্লব হবে আর্জেন্টিনার ধাঁচে? যে-আর্জেন্টিনায় সতেরো বছর সময় পেয়েও সেনাবাহিনী পেরোনের মন্ত্রশক্তিকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি, বরং তার মধ্যে নিজেরাই জড়িয়ে পড়েছে? ব্রাজিলের আকাশে কি হঠাৎ কোনো পয়গম্বরের জাজ্বল্যমান আবির্ভাব হবে, ডাঙ্কা ডাস্ ব্যান্দেরিয়োলাস্ বল্লমনৃত্যের তালে-তালে যে বিপ্লবকে এগিয়ে আনবে? বুয়েনাস্ আইরেসে যদি এটা ঘটে থাকে তবে রিওতেই বা নয় কেন?

এই যুক্তিতেই ফাঁক আছে অনেক। প্রথমত পেরোন নিজেও জনসাধারণের উদ্ধারের জন্য প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন শুধুই একজন পুরানো ধরনের গণবক্তা, যিনি চরমপন্থী জিগির তুলে বেশ ভালোভাবেই ফায়দা উঠিয়েছিলেন। এমনকি এইদিক থেকেও তিনি অনন্য ছিলেন না। তাছাড়া আর্জেন্টিনার শ্রমিকশ্রেণী তিন-চার দশক ব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন ঘটিত কার্যকলাপের ফলশ্রুতি হিসাবে শক্তিশালী এবং সংঘবদ্ধ। অন্যদিকে, জেটিতেই হোক, আর বাগিচাতেই হোক, ব্যবহার্য জিনিস বানানোর কেন্দ্রগুলিতেই হোক আর আমদানি-রফতানির সংস্থাগুলিতেই হোক, ব্রাজিলের শ্রমিক আজও কর্তাভজা মানসিকতায় ভোগে; যেখানে বেকার এবং আধা-বেকারের বিরাট জোগান রয়েছে, সেখানে তো অন্যরকম হওয়াটাই কঠিন। কাজেই লাতিন অভিজাত শ্রেণীর সুদিন আরো বেশ-কিছুকাল অব্যাহত থাকবে মনে হয়। ইয়াঙ্কি সংস্কৃতির সতেজতার সঙ্গে উনিশ-শতকী ইউরোপের একটু সৌরভ মিশে যাবে; মুর স্থাপত্যের কমনীয়তায় ঈষৎ নতুনত্ব আনবে কলোনিয়াল-বারোক ধাঁচের প্রভাব; সাম্বা নাচের আখড়ায় কাকভোর পর্যন্ত চুটিয়ে ব্যবসা চলবে; নিগ্রো গায়করা নামমাত্র বেতনের বিনিময়ে গরমাগরম আধুনিক গানের ফাঁকে-ফাঁকে খোলা গলায়

'বস্‌সা নোভা' শোনাবে ; হুনিয়ার সময় তাদের হাতে, এই আত্মবিশ্বাসে মালিকরা একের পর এক 'বাতিদা'য় চুমুক লাগাবে আর গবগবিয়ে খাবে 'ফেইযোয়াদ্দা'। তাদের মহিলারা নিয়ম করে হেমন্তে প্যারিস আর বসন্তে ন্যুইয়র্ক যাবে ফ্যাশন-উৎসবে যোগ দিতে। সাও পাওলোর মাথাপিছু বার্ষিক আয় প্রায় পাঁচ হাজার ডলার স্পর্শ করবে। কিন্তু তবু ইপিরাঙা অ্যাভিনিউ-এর বিলাসবহুল হোটেলগুলির কোনায় নিগ্রো আর মুলাটো মেয়েলোকদের ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়াতে দেখা যাবে, রেসিফে থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে উত্তর-পূর্বে যদি যান, বাতানুকূল টুরিষ্ট বাসের বীজাণুহীন স্বাতন্ত্র্যের মধ্য থেকে তাকিয়ে দেখতে পাবেন বাইরে প্রতিটি মুখে অভাব আর ব্যাধির ছাপ।

তবু এ-সব কি আপনাকে দেশের কথা মনে করিয়ে দেয় না? সাও পাওলোতে এমন কি আছে, যা নয়াদিল্লিতে নেই? অবশ্য এখানে কাবালার মতো একটা রেস্তোরাঁয় দুশো রকমের হুইস্কি পাওয়া যায়, যা কনট প্লেসের কোথাও পাওয়া কঠিন; কিন্তু এহ বাহ্য। কাল যে-আগুন জ্বলতে শুরু করবে দাউদাউ করে, সবকিছুই গ্রাস করে নিয়ে, তার সংকেতগুলি সম্বন্ধে সাও পাওলোতে যে-রকম অজ্ঞতা, নয়াদিল্লিতেও তাই। বারো হাজার মাইল দূরে বসেও স্বদেশের জন্য গর্ব—যদি তা-ই এটাকে বলা যায়—তার যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করে।

৪৩

পরিপাটি এক সমাজ…

পর্যটন সংস্থার যে-লোকটা দলটাকে সামলাচ্ছে, সে সরাসরি গ্র্যাহাম গ্রীন থেকে উঠে এসেছে যেন। এগারোটা ভাষায় সে অশ্লীল কেচ্ছা শোনাতে পারে আপনাকে। তা না-করে, বদলে, সে কেবল রাখোঢাকো চুটকিতেই নিজেকে আটকে রাখে। যদি খুব চেপে ধরেন, সে হয়তো তার হাঙ্গেরীয় জন্মসূত্রের কথা কবুল করবে। তার ডান গালের এই গভীর কাটা দাগটার পেছনে সে-কোন্ আঁধার-ইতিহাস লুকিয়ে আছে? তার এই অলস উদাস হাসি আর ঈষৎ-বাঁকা চলার ছন্দের আড়ালে? লোকটা, আন্দাজটা আপনার ভুল হবে না, ছিল হয়তো কোনো উদীয়মান লিউটেনাণ্ট—চল্লিশের দশকের গোড়ায়, হোর্টির ফাশিস্ত মিলিশিয়ায়। এই আন্দাজটাও ভুল হবে না যে সে ছিল কোনো হাঙ্গেরীয় জমিদারের দুলাল, শিকার, মেয়েছেলে আর চাষীদের সজুত করার দিকেই যার ঝোঁক ছিল, যার কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এসেছিল যেন সংবর্তের এক মুহূর্ত হয়ে। কিছুকাল সব তালগোল পাকিয়ে গেল: সর্বনেশে সব সীমান্ত আর সমুদ্রের ওপর দিয়ে রুদ্ধশ্বাস পলায়ন; আর এ-রকম অনেক লোকই অবশেষে এসে পৌঁছেছিল—গোড়ার দিকে হয়তো আর্জেন্টিনায়, পরে লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে।

ব্রাজিল এ-রকম লোকে ঠাসা। প্রাক্তন নাৎসি ও ফাশিস্ত, ভাগ্যান্বেষী, ভাড়াটে গুণ্ডা সবাই আবিষ্কার করে বসেছে ব্রাজিলের ওপরমহলে এক বিশাল নৃজাতিক সমাবেশ—যারা এখন উত্তরমহালে উপনিবেশ ছড়াতে ব্যস্ত। ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে সীমান্ত, দূরে, পেছনে, গভীর রহস্যময় আমাজোনের অভ্যন্তর খুলে যাচ্ছে সভ্যতার কাছে, আর এ-কাজ

ইওরোপ-থেকে-আগত বিশুদ্ধ আর্যরক্তওলা উদ্যোগী কর্মবীর প্রাক্তন নাৎসিরা ছাড়া আর কে সঠিক সামলাবে? পর্যটন দপ্তরগুলো আপনাকে বলে দেবে ঠিক কীভাবে এই মহান দায়িত্ব কাঁধে নেয়া হয়েছে।

আপনার বিমানের প্রথম চটজলদি লাফটাই আপনাকে নিয়ে যাবে ব্রাসিলিয়ার কল্পনার রাজ্যে, ঝকঝকে, আনকোরা যে-রাজধানীর পেছনে খরচ করা হয়েছে ৮০ বিলিয়ন কুজেইরো, শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ততম আপিসদপ্তরগুলো ছেড়ে দিলে যে-রাজধানী এখনও প্রধানত জনশূন্য। রিও আর সাও-পাওলোর মান্দারিনেরা যাওয়া-আসা করেন, ব্রাসিলিয়ার স্থাপত্যগরিমায় অহংকার বোধ করেন, কিন্তু কত তাড়াতাড়ি এঁদের বহন করে নিয়ে যাওয়া যায় দক্ষিণের মোলায়েম আবহাওয়ার সুখরাজ্যে, দ্রুতগামী জেটবিমানগুলো আছেই তো এই উদ্দেশ্যে। এক মরুভূমির মাঝখানে নেমে পড়ে বিমান। নামছে যখন, তখনই আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন লাল মাটির বিশাল প্রসারে কিমাকার কিম্ভূত এক জ্যামিতির ধরনে আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। টাকাটা কোনো বাধাই ছিল না। অস্কার নেইমেইয়ারকে একেবারে সইকরা শাদা কাগজ দিয়ে দেয়া হয়েছিল—যেমন-খুশি রাজধানীটা তিনি গড়ে দিতে পারেন, কোনো বাধা নেই। ইতিহাসের আর-কোনো স্থপতির বরাতে এমন কখনও জুটেছে কিনা সন্দেহ। তিনি সোল্লাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন খাম-খেয়ালের লাগামছেঁড়া কল্পনাতীত বিলাসে। চোখধাঁধানো দীপ্তি। আপনি যদি ব্রাজিলের যাবতীয় সমস্যা থেকে আপনার অনুভূতিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেন, নিগ্রো, মুলাটো আর ইণ্ডিয়ান ও হাঘরে চাষীদের ট্র্যাজেডি থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন, যদি আপনি কোনো মিটমিটে ক্ষীণ মুহূর্তে পারেন অন্য-সব বাস্তব দশা থেকে পিঠ ফেরাতে, তখন হয়তো আপনি এই কাচের পাত আর ঢালের, মোচার-মতো-উঠে-যাওয়া মিনার আর গম্বুজের, মর্মরশিলার আর নিরেট কংক্রিটের অন্তহীন উচ্ছৃঙ্খল চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়ময়তাকে উপভোগ করতে পারবেন।

সব কিছুই বিরাটভাবে পরিকল্পিত। আছে লোকজনের আবাসের

সার আর বহুতল হর্ম্যের শ্রেণী, আছে বিপণি আর বৃহদায়তন বিভাগীয় বিপণি, আছে ছড়ানো সুপরিসর দূতাবাসগুলি—একের পর এক—কিন্তু লোকজন নেই। নগরীর প্রধান এলাকায় বাড়ির জমি দেওয়া হয়েছে শুধু কিছু আমলাকে আর বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের সেরা জাতটাকে। বাড়িও তৈরি হয়, কিন্তু কদাচিৎ কেউ থাকে সেখানে। মুলাটো আর নিগ্রোরা থাকে অন্যখানে, লেজুড় উপকণ্ঠগুলোয়। মন্ত্রীদপ্তরগুলো বসানো ইউনাইটেড নেশন-মার্কা দেশলাইয়ের খোলে, যা নিছক তাদের সংখ্যাবলে, টার্টল বে-র অট্টালিকাকেও লজ্জা দেয়। কংগ্রেস নাতিওনালে কীভাবে কাজকর্ম হয়, তা চাক্ষুষ দেখবার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনার জন্য। আনেহো দো সেনাদো আর আনেহো দো কামরা—দুটোই মর্মরশিলা, ইস্পাত আর গম্বুজের সমাবেশে কী চমৎকার অট্টালিকা তৈরি করা যায়, তারই নিদর্শন, প্লাতোর প্রজাতন্ত্রের মন্দিরায়ন ঘটেছে এখানেই। এমনকি আনেহো দো সেনাদোর দেয়ালগুলোয় অব্দি পুরু গালিচা বসানো, আলোকসজ্জা সংগোপন ও বিচ্ছুরক; বাতানুকূল ব্যবস্থায় এক মোলায়েম, হালকা, একটানা সুখের গোঙানি। দেবতারা যদি আধুনিক স্থপতিবিদ্যা আয়ত্ত করতে পারতেন, তবে এ-রকম পরিবেশেই থাকতে চাইতেন, যেখান থেকে সুচিন্তিতভাবে, মানুষকে নির্বাসিত করা হয়েছে।

অসীম সৌজন্যের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারিতে, সেনেট কীভাবে কাজ করে চোখে দেখবার সুযোগ পাবেন আপনি। এই সামরিক শাসকদের হাতে-ধরে-বাছাই-করা সর্বমোট ৬৬ জন সেনেট-সদস্যের মধ্যে কুল্লে আধ ডজন উপস্থিত। একজন সেনেটার মাইক্রোফোনে জ্বালাময় ভাষণ দিচ্ছেন, এক বজ্রগম্ভীর সপ্তমে টং হয়ে আছে তাঁর গলা। এই হট্টগোলের কারণ কী, আপনি দোভাষীকে শুধোলেন। সেনোর সেনেটর, আপনাকে জানানো হবে, সরকারের ওপর বড্ড রেগে গেছেন: দেশের ওপরমহল তাদের সম্পত্তির একটা বড়ো অংশকে শিল্পবাণিজ্যের শেয়ারে রূপান্তরিত করেছিল; শেয়ারের দাম পৌঁছেছিল তুঙ্গে, টাকার কুমিররা এর চেয়ে খুশি আর কখনো

হয়নি। গত পক্ষকালে শেয়ারের দাম নাকি শতকরা শূন্য দশমিক এক-দুই পড়ে গেছে; এ-রকম হতে দেয়া চলে না; এর চেয়ে বড়ো ধাক্কা আর কী হতে পারে; দুনিয়ায় ফাটকা-বাজারের মালিকরা এক হও। সেনেটর সরকারকে শাসিয়ে রাখছেন : ব্রাজিলের এই অলৌকিক অবস্থার যারা প্রধান পরিপোষক তাদের অধিকার বা সুযোগসুবিধেয় আর-কোনো ঘা পড়লে ভালো হবে না কিন্তু, শেয়ারের দাম যদি আর একফোঁটা নিচে নামে তবে এই অলৌকিক ঘটনার অবসান আর কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

আপনি স্বগতোক্তি করেন তথাস্তু এবং অন্যসব দ্রষ্টব্যের সন্ধানে এগোন। পর্যটকদের কুর্‌রোস্কারিয়া দো সাগো-তে তারাজ্বলা আকাশের তলায় এক আয়েসশিথিল ভোজে আপ্যায়িত করা হয়, আর তার পরে মাঝরাতে নিয়ে যাওয়া হয় বিমান ধরতে—সোজা হাজার মাইল পেরিয়ে বেলেম, উত্তরের পারা প্রদেশের যেটা রাজধানী, যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই কবে, ১৬৬৬-তে, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জগৎসুখ্যাত হার্মাদ ফ্রানসেইস্কো কালডেইরা আর কাপ্তনো ব্রাঙ্কো। বিমান নামে, প্রায় ধোঁয়া-ওঠা গরমের মধ্যে; নিরক্ষবৃত্ত মনে করিয়ে দেয় যে সে কাছাকাছিই আছে। করমণ্ডল উপকূলের যে-কোনোখানে হতে পারত বেলেম, একটুখানি গোয়ার সঙ্গে একটুখানি জিব্রালটার মেশানো। হাওয়ায় ঘামের ইশারা। হোটেলের সামনে ফুটপাথে ভিখিরি আর ভবঘুরে-দের দঙ্গল, দালালরা ইতিউতি তাকিয়ে ভিড় জমায়, মেয়েগুলোর হাবভাব খালাশিতে-ভরা যে-কোনো দক্ষিণ ইউরোপীয় শহরের মতো। নিরক্ষীয় ফলের গন্ধে আপনার নাসারন্ধ্র জ্বলতে শুরু করে। হোটেল ঘরে বিচিত্র গন্ধের তোলপাড়, আপনি ধূলিধূসর মেঝেয় স্যুটকেস ছুঁড়ে ফেললেন, আর টলতে-টলতে কোনোরকমে চেষ্টা করলেন উষ্ণ মণ্ডলের ভাপ আর আর্দ্রতার মোকাবিলা করতে। বাইরে এর মধ্যেই পিল-পিল করে এসে জুটেছে তাবৎ পকেটমার আর ছিনতাইবাজ, কিন্তু আপনি ভোরবেলাতেই চলে যান খামারগুলো দেখতে—পর পর অনেক ক্ষেত-খামার তৈরি হয়ে চলেছে এখানে। আপনাকে নিয়ে

যাওয়া হল গোরু-মোষের একটা র‍্যাঞ্চে, ২৩০০ হেক্টার জুড়ে প্রকাণ্ড এক র‍্যাঞ্চ। র‍্যাঞ্চ-মালিক এসেছেন দক্ষিণ থেকে, গোরু-মোষ প্রধানত আমদানি করা হয়েছে বিদেশ থেকে, আর শ্রমিকদেরও—তারা প্রধানত মুলাটো বা নিগ্রো—উত্তর-পূব থেকে চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কোনো প্রশ্ন করবেন না, তাহলেই আপনাকে আর মিথ্যে কথাগুলো শুনতে হবে না। আপনি ইণ্ডিয়ানদের খোঁজ করেন, তারাই তো ছিল এখানকার আদি বাসিন্দা, কিন্তু, তাদের কোথাও চোখে পড়বে না। এমনকি মেস্তিজোদেরও নয়। জমি থেকে উৎখাত হতে যে সব মাথামোটা আপত্তি করছিল, তাদের অন্য কোথাও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কোনো নির্যাতন শিবিরে হয়তো, নাৎসিরা যাকে বলত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, কিংবা হয়তো গুলি খেয়েই মরেছে তারা। র‍্যাঞ্চ-মালিক এক দেবভোগ্য ভোজে আপনাকে আপ্যায়িত করবেন, চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়, ঝলসানো মুরগি, গোমাংস আর শুওরের চাক; পেপে আর আনারস, তরমুজ আর কলা, বিয়ার আর কমলার রস, গুয়ারানা আর ডাবের জল—যা নাকি—গানে বলে—আপনার হুহিতার পক্ষে ভালো। খাদ্যপানীয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দ্রুত নেমে আসে তৃপ্তি, আয়েসের ভাব। র‍্যাঞ্চ-মালিক, তাঁর স্ত্রী, তাঁর চমৎকার-সব হুলাল-হুলালীদের সঙ্গে আপনার ছবি তোলা হয়; কেমন করে যেন তাঁরা কালো দাসদাসী বা মাইনে-করা পরিকরদের ডাকতে ভুলে যান।

পরের দিন সকালে, শুধু আপনাদেরই জন্য, বিমানভাড়া করে আলতামিরা যাবার ব্যবস্থা। পৌঁছুবামাত্র আপনাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় ভেতরমহালে যাতে আপনি নিজের চোখে দেখতে পারেন ভূমিসাফাই ও ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা কেমন প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে চলেছে। ভূমিবণ্টনের পদ্ধতি একটা চেনা পথ ধরেই এগোয়। বেলেম থেকে ব্রাসিলিয়া যাবার রাজপথকে কেন্দ্র করেই নয়া সভ্যতার উন্মীলন হবে। পশ্চিম জার্মানি আর জাপানের খবরকাগজগুলো ব্রাজিল সরকারের বিচক্ষণ-সব বিজ্ঞাপন ছাপে: মাতো গ্রোস্‌সো, পারা আর রোন্দোনিয়ার শ্যামলী উর্বরা কুমারী জমি, প্রাচুর্য প্রায়

বিনা দামেই বিকোচ্ছে, প্রতি হেক্টারের দাম এক ডলার, শর্ত একটাই যে, দেশান্তরী অভিবাসককে আসতে হবে অন্তত দশ হাজার ডলারের একটা পুলিন্দা হাতে করে। একেই বলে সুনির্বাচিত প্রজনন বা জায়ন ব্যবস্থা, যেমন মানুষের তেমনি পুঁজির। জার্মান আর জাপানিরা পালে-পালে আসতে শুরু করেছে। তাদের এক্তিয়ারে দেয়া হচ্ছে নানাবিধ সরকারি সুযোগসুবিধে। বিলি-করা জমি থেকে ঘাড়ে ধরে ইণ্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের নিয়তির কাছে। বুলডোজার টগটগ করে, জমি সাফা হয়ে যায়, মহালের পর মহালে, একবার সাফাই সারা হয়ে যাবার পর, বীজ, বিদ্যুৎ আর শ্রমের ঢালাও আয়োজন। দরকার হলে সাফ করে দাও ইণ্ডিয়ানদের, মেস্তিজোদের, সে-বাবদ সরকারি সব সাহায্যই মজুত: কেড়ে নাও জমি, জবরদখল করো; নিগ্রো শ্রমিকদের দিয়ে সে-জমি সাফ করে নাও—তারপর থেকে, সব তোমার। যা ইচ্ছে ফলাতে পারো তুমি, কার্পাস, আখ, অথবা কফি। উত্তর আমেরিকা যেভাবে উন্মোচিত করেছিল আরণ্য পশ্চিম, তারই কিংবদন্তির পুনরাভিনয় হচ্ছে ব্রাজিলে—ঠাণ্ডা মাথায়, হয়তো আরো বিশদ সূক্ষ্মতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। ইণ্ডিয়ানরা তো আছে পুড়িয়ে মারার জন্যই। কোনো ইণ্ডিয়ান মারা মানেই সাপখোপ বা পোকা-মাকড় মারার সামিল। দরকার হলে, কোনো ইগুয়ানা পুষতে পারো; মাঝে-মধ্যে, ইগুয়ানার মতোই, পুষতে পার কোনো ইণ্ডিয়ানকে। তবে সে-ব্যাপারে তোমার যদি আগ্রহ না-থাকে, তাতেও কিছুই এসে-যায় না।

সব শোনেন আপনি উৎকর্ণ, গলাধঃকরণ করেন আরো-সব অপর্যাপ্ত ঝলসানো মাংসের ভূরিভোজ, আর পালাবার কথা ভাববেন। কিন্তু পর্যটন সংস্থার সেই প্রাক্তন নাৎসি আপনাকে চোখে-চোখে রাখছে; দল ভেঙে চলে যাওয়া 'ফেরবোটেম'; নিষিদ্ধ; আপনি হাল ছেড়ে দেন। পরের দিন আপনাকে নিয়ে যাওয়া হয় দেশের ভেতরে প্রতিষ্ঠা করা মানাউসের তুখোড় বন্দরে। সেখানে আপনি দেখতে পাবেন ব্রাজিলের সবেধন পাট-কারখানা দাপটের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। সীমান্ত শহরের

পুরোপুরি আদিরূপ এটা—সপ্তদশ শতকের প্রথম উপনিবেশিকরা এই শেষ সীমাতেই এসে পৌঁছেছিল; চান যদি তাহলে দেখবেন তার এক রোমান্টিক আমেজও বজায় আছে এখনও। রিও নেগ্রোতে মোটর-লঞ্চ টগটগ করে আসে যায়। একটা ব্যস্ত, শশব্যস্ত, ভাসমান বাজার: দলছুট কোনো সিন্ধি বস্ত্র-ব্যবসায়ীর সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে আপনার; পর্যটকদের হাতিয়ে নেবার জন্য কত শত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিসের অপর্যাপ্ত সমারোহ। রাত্তিরে পার্কে-পার্কে গানবাজনা আর নাচের আসর—এবং পার্কও অগুনতি। আপনি একেবারে যাকে বলে আমাজোনার বুকের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন, যে-রাজ্যটার আয়তন হবে সম্ভবত আস্ত ভারতবর্ষের সমান, কিন্তু লোকসংখ্যা সম্ভবত দশলাখও নয়, আর তার অর্ধেকই থাকে বোধকরি মানাউসেই। জায়গাটা এখনো অবিজিত এক অরণ্যভূমি—জীবজন্তু এখনো মেরে ধরে শেষ করে দেয়া হয়নি; আর, ইণ্ডিয়ানরা, বন্য পশুপ্রাণীর মতোই, এখনো লুকিয়ে আছে।

তবে টারজানরা আসতে শুরু করে দিয়েছে, আর পর্যটকরাও খুব পেছিয়ে থাকবে না। সীমান্তকে—সন্দেহ করে, সে-সাহস কার—ঠেলে সরানো হবে আরো, মানুষ জয় করে নেবে প্রকৃতিকে, মানুষ অন্য মানুষকে খতম ও সাফ করে দেবে। দেশের অন্যখানে যে-কারণে কালো চামড়ার লোকদের দেখা মেলে, ঠিক সেই একই কারণে আমাজোনায় তাদের দেখা যায় ও সহ্য করা হয়; কারণ, তাদের বাদ দিয়ে জমি সাফ, কলকারখানা বা কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। ব্রাজিলকে যা জিইয়ে রেখেছে, সেই শ্রম এদেরই। আমাজোনার আগাপাশতলায় যে নতুন সমাজ রচিত হচ্ছে, মুলাটোদের মতোই, কালোদেরও সেখানে শুধু একটাই ভূমিকা। তারাই আক্ষরিক অর্থে কাঠ কাটে জল তোলে কাজ করে নগরে-বন্দরে। তাছাড়া করুণ সব নৈশ আখড়ায় তারাই গান গায়, তারাই চিরকাল নেচে আসে; যত জঙ্গল সাফ হবে, ততই এই অবস্থা বাড়বে। ইণ্ডিয়ানরা মরবে, নিগ্রোরা কাজ করবে—যাতে সাদা চামড়ার লোকেরা তারিয়ে-তারিয়ে জীবন উপভোগ করতে পারে। ব্রাজিল এক পরিপাটি গোছানো সমাজ, সব উপাদান মিলিয়ে চমৎকার তৈরি।

আপনার হাঙ্গেরীয় গাইডের ওপর ভার দিন। সে-ই আপনাকে রিও নেগ্রোয় একটা সফরের ব্যবস্থা করে দেবে, আপনি চলে যেতে পারবেন মোহানায়, যেখানে রিও নেগ্রো গিয়ে পড়েছে আমাজোনে। রিও নেগ্রোর সঙ্গে প্রথম মেলে রিও সেলিমোয়েস, তারপর দুজনে মিলে একসঙ্গে প্রবেশ করে রাজকীয় আমাজোনে। রিও নেগ্রোর জল কালো, মধ্যযুগের রাজ-দুহিতার দীঘল কালো চুলের মতোই রহস্যঘন কালো। সোলিমোয়েসের জল উজ্জ্বল, রুপোলি-শাদা, এখানে ওরা বলে কালো জল নাকি শাদা জলের চেয়ে ভারি। মোহানায়, দেখা যায়, নেগ্রো নদীর চঞ্চল জল কিছুতেই সোলিমোয়েসের শাদা জলের সঙ্গে মিশতে পারছে না। কিছুক্ষণ লড়াই করে কালো জল, সামনে-সামনে যোঝে সেলিমোয়েসের অন্য জলের সঙ্গে, দারুণ যোঝে, কিন্তু হেরে যায়, একটু পরেই কালো-জল যায় তলিয়ে, আমাজোনের জল হয়ে ওঠে শাদা ধবল। ব্রাজিলের সমাজেও, ঠিক সেই এক জিনিস। কালোরা আর মুলাটোরা তলিয়ে যায়, ওপরে উঠে থাকে শুধু শাদারা, আর বলাই বাহুল্য, অদূরেই কোনো ইণ্ডিয়ান আর থাকবে না। আমাজোনের আশপাশে, যদি-না তাদের দরকার হয় পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের জন্য, অথবা হলিউডের কোনো ছবি তোলবার কাজে লাগে তারা। ইণ্ডিয়ানরা হারিয়ে-যাওয়া হেরে যাওয়া জাতি, আর আমাজোন—সে এক নিরুদ্দেশ নদ।

৪৪
লর্ড কিচেনার বহাল তবিয়তে

নথি পূরণ করার মহোৎসব শুরু হয়ে যায় বিমানবন্দরেই। অন্য রকম হবারও কথা নয় অবশ্য। ব্রিটিশরা এখানে ছিল, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কাল : একবার যদি ব্রিটিশরা আসে, তিন দফায় পূরণ করার নথি কি আর পেছনে পড়ে থাকবে? এ তো এখনো কিচেনার-গর্ডন পাশার দেশ—দুই সার্বভৌম সরকারের যুগলবন্দী শাসনের দেশ। সাম্রাজ্যবাদী—উপনিবেশিকরা বিদায় নিয়েছে, দীর্ঘজীবী হোক সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদীর আত্মিক বৈশিষ্ট্য, নথি ভর্তি করুন, নথি ঠেলুন; যদি ব্যাপারটায় নিতান্তই জড়িয়ে পড়তে হয়, তবে চেষ্টা করুন যাতে কিনমায়েই থাকতে পারেন, প্রান্তিকে, বেশি ভেতরে ঢুকবেন না; আপনার অস্তিত্বের সারাৎসার যেন এখনও হয় ছায়াই। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিকতার গানটি বড়ো করুণ আর একঘেয়ে : হাইলিলি, হাইলিলি, হাই লো।

যুগল শাসনের চুক্তির আড়ালে, ব্রিটিশরাই মিশরীয়দের অর্ধশতাব্দী ও অধিক কাল শাসন করছে। কিন্তু কিংবদন্তিটা জিইয়ে রাখা হয়েছে; তারা নাকি কেবল 'ন্যাসরক্ষক' বা 'তত্ত্বাবধায়ক' হিসেবেই শাসন করেছে; মিশরীরা নাকি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই শ্বেতাঙ্গদের বৃষস্কন্ধে শাসন করার গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে নিয়েছিল। নেগিব-নাসের বিপ্লব মিশর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করছে ব্রিটিশকে। কিন্তু মরিয়া না মরে কেউ-কেউ, কয়েকটি পশ্চাদ্বর্তী ও প্রলম্বিত রণকৌশল চলতেই থাকে সুদানে, অন্তত কিছুকালের জন্য। ষড়যন্ত্র করে যে, উন্নতি করে সে; যে করে বাঁটোয়ারা, শাসনে সে মাতোয়ারা। কাজেই দক্ষিণের উপজাতিদের

কানে-কানে ফুসফাস করো, যে-উপজাতিরা ছড়িয়ে আছে বেহেব এল গাজেল-এ, নীল নদের নিরক্ষীয় ও উত্তুরে ভূ-ভাগে, বলো যে তারা আফ্রিকার মানুষ, আরব নয়; গুজুর-গুজুর করো ওমতুরমানের খার্তুম শহরতলির তরুণ আরব আর্দালিদের কানে-কানে, দক্ষিণের কাফিরদের একটু শায়েস্তা করা বড্ড জরুরি হয়ে পড়েছে; খাতামিইয়া আর মিশরীয়দের মধ্যে যে নারকীয় কাজকারবার চলছে ওয়াকিবহাল রাখো সে-বিষয়ে আনসারবাহিনীদের; খাতামিইয়াদের বলো কেমন করে সুফলা ও সমৃদ্ধ গেজিয়াভূমি গ্রাস করে ফেলেছে আনসাররা; উম্মাদের উশকে দাও আশিকাদের সঙ্গে সংঘর্ষে, আশিকাদের সাবধান করে দাও যে উম্মা-মাহদীবাদীরা তাদের সরকার বা সেনাদলের বড়ো-বড়ো গদি থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে।

এগুলো তো প্রহেলিকাটির চিরচেনা অংশ; দেশ যা-ই হোক-না কেন, ব্রিটিশরা যেহেতু সব সময়েই নিখুঁতভাবে রক্ষণশীল, তারা একই খেলা খেলতে চায়। নামগুলো ফেটিয়ে নিন, এদিক-ওদিক করুনঃ সয়ীদ আব্দ আল রহমান আর মেহদি হতে পারতেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ, ইসমাইল আল-হাজারি হতে পারতেন তেজ-বাহাদুর সপরু, আদাল্লাহ খলিল হতে পারতেন মোতিলাল নেহরু। সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদ চিরকালই হিন্দু স্থাপত্যের মতো ছিল কতকটা—পুনরাবৃত্ত, পূর্বানুমেয়, পরিবর্তনবিমুখ—দেশের একদল অভিজাতকে আরেকদল অভিজাতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার প্রবণতায় ভরা। ইতিমধ্যে, বলাই বাহুল্য, নীলনদের মোহানায় কার্পাসের চাষ আরও সুফলা হয়ে উঠেছে, বিপুল সুফলা সাম্রাজ্যে অন্য যে-বিনিয়োগ, সে খার্তুম থেকে সুদান বন্দর অব্দি একমুখী এক দীর্ঘ রেলপথ, যাতে বহন করে নেয়া যায় কাঁচা-তন্তুর অপর্যাপ্ত পরিমাণ, যথাসময়ে যাতে সে-সব চাপানো যায় ল্যাঙ্কাশিয়রগামী জাহাজে।

হায় রে, সকল মনমাতানো গল্পই এক সময় শেষ হয়ে যায়, মাস্তুল থেকে নামিয়ে আনতে হয় পতাকা, আর নটে গাছটি মুড়িয়ে যায়। ব্রিটিশকে ছেড়ে যেতে হলো ১৯৫৬তে, আর অভ্যুদয় হল

আজাদ সুদানের। অথবা হল কি সত্যি? কারণ, এখনও তো এটা কিচেনার-গর্ডন পাশার দেশ। স্বাধীনতার পর, প্রায় কুড়ি বছরে, সুদানী ওপরতলার জীবরা কিন্তু বৃটিশ শিক্ষার একটি পাঠও ভুলে যায়নি, তার সঙ্গে বরং ফাউ শিখে নিয়েছে একটি-ছুটি মার্কিন কায়দা-কানুন। তাদের কাছে, এ ছিল পারস্পরিক শত্রুতা ও গুপ্তযুদ্ধের মরশুম, চক্রান্ত ও প্রতি-চক্রান্তের যুগ—কাজে-অকাজে সব কিছুতেই, সর্ব-সময়েই। বৃটিশের পরিকল্পনায় সময় নামক আয়তনটির আদৌ কোনো স্থান নেই; সুদানের শাসকগোষ্ঠীর চৈতন্যেও তার অবাঞ্ছনীয় অনুপ্রবেশ ঘটেনি। কাগজে-কলমে সুদান আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ, জমির আয়তন ভারতকেও ছাপিয়ে যায়, কিন্তু মোট জনসংখ্যা এক কোটি ছ-লক্ষও হবে কিনা সন্দেহ, যাদের অন্তত এক-দশমাংশ জড়াজড়ি করে আছে খার্তুম—উত্তর খার্তুম-ওম্‌-দুরমানের ত্রিভুজটায়, এই ত্রিভুজের বাইরে, ব্লু আর হোয়াইট নীল নদের মোহানায়, খার্তুমের আশপাশে আছে এক দুঃসহ দরিদ্রভূমি।

দক্ষিণে বৃষ্টি আসে; কিন্তু এ-যাবৎ কেউ সেই বৃষ্টিকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগাবার ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি, আর দক্ষিণ প্রদেশগুলো থেকে গেছে সুদূর প্রান্তিকভূমি, আধারাখালিয়া উপজীবনধারায় দণ্ডিত; পশ্চিমের বেদুইনদের নিজের মতো থাকতে দেয়া হয়, অন্তত বেশির ভাগ সময়; কেবল যখন সেচব্যবস্থা যাদের জমিকে উর্বর করে তোলে তখন সেটা কেড়ে নিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করাটা জরুরি হয়ে পড়ে—আর তখনই ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়। সুদানে স্বাধীনতা এসেছে ১৯৫৬তে, কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প এখনো ঠিক এসে পৌঁছোয়নি। খার্তুমের শাসককুল আঁটঘাট বাঁধে, জোট বাঁধে, ষড়যন্ত্র করে, টুকরো-টুকরো হয়ে যায়—সব সময়েই তাদের চোখের ঝকঝকে লোভ সরকারি লুঠতরাজের সুযোগ খোঁজে অথবা রাজধানীর আশপাশে সুতি ও শর্করা শিল্পের উপযোগী সীমাবদ্ধ ও যন্ত্র পরিচালিত উর্বর জমি থেকে কী করে আরো আরো মুনাফা লোটা যায় তারই ধান্দা করে।

কিছুকাল অবশ্য লোকসভা-নির্ভর গণতন্ত্রের খেলা চলেছিল, সেই চিরকেলে রাজনৈতিক দল, ধর্মসম্প্রদায় আর বিদেশী দালালদের মধ্যে

ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে জোট বাঁধা বা জোট ভাঙার কেচ্ছা। সকালবেলায় যে ছিল ক-র সঙ্গে, সূর্যাস্তের সময় সে-ই তার করাল শত্রু। মঙ্গলবারে যে ছিল খ-এর অবিচল শত্রু—রসুল খোদাতালার দোয়ায়—বুধবার বিকাল না-পেরুতেই সে তার জিগরি দোস্ত আর জিহাদের সহযোদ্ধা। মাঝে-মাঝে নির্বাচনও হত, হঠাৎ-হঠাৎ, খামখেয়ালি, ভোটদাতা কে হবে তার নীতি ঠিক করার কোনো বালাই নেই, আর ওপরতলার জীবরা তো জানেই কী করে ভোটদাতাদের নাকে দড়ি দিয়ে কোথায় কোন্ মুলুকে নিয়ে যাওয়া যায়। ১৯৫৯-এর গোড়ায় সেনাবাহিনী রাজনীতিকদের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু খেলা-র ধরন বা নিয়ম কিছুই পালটাল না; সেনাবাহিনীরও দল-উপদল আছে, আর বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঈর্ষা তো আরো। মাঝে-মাঝে লোকসভার আচম্বিত সব কলাকৌশলের ধরনে, এর কু-এর পরে আসে ওর কু, কোনো-কোনো কর্নেল বা ব্রিগেডিয়ার গুলি খেয়ে মরে, কারু-বা হয় পদোন্নতি। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আবার রাজনৈতিক দলগুলোর শাসন চালু হল। স্পষ্টতই, পারেতো-নির্ধারিত সামঞ্জস্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছোয়নি তারা তবু, তাই পুনর্বার ফিরে এল সেনাবাহিনী—এবার তাদের ওশ্‌কাচ্ছিল খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতি-বাদী ছাত্ররা আর সদ্যোদ্ভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টি—তাদের নির্ভর আর সমর্থক ছিল গেজিবার কম-টাকা-পাওয়া খেতমজুর আর সুদান রেলপথের লাইন্‌সম্যান আর পয়েন্টস্‌ম্যানরা।

ছাত্রদের তো অচিরেই তাড়া দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরৎ পাঠানো হল। আর কমিউনিষ্টরা, তাদের নিজেদের একটা আধাখঁ্যাচড়া কু তৈরি করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে পুরোপুরি উৎখাতই হয়ে গেছে বলে মনে হল, শুধু ওমদুরমানের জীর্ণ সরাইগুলোতে কিছু-কিছু বা কারু-কারু আধা-ফিসফিস ছাড়া। এদিকে, আবার দক্ষিণের একটি দল, আনিয়া নিয়াস, যখন দেখল যে যত উপাদেয় খেজুর ও যত আরব্য গম—সব উত্তরের বদমায়েশগুলো টপাটপ মুখে পুরে চিবোচ্ছে, তারা বেজায় ব্যাজার হয়ে গিয়ে এক বিদ্রোহ লাগিয়ে দিল। বছর-দুই আগে, সেটার একটা জোড়া-তালির ব্যবস্থা করা হল। এই প্রথমবার দক্ষিণের জন্য একটি আঞ্চলিক

সরকার প্রতিষ্ঠিত হল জুবায়, যার প্রধান আবার খার্তুমের জাতীয় শাসনব্যবস্থার একজন সহ-সভাপতি। রফানিষ্পত্তির পুঁটুলিটায় আবার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও দিয়ে দেয়া হল—এটাও প্রতিষ্ঠিত হল জুবায়।

তো, এই-তো দেখছেন, সুদানে আপাতত সামাল দেবার মতো খোলা-খুলি কোনো গণবিক্ষোভ নেই। তবু, স্বভাবতই, হাওয়া একটু থমথমে। সুদানের সোশিয়ালিষ্ট ইউনিয়নের দপ্তরগুলোয় একবার ঘুরে আসুন—হুন্তার যে-দলটা এই মুহূর্তে শাসন করছে এটা তারই সরকারি গালভারি নাম—আর যদি কোনোরকমে একটা পাস্ জোটাতে পারেন, তাহলে একবার সেনাবাহিনীর ছাউনি বা শিবিরগুলোও ঘুরে আসুন। দেখবেন, আস্থার সংকট অবশেষে আবির্ভূত। ক্ষমতা লোকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, কিন্তু পাবার পর তা দিয়ে সে কী করে—বিশেষত সে যদি প্রকাশ্যেই বিভিন্ন মতপথের বিদ্যমান ভারসাম্যটায় কোনো গোল বাধাতে না-চায়? যতই টলোমলো হোক-না কেন, কোনো শক্তিসাম্যের পরিস্থিতিকে এদিক-ওদিক করতে যাওয়ার ঝুঁকি বড্ড বিষম। কেননা, যে-সমাজ আজও যে-কোনো মুহূর্তে উপজাতীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়তে পারে, আপনি অকস্মাৎ সেখানে পরোক্ষ ফলাফলের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসতে পারেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে বৃটিশরা ও-ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ত্যাগ করেছিল : তারা লেপ্টে ছিল তাদের প্রচলিত পদ্ধতির গায়ে ; অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি কাল ধরে তাতে তারা কাজকারবার মন্দ করেনি : তো, তাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে কেমন হয়, তাতে যদি আরো অর্ধশতাব্দী টিঁকে-থাকা যায়?

সুদান সোশিয়ালিষ্ট ইউনিয়নের আশপাশে প্রগতিবাদী বোলচাল, তাই, না ঘরকা না ঘাটকা। এই চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা না-করলেও চলে, কারণ মিশরীয় ওয়াফ্‌ৎ দল আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সব ছাত্রই তা জানে। সতর্কতাই সাহসের শ্রেয়তর অংশ, কিংবা আরো বেশি-কিছু, কারণ সতর্কতার মানে হল ঠিকঠাক পকেটগুলো ভরাট করতে সাহায্য করা। প্রতিটি নথি তিন দফা করে ভরাট করা, আর প্রতি মাসেই একবার করে 'জাতীয় সেনা সাহায্য দিবস' সংগঠিত

করা, তাই, আখের গোছাতেই সাহায্য করে। এইসব কলাকৌশলে লোকের মন ব্যস্ত থাকে—তারা তো আর জানে না যে শূন্য-মানস শয়তানেরই কারখানা বিশেষ। সত্যি-যে গত দুই দশকে অর্থনৈতিক অবস্থা বাস্তবিক অচল হয়ে পড়েছে। সত্যি-যে যন্ত্র পরিচালিত কৃষি-ব্যবস্থার যে সীমানা জাতীয় অর্থনৈতিক স্থাবরতার মধ্যেও বেঁচে যাচ্ছিল, তা ক্ষেতমজুরদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে মুষ্টিমেয় স্বচ্ছল চাষী আর জোতদারের হাতেই সব টাকা জড়ো করে দিয়েছে, জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশই ক্রমবর্ধমান দুর্দশার নিশ্চিত কবলে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এ-যাবৎ কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত ধরাবাঁধা অগ্রাধিকারগুলোয় হাত দিতে সাহস করে না। অতিযন্ত্রায়িত কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে মিশেছে এক ধরনের চিন্তাহীনতা, এমন-কী সবচেয়ে যা স্পষ্ট আর সহজতম, আমদানি বিকল্পগুলোর সম্ভাবনার কথা অব্দি ভাবা হয়নি : বেশির ভাগ সুতোই এখনও রপ্তানি হয়ে চলেছে আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এখনও আমদানি করা হচ্ছে। আর এটা শুধু একটা আপতিক উদাহরণ নয় : এটা কোনো 'নীতি'ই নয়, এ শুধু কোনো অর্থনৈতিক দর্শনের পুরো গোত্রটাকে বোঝায়। এইভাবে দক্ষিণ আর পশ্চিম পাড়ে থাকে বিচ্ছিন্ন : সেখানে রাস্তাঘাটও নেই। নিঃসঙ্গতা শান্তিও জোগাতে পারে। নীল নদে শুধু যদি ক'টা নৌকো বা লঞ্চ ভাসিয়ে দেয়া যেত, তবে যে-বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এই জাতিকে গড়ে তুলেছে, তারা পরস্পরের কাছে আসতে পারত; কিন্তু আপনি কি ঠিক জানেন সেটা উচিত কাজ হবে? তা কি তবে আরো গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলবে না? ত্বরান্বিত করে তুলবে না কি ইতিহাসের প্রক্রিয়া? সত্যি, কী মারাত্মক প্রস্তাবই যে এটা। শিক্ষার ক্ষেত্রেও, সে একই সুনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ও পরিকল্পনাই উৎকটভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষিণ আর পশ্চিমের কথা ভুলে যাও, তারা 'সত্যি এ-দেশের লোক নয়'; এমন-কী 'ত্রিভুজের' বেলাতেও, শিক্ষাখাতে ব্যয়টা একটা তাকলাগানো ডিগবাজি-খাওয়া পিরামিড; প্রাথমিক শিক্ষা বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগগুলো কোনো টাকা পায় না, কিন্তু প্রতি বছর খার্তুমের দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে কলাবিভাগে

গণ্ডায়-গণ্ডায় স্নাতক ওগরাতে সাহায্য করা হয়। এরা এখনও সংখ্যায় কম, এখনও এদের আপনি উৎকোচ দিতে পারেন, স্নাতকদের সবার জন্যই সরকারি চাকরি বাঁধা। ব্যাপারটা সত্যি খুব সোজা ; আরো-কিছু কারেন্সি নোট ছাপুন, মাথা খাটিয়ে বার করুন আরো-কিছু নথি, সব তিন দফা করে লেখা চাই—এরাই স্নাতকদের খুশি, আর মগ্ন রাখবে !

অ্যাদ্দিন অব্দি, কাহিনীটা ছিল বেশ শিষ্ট সুবোধ। হঠাৎ, ইদানিং, গতিশীলতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—কুয়েইত, রিয়াধ, আবু ধাবি থেকে। ও-সব মহল্লার পেট্রলধনী আরব ভাইজানেরা ঠিক জানে না হঠাৎ ছপ্পর-ফুঁড়ে-পাওয়া এই ধনদৌলত নিয়ে কী করবে, তারা হয়তো কয়েক বিলিয়ন ডলার তাদের স্বল্প-সুভাগা ভাইবেরাদরির দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য দিয়ে দেবে—যেমন এই সুদানবাসীদের। উত্তেজনা আর জল্পনাই এখন প্রধান খাদ্য। কত টাকা দেবে তারা ? কতটা বদান্য হবে শর্তগুলো ? দৈবাৎ যদি ফোয়ারার মতো টাকা ঝরে, তাকে তবে কোথায় রাখব আমরা ? দক্ষিণের লোকগুলো তো আর বাস্তবিক আরব নয়, তবে তারা কেন এই আরব খয়রাতির বখরা পাবে ? প্রতি বছর হাজারটা ট্র্যাক্টর আমদানির টাকা থাকবে ? কিংবা কেনা যাবে তো শ-দুয়েক ফসল ঝাড়াপোঁছার যন্ত্র, যাতে ব্যস্ত মরশুমে ঐ হতভাগা বেদুইনগুলোকে না হলেও আমাদের চলবে। আর সেনাবাহিনী ? তার খোলতাই বাড়াবার মতো যথেষ্ট টাকা থাকবে তো : আরো কিছু ঝকঝকে নিঃশব্দ ট্যাঙ্ক, কুড়ি-পঁচিশটা যুদ্ধবিমান, মাটি-থেকে-আকাশে-তাগ-করে-ছোঁড়ার কিছু বিনীত কিন্তু ভদ্রগোছের ক্ষেপণাস্ত্র ?

সুদান বন্দরের ওদিকে, ঠিক লোহিত সাগর পেরিয়ে, সৌদি আরব রাজ্য ; ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, কুয়েইত বা বাকিরাও খুব-একটা দূরে নেই কিন্তু। হঠাৎ, টাকার গন্ধ বাতাস ভরে দিচ্ছে—সে যে আসে, আসে। যুক্তি আর কাণ্ডজ্ঞান দাবি করে যে এত টাকা ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখার জন্য আশপাশে বার্কলেস ব্যাঙ্ক থাকা উচিত। নেই বটে, তবে ঘাবড়াও মৎ, শুভানুধ্যায়ী মার্কিনরা যথেষ্টই উপস্থিত আছেন, গ্র্যাণ্ড হোটেলে ঠাঁই নেই, হুড়মুড় ক'রে একটি নাইল-হিলটন উদিত

হচ্ছে। পেট্রলের টাকা আবার ফিরতি পথে নিয়ে যেতে হবে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিনরা, আন্তর্জাতিক নানা প্রতিষ্ঠান বা ঐ জাতীয় কিছু মারফৎ, এখানে হাজির এটাই সুনিশ্চিত করতে যে, যতটা আরব টাকা সুদানে এসে পৌঁছোয়, সে-সব যাতে খামকা উজবুক সব আদর্শবাদী ক্রিয়াকলাপে খরচা হয়ে না-যায়, বরং যাতে যথাযোগ্য পুঁজি প্রগাঢ় সব পরিকল্পনার খাতে লাগানো হয়, তাতে অন্তত মার্কিন মুলুকের স্থবির বাতিল, দুর্মূল্য যন্ত্রপাতিগুলোর একটা সুরাহা হবে।

নয়া-উপনিবেশিকতার গান দারুণ করুণ, হাই লিলি, হাই লো। বৃটিশরা চলে গিয়েছে, কিন্তু পেছনে ফেলে রেখে গেছে নীল নদের গায়ে মাইল-লম্বা শানবাঁধানো বাঁধ, ঠিক গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনেটায়। যখন সন্ধ্যা নামে, বিশৃঙ্খলভাবে গাড়ি এসে ভেড়ে হোটেলের পাশে, নির্বাসিতরা গিমলেট আর শান্তিতে শরীরের দুঃখ চুবিয়ে দেবার চেষ্টা করে, আর অসংলগ্নভাবে সাত কাহন ফেনায় পরদিন সকালে কোন্ মন্ত্রীদপ্তরটিকে নিজেদের মতে দীক্ষিত করা যাবে; শানবাঁধানো বাঁধটার ওপর প্রাণের তেমন সাড়া নেই, সান্ধ্য-হাওয়া প্রায়ই পলাতক থাকে, মাঝে-মাঝে নীল নদের ওপারে কোনো সেচব্যবস্থার জলের পাম্প ঝগঝগ করে তোতলায়, বাঁধটা এমনিতেই সাধারণত নিরিবিলি থাকে, মাঝে-মধ্যে হয়তো কোনো বেকার তরুণ, হয়তো সে ওম্‌দুর্‌মানেরই লোক, কিংবা হয়তো আরো দূরের, একেবারে ভেতর মহাল থেকে এসেছে, উদ্দেশ্যহীনভাবে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, তার চলার ছন্দে কেমন একটা দুঃখের ছাপ; কোথায় সে চলেছে সে জানে না, জানে না কার কাছে তার শাসকরা কাল সকালে তার ভাগ্যকে বিকিয়ে দেবার তালে আছে। যেটুকু সে আঁকড়ে ধরতে পারে সেটা শুধু এই আশ্বাস যে—সূর্যও ওঠে। কিন্তু সন্ধ্যা যখন নীল নদকে ঢেকে ফ্যালে, এমন-কি এই আশ্বাসটাও সময়-সময় স্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে যায়। ঔপনিবেশিকবাদ মারা গেছে, ঔপনিবেশিকবাদ যুগ-যুগ জিও!

৪৫

বুড়ো হাড়ে ভেলকি

যতই-না কেন আপনি তাকে গালাগাল করুন, বুড়ো হাড়ে আজও ভেলকি খেলে। তাছাড়া মানুষটি মান্ধাতার আমলের। ঐতিহাসিক মহিমা তাকে ঘিরে আছে। আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা; গাঁয়ে-গাঁয়ে ঢোল-শোহরৎ পড়ত; বিক্রমপুর বা কিশোরগঞ্জের খরস্রোত জলপথে নৌকোগুলো আঁকাবাকাভাবে উজান বেয়ে সেই খবর প্রচার করতে করতে যেত; দশ পনেরো কি কুড়ি মাইল দূরে গঞ্জের হাটে মৌলানা আসছেন, তাঁর কথা শোনার, তাঁর দোয়া পাবার, তাঁর নির্দেশ লাভ করার এমন সুযোগ জীবনে হয়তো আর হবে না। চারদিক থেকে আবাল-বৃদ্ধবনিতার ভিড় শুরু হত, গামছায় খাবার বেঁধে তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিনের রাস্তা পায়ে হেঁটে পাড়ি দিত তারা, খাবার ফুরিয়ে গেলেও হাট থেকেই কিনে নেওয়া যেত। সেটা হাটবার, প্রভাতী মোরগের প্রথম ডাকেরও আগে ভাসানি শুরু করতেন। বক্তৃতা বলতে আপনি যা বোঝেন সে-সব ভুলে যান; মৌলানার বক্তৃতায় থাকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ধর্ম সংক্রান্ত অলোচনা, রাজনীতি-অর্থনীতি, চাষবাসের খবর, কিস্‌সা, আর লোক-খ্যাপানোর পাঁচমিশেলি মশলা। প্রথমেই নমাজ পাঠ। হাটের লাগাও প্রকাণ্ড মাঠে এলোমেলো অসংলগ্নভাবে জমায়েৎ হওয়া বিরাট জনতা তাতে যোগ দেয়; চারদিকে গা ছমছম করা প্রশান্তি, তার মধ্যে মৌলানার বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত কণ্ঠস্বর আকাশের গায়ে ধ্বনিত হতে থাকে। নমাজের পর তিনি কথা বলতে শুরু করেন নিচুগলায় শুকনো গদ্যময় ভঙ্গিতে। পয়গম্বরের কাহিনী: তাঁর গৌরব আর তাঁর কীর্তি, তাঁর সিদ্ধপুরুষসুলভ মহিমা, তাঁর দৈব অনুপ্রেরণা,

দরিদ্রের জন্য তাঁর ভালোবাসা ; বস্তুত মৌলানার কাহিনীতে পয়গম্বরই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী এবং ইসলামের মূলমন্ত্রই সাম্যবাদ। সবটাই যদিও ধর্মকথা, আপনি শুনছেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ; মৌলানার জাদুতে আপনি বশীভূত। তার এক সময় হঠাৎ ইসলামিক সাম্যবাদের কথা থেকে বক্তৃতার বিষয় গিয়ে পৌঁছোয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দুশমনি আচরণে, অথবা হিন্দু জমিদারের অত্যাচারের প্রসঙ্গে ; ভূমিহীন কৃষক ও ভাগ-চাষীদের জোট বাঁধতে হবে, মৌলানা বজ্রনিনাদে ঘোষণা করেন ; এ এক পবিত্র জেহাদ, অসাম্য মাথা পেতে নেওয়া পাপ। আবার প্রার্থনা ; এতক্ষণে সাতটা সাড়ে-সাতটা বেজেছে ; নাশ্‌তা করা এবং বেচাকেনার জন্য সভাভঙ্গ হয়। ঘণ্টাদুয়েক পরে সকলে আবার ফিরে আসে : মৌলানাও এসে গেছেন, মাথায় শাদা কাপড়ের টুপি, মাঝে-মাঝে ঘাম মুছে ফেলার জন্য ডান কাঁধের ওপর পরিষ্কার একটি ছোটো তোয়ালে। এবারেও প্রার্থনা দিয়ে শুরু ; তারপরে বক্তৃতার প্রথম বিষয় চাষবাসের প্রণালী ; ধান রোয়ার কৌশল নিয়ে কিছু নির্দেশ, জলের বিলি-ব্যবস্থা বিষয়ে প্রবাদ-প্রবচনের কয়েকটি মণিমুক্তো, ধান ঝাড়াই বা ধান শুকোনো, কিংবা পাট পচানোর বিষয়ে অত্যন্ত সুসংগত কিছু মন্তব্য। তারপর আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত ; দেখে মনে হচ্ছে মৌলানা ক্ষেপে গেছেন। আসলে তা নয় ; নিরীহ, অসহায় বাঙালি কৃষককে ঠকায় আর পিষে ছিবড়ে করে যে রাজস্থানী ফড়িয়া, তার বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ টগবগিয়ে ফুটে উঠেছে ; আবার ফিরে যাচ্ছেন স্থানীয় ভূস্বামীর প্রসঙ্গে ; গ্রাম্য মহাজনের দ্বৈত ভূমিকাও সেই দুর্বৃত্তের একচেটিয়া। পয়গম্বর বলে গেছেন সুদ খাওয়া পাপ ; পয়গম্বরের বিরুদ্ধাচারীদের শাস্তি হোক। আবার প্রার্থনা ; পরিব্যাপ্ত নিস্তব্ধতা ; তারপর কাঁটায়-কাঁটায় মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রামের বিরতি। আবার বিকেল চারটে নাগাদ মানুষজন ফিরে আসে তাদের মৌলানার কথা শুনতে। প্রার্থনার পর ভারতীয় রাজনীতির হালচাল নিয়ে বাগ্‌বিস্তার ; পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন কেন, ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মুসলিম লীগের পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন রূপগুলি কী-কী তাই নিয়ে বিচক্ষণ ও সারগর্ভ মন্তব্য, এবং ঐ দুই

দলের বিষয়ে মৌলানার নিজস্ব মতামত; প্রথম খলিফার আমলের কোনো-একটি ঘটনার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি-তুলনা; আধা-ধর্মীয় সূত্র থেকে পাওয়া একটি গল্পের প্রসঙ্গে আরো গল্প এসে পড়ে; দৈবজ্ঞের ভূমিকায় মৌলানা মাতিয়ে দিচ্ছেন; তারপর আবার প্রার্থনার জন্য বিরতি; ছায়াগুলি দীর্ঘতর হতে থাকে; অন্ধকার নেমে আসে; আরো একটি ধর্মীয় কাহিনী, তারপর রাত্রির খাওয়ার জন্য সভাভঙ্গ হয়। বাচ্চাদের গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো হয়, এখানে ওখানে আগুন জ্বলে—পাটকাঠির আগুন, উজ্জ্বল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। আবহাওয়ায় মেলার ফুর্তি, ধর্মীয় আলোচনা এবং গরমাগরম রাজনীতির একটা অসম্ভাব্য সংমিশ্রণ। মৌলানা ধীরেসুস্থে আবার শুরু করেন যখন রাত্রি গভীর হয়; গুরুভার আকাশ থেকে উজ্জ্বল তারাগুলি নীচে দৃষ্টিক্ষেপ করে, মৃদু হাওয়া বয়ে যায়; অন্যান্য জেলায় ফসলের পরিস্থিতি নিয়ে আরো গল্প, আশপাশের গ্রামে কীভাবে গলায় গামছা দিয়ে খাজনা আদায় করা হচ্ছে, দুরন্ত বর্ষা আসার আগেই কীভাবে চাল ছাইতে হবে, আকালের মাসগুলির জন্য কী পরিমাণ শস্য সঞ্চয় করা উচিত। আনাড়ি রাজস্থানী এবং নাক-উঁচু বাঙালি ভদ্রলোকদের কিস্‌সা; পবিত্র কোরানের শিক্ষা এই, যে সত্য ও সাম্যের জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে; গর্জন, গর্জন; মৌলানার কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়ে যায়, মত্ততায় উদ্বেল জনতা; জেহাদ ঘোষণা করো, বহু শতাব্দীর জেলখানাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফ্যালো। হঠাৎ মৌলানার গলা খাদে নেমে যায়; প্রার্থনা; আজকের মতো সভা সাঙ্গ, কাল আবার ভোরের প্রথম সাড়া জাগলেই মৌলানা শুরু করবেন, কাজেই রাতটা বিশ্রাম করে নাও; প্রার্থনা। লোকের ভিড় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে; বটতলায় আর অন্যত্র তারা জায়গা খুঁজে নেয়, প্রভাতী মোরগের প্রথম ডাকের আগেই তারা জাগবে।

নিয়ম করে এই চলতো দিনের পর দিন: দু-দিন, তিন-দিন, এক সপ্তাহ, দশ-দিন। ভিড়ের মধ্যে যে-সব লোক তাদের গ্রামের পথে রওনা দিত, তাদের জায়গায় প্রত্যহই জড়ো হত নতুন-নতুন লোক। কী ছিলেন না মৌলানা—এক পিতৃপ্রতিম পুরুষ, দার্শনিক, কৃষিবিজ্ঞানী,

পারিবারিক চিকিৎসক, ধর্মগুরু, রাজনৈতিক প্রবক্তা, অলস অপরাহ্নে গল্পের ঝুলি কাঁধে ঠাকুরদাদা—এই সবই তিনি একাধারে। সেই বছরগুলি কেটে গেছে, পূর্ববঙ্গ-আসাম পূর্ব-পাকিস্তানে পরিণত; পূর্ব-পাকিস্তানও আজ বাংলাদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু মৌলানা সেদিনও যেমন সব কাজের কাজি ছিলেন, আজও তাই রয়ে গেছেন।

সেই চালচলন—তাকে বুজরুকিই বলুন আর ভণ্ডামিই বলুন—এত বছর ধরে অম্লান রয়েছে। অবসর সময়ে যিনি ছিলেন জ্ঞানীপুরুষ, মফস্বলি রাজনৈতিক নেতার চাতুরীও তিনি আয়ত্ত করেছেন। মেজাজি মানুষ মৌলানার পক্ষে সাংগঠনিক কাজ ছিল অসম্ভব, তাঁর খেয়াল তাঁকে বিভ্রান্তিকরভাবে এদিক-সেদিক নিয়ে গেছে। হুইটম্যানের মতো স্ববিরোধই ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যা, তিনি তাই। সেই মহিমা এবং সেই বশীকরণের ক্ষমতা আজও একটুও কমেনি। তিনি সভায় বলতে উঠলে ভিড় ভেঙে পড়ে। তাঁর মুখের মতো জবাবগুলিতে তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ক্রোধের প্রকাশে হাত-তালিতে ফেটে পড়ে, তাঁর কটু রসিকতায় উল্লসিত হয়। ধর্মজ্ঞ হয়েও তিনি অপবিত্র ভাষা ব্যবহার করে পার পেয়ে যান। মৌলানা বাংলা-দেশের রাজনীতিতে অনিশ্চয়তার প্রতিভূ, আপনার-আমার যত্নে হিসেব-করা যোগফলের খেলা বানচাল করাই যার কাজ।

বদমায়েশি বলতে হয় বলুন, ওঁর মন্ত্রশক্তিকে কিন্তু আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। বর্তমানে তিনি যে অনশনব্রত নিয়েছেন, তার পরিণতি বিয়োগান্ত হতে পারে, কিংবা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াও হতে পারে। শেখ মুজিবকে ঝামেলায় ফেলাই যে তাঁর উদ্দেশ্য, সেটা তিনি গোপন করেন নি। দ্বিধাহীনভাবেই তিনি ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির কবর খুঁড়তে চেয়েছেন। চোখে একটু ঝিলিক দিয়ে দর্শনীয় রকমের দাড়িতে ঝড় তুলে তিনি শ্রোতাদের জানাবেন আজ এবং চিরকালই বাংলাদেশের প্রধান শত্রু ভারতবর্ষ। ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার স্পর্ধা দেখানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকেও এক হাত নেবেন তিনি। ইসলামিক সাম্যবাদে কোনো গলদ নেই; বেশির ভাগ হিন্দুই ধর্মভাবাপন্ন এবং

আল্লা ও ঈশ্বর অভেদ বিশ্বাসে ইসলামিক সাম্যবাদ সমর্থন করবে, এ-কথা তিনি শ্রোতাদের বুঝিয়ে থাকেন। তাছাড়া, যাই হোক-না কেন তাঁর স্বপ্নের বৃহত্তর বাংলা, আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবেই, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। তাঁর বিছানার পাশে অপেক্ষারত দর্শন-প্রার্থীকে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানান, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বৃহত্তর বাংলার জন্য আন্দোলন আরো দানা বাঁধবে, কেননা হিন্দু বাঙালিদের ওপর নয়াদিল্লির অত্যাচার কি পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের বিরুদ্ধে রাওয়ালপিণ্ডির বর্বরতাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে না? মৌলানার আজকালকার বক্তৃতাগুলোর ওপর চোখ বোলালেই দেখা যাবে যে সেই চিরাচরিত ধারাই রক্ষা করা হয়েছে; শৈলীতে ধর্মভাবের সঙ্গে চাতুর্যের সেই চমৎকার মিশ্রণ, ভ্রাতৃসুলভ গার্হস্থ্য উপদেশের মোড়কে রাজনৈতিক হঠ-কারিতার ষড়যন্ত্র।

মৌলানার খেয়ালিপনার মধ্যে একটা ছক হয়তো আছে। পাকিস্তানের কর্তারা কখনো তাঁকে বেশি পাত্তা দেয়নি। ঐটেই আসল ব্যাপার; মৌলানার কথাগুলিকে কেউ আক্ষরিক অর্থে নেয়নি। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক প্রয়োগে বিশ্বাসী শিষ্য মুজিবর রহমান ভেতরে-ভেতরে জমে-ওঠা অসন্তোষ ও নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে এক-লক্ষ্যে আনতে পেরেছেন; তার ফলে যে বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা অগ্রাহ্য করার নয়। সেই বাস্তবকে অগ্রাহ্য করার ফলেই দেশ টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। এ-ঘটনা আবার ঘটতে পারে। মৌলানা অপসৃত হলেও, তাঁর প্রভাব মানুষের মনে থাকবে। তাঁর পরিকল্পনার সারমর্ম এমন কেউ ব্যবহার করবে যার সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ধৈর্য আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যেখানে পেটিবুর্জোয়া আবেগের দ্বারা চালিত, সেখানে বাস্তব থেকে পলায়নের মাধ্যমেই কিছু সময় পাওয়া যেতে পারে। প্রতিবাদের যে মেঘডম্বর আমরা মৌলানার কাছ থেকে পাচ্ছি, কিছু সময়ের ব্যবধানে সে-ধরনের প্রতিবাদকেই কিছু লোক বাস্তবকে এড়ানোর উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। রিটা হেওয়ার্থের পুরোনো গান আছে: আমায় দোষী করো। আজ হোক,

কাল হোক, বাংলাদেশ দোষী করবে নিজেকে নয়, সীমান্তের এপারে ভারত সরকারকে। এপারে দাঁড়িয়ে যারা আত্মপ্রশংসায় মুখর, বাংলাদেশের লাভলোকসানের হিসেবটা তাদের পক্ষেও শেষ পর্যন্ত উদ্ভট হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৪৬

একখানা বিপ্লবই কি যথেষ্ট ?

মাঝে-মাঝে মনে হয় শেখ মুজিবর রহমানের যদি একটার বেশি মুখ থাকত! এই অর্ধরচিত, আধা-আয়োজিত মহানগরীর জটিল গোলক-ধাঁধার যেখানেই আপনি লুকোন না কেন, এই মুখটির কাছ থেকে আপনার রেহাই নেই; যাবতীয় দেয়াল থেকেই সে আপনার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছেঃ সে-দেয়াল হোটেলের লবিরই হোক বা বড়ো সরকারি চাকুরের বৈঠকখানাই হোক, সিনেমাহলের করিডরেরই হোক কিংবা ঢাকা থেকে নদী পেরিয়ে কুড়ি মাইল দূরে, আপনার পূর্বপুরুষের বসতবাটির দিকে যাবার সময় লঞ্চঘাটার বিশ্রামাগারের নড়বড়ে দেয়ালই হোক—মুখটি সর্বত্র, ঈষৎ সদাশয়, ঠোঁটে-জমে-যাওয়া ফাঁকা হাসির ঈষৎ স্ফুরণ, সে ছড়িয়ে আছে বিজলি বাতির থামে, রাস্তার মোড়ে টাঙানো বিজ্ঞপ্তিতে, ফুটবল স্টেডিয়ামের ওপরে। একটু যে ভুলে থাকবেন, তার জো নেই, এক ঝলকের জন্যও নয়, আপনার মনে পড়বেই যে আপনি বঙ্গবন্ধুর দেশে, কুলপতির দেশে এসেছেন। আপাতত বাকি সব কিছুই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার মনে হবে, যেন একেবারেই অবান্তর।

সম্ভবত দারিদ্র্যের সর্ববিসারী উপস্থিতি বাদে। ধানমণ্ডি আর গুলশানের বিলাস-ভবনগুলো অপরিমেয়রূপে প্রতারক। বাংলাদেশ, একবার তার ফিনফিনে বোরখাটা খুলে ফেলবার পর, ভয়াবহরূপে দরিদ্র এক দেশ হয়ে দেখা দেয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা অবশ্যই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মেজাজ শরীফ থাকলে, স্থানীয় লোকেরা যাকে বলত নীলক্ষেত, পঁচিশ বছর আগেকার সেই বিশাল ধানক্ষেতের পাশে

এই আধুনিকদর্শী স্থাপত্য, চাই কী, আপনার হৃদয়ে আহ্লাদ জাগিয়ে দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকায় ওঠা-নামা করার সময় বা এলিফ্যাণ্ট রোড অথবা মতিঝিল এলাকায় বেড়াবার সময়, আমরা-পৌঁছে-গিয়েছি-বেহেস্তে জাতীয় ধ্বনি আপনাকে প্রমোদ দেবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় লালন করছে ছাত্রছাত্রীর এক নতুন প্রজাতিকে, যারা অন্তত মুক্তি সম্ভব করার আংশিক কৃতিত্ব দাবি করতে পারে; প্রত্যাশা অনুযায়ীই—কিংবা প্রত্যাশারও বেশি হয়তো—এরা তাদের পশ্চিমবঙ্গের সমধর্মীদের মতো বহুবিধ মতে-পথে বিভক্ত। শুনে মনে হয় মার্কস-বাদী এমনি সব জিগিরের প্রতি তেমনি আসক্তি, কবে কোন্‌কালে কোন্‌ দূরদেশে কী ঘটেছিল তার সঙ্গে নিজের দেশের অবস্থা ও কাহিনীর সাযুজ্য খোঁজার তেমনি মরিয়া চেষ্টা। ঢাকা এখনও একটি রক্ষণশীল জায়গা, আর সামাজিক চালচলনের রীতি এখনও স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশায় বাধা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়, অবশ্য, এক অন্য ছবি তুলে ধরেঃ তরুণীরা তরুণদের সঙ্গেই একই ধ্বনি তুলে যাচ্ছে। আর যেটা, আপনাকে দখল ক'রে বসবে সেটা বাংলা ভাষার অদম্য ও অপরিমেয় উপস্থিতি। গাড়ির নম্বরফলক, বাড়ির নাম ও দোকান-পাটের নামধাম থেকে শুরু ক'রে পুঙ্খানুপুঙ্খ সরকারি চিঠিপত্র সমেত প্রায় সবকিছুই বাংলা ভাষায়। আর এ-বাংলা আবার বিশেষ ধরনের, সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সুখশ্রাব্য, কবিত্বময়, গীতিময়, আভিজাত্যসম্পন্ন, কল্পনায় ভরপুর। যেন নবোদ্গত বাঙালি মধ্যবিত্ত তার নবাবিষ্কৃত অহংএর আতিশয্যে একটা প্রচণ্ড পাক খেয়েছে। দু-দিক থেকেই সারূপ্য চরমঃ অহংই বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষাই অহং।

কিন্তু ধানমণ্ডি, গুলশান, বিশ্ববিদ্যালয় আর মতিঝিলের আশপাশ তো ওপরকাঠামো। জনগণ একেবারেই অন্যরকম। তার অন্তঃসার জানতে হলে আপনাকে শুধু পুরানা শহরের বিসর্পিল পথে একটু যেতে হবে, একটু, মাইলখানেকও নয়। সেখানটা গিশগিশ করছে লোকের ভিড়ে, গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, সাইকেল, রিক্সা, ফিরিওলা, মিনা-

বাজার, আরো লোক, আরো গাড়ি, আরো সাইকেল রিক্সা, আরো ফিরিওলা। সর্বত্র ঝুলে আছে ক্ষয় আর অবক্ষয়ের ঝিমধরা গন্ধ। গত পঁচিশ বছরে পুরানা শহরে প্রায় কোনো নতুন বাড়িই ওঠেনি। ইতস্তত জোড়াতালি মেরামতি পুরানা শহর থেকে আকীর্ণ মৃত্যুর ছায়া ঠেলে সরাতে পারেনি। অথচ তবু এক বিরামহীন গুঞ্জরন তুলে জীবন বয়ে চলে পুরানা শহরে। এ এক বিষম ধাঁধা। রোজই যেন ভূসম্পত্তি আরো টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জমছে আরো আবর্জনা, জঞ্জাল, লোকের ভিড়। পরিবহণ ব্যবস্থা রোজই আরো দুঃস্বপ্নচারী হতাশায় ভরে যাচ্ছে, কিন্তু কেমন করে যেন জীবনের ছন্দস্পন্দন ধুকধুক করে চলেছে।

গাঁয়ে-গঞ্জেও এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। আপনার মোটরগাড়ি ফেলে বেরিয়ে পড়ুন নৌকোয় করে বিক্রমপুর বা মানিকগঞ্জের অভ্যন্তরে। পঁচিশ বছর আগে যেমন লাগত তার চেয়ে করুণ শোকাতুর দেখায় মাটিপৃথিবী। অন্যরকম হতে পারত না অবশ্য। বাংলাদেশে এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা তিনের বেশি—এবং শহরের চেয়ে পাড়াগাঁয়ে হার বেশি হতে বাধ্য। দশকের পর দশক ধরে কৃষির বিকাশ সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। চাষের জমির শতকরা নব্বুই ভাগে ধান ফলে, অথচ তবু, চিরকালই, এবং এখনও চালের বিষম অভাব লেগেই আছে। পাট চাষ নগদ টাকা জোগায় বটে, কিন্তু চতুর সপ্রতিভ পাঞ্জাবিরা পাট এবং অন্যান্য পণ্যের বিনিময়-মূল্য এমনই করে রেখেছে যে গত পঁচিশ বছরে চাষীরা দরাদরি করে হাতে পেয়েছে সামান্যই। পূর্ববঙ্গে ১৯৫০-এর জমিদারি অধিগ্রহণ ও রায়তওয়ারি আইন মারফৎ হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের উৎখাত করা গেছে, এবং সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেয়া গেছে ৩৩ একর। আইয়ুবের আমলে সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ১২৫এ, এখন আবার তাকে নামিয়ে আনা গেছে ৩৩এ। তাহলেও অবশ্য চাষের জমির বিলিবণ্টনে বৈষম্যের মাত্রা ভারতের চেয়ে কম, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে তো কম

বটেই। কেবল শতকরা ২০ জন চাষীর এক চিলতে জমি নেই, পশ্চিমবঙ্গে তার পরিমাণ শতকরা ৩৭। পারিবারিক খামারের গড় আয়তন বাংলাদেশে তিন একরের চেয়ে একটু বেশি। জমি যদি সব চাষীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যায় তাহলে তা নেমে আসবে মাত্র দুই একরে। যদি কোনো-কোনো অর্থনীতিবিদের ওকালতির ধুয়ো ধরে সাড়ে-বারো একরকে সর্বোচ্চ সীমা ধরা হয় এবং অতিরিক্ত জমি সব ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়, প্রতিটি ভূমিহীন চাষী পরিবার আধ একর জমিও পাবে কিনা সন্দেহ। আর জনসংখ্যা যে-হারে বাড়ছে, তাতে চাষের জমির আয়তন আরো ছোটো হয়ে আসবে।

এ-সব সত্ত্বেও কৃষির অবস্থা অন্যরকম হতে পারত যদি এত বছর তাতে কিঞ্চিৎ অর্থ বিনিয়োগ করা হত। কিন্তু তা হয়নি, এবং পরিহাস এটাই যে তার ফলেই হয়তো জমিদারদের তাড়িয়ে দেবার পর মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গ তাদের নিজস্ব কুলাকশ্রেণী বসাতে পারেনি যারা পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে নিজেদের উৎকাঙ্ক্ষা লড়িয়ে দিতে পারত। এই অবিশ্বাস্যসুন্দর বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাবেন, অথচ তবু চোখে পড়বে না কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ন্যূনতম দৃষ্টান্ত অথবা ঈষৎ আধুনিকীকৃত সেচব্যবস্থা। এমন-কি জরাজীর্ণ খামারবাড়িগুলোকে দেখায় যেন প্রাক-৪৭ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

পরিকল্পকেরা, ঢাকায় বসে শুধু পাট নয়, অন্য অনেক দিকে প্রকল্পগুলিকে ছড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে যান—গ্যাস, সার, অন্যান্য তৈল-রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, তৈল নিষ্কাশন, ইস্পাত তৈরি ইত্যাদি যাবতীয় উদ্যোগের স্বপ্ন দ্যাখেন তাঁরা। আদর্শবাদীরা, অন্য দিকে, স্বপ্ন দ্যাখেন ভূমিসংস্কারনীতির আদ্যোপান্ত বদল—আর সেই সঙ্গে অর্থনীতির প্রতিটি গলিঘুঁজিতে নিখুঁত সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টার প্রয়োগ। বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার প্রধান সমস্যা কিন্তু, তবু, থেকেই যাবে: অর্থাৎ ছোটো-ছোটো জমির উৎপাদনের সীমা কী করে

বাড়ানো যাবে, খোলাখুলি কী করে দুর্লভ কিছু পুঁজি এদিকে লগ্নী করা যাবে, এ-সব প্রশ্নের কোনো সমাধান হবে না। এমন-কি ভূমিসংস্কারকে যদি তার কার্য-করতার শেষ সীমাতেও নিয়ে যাওয়া যায়, তবু অন্তত পরিষেবামূলক কাজ আর উৎপাদন বিপণনের ক্ষেত্রে আনুপাতিক অর্থনীতির সাহায্য নিতে হবে। এদিকে শেখ মুজিবের মত কেউ যদি বিশ্বাস করে বসে যে একটি বিপ্লবই যথেষ্ট, সামাজিক আততি ও সংঘাতকে তবে যে করেই হোক ঠেকাতে হবে। চুরি-জোচ্চুরি যদি চলতেই থাকে আর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কৃষিখামারের মালিকরা যদি ভূমিরাজস্ব মকুবের জন্য হট্টগোল চালিয়েই যায়, উদ্বৃত্ত কোনো তহবিল কিছুতেই জুটবে না। রাজনৈতিক চাপ ও জরুরি অবস্থা তখন হয়তো বিদেশীদের টাকা খাটাবার উদ্গ্রীব প্রস্তাবটাকেই লুফে নিতে বাধ্য করবে— মার্কিনরা যেমন তাদের ১৯৭১-এর হঠকারিতার দাম হিসেবে নগদ টাকা দেবার জন্য মুখিয়ে আছে।

শেখ শক্তধাতের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদ—দরকার হলে গরম গরম বুলির দাওয়াই ছিটোতে তিনি কসুর করবেন না বা তার জন্য লজ্জিতও হবেন না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর রণকৌশলে তিনি এতটাই মুগ্ধ যে তাকে কাজে খাটাতেই তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি ধ্বনিগুলোকে প্রগতিবাদী করে তুলবেন, কিন্তু দলকে নয়। সমাজ-তান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার পুনরুজ্জীবনের কথাবার্তা চলবে, আর তারই মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায়—এমন-কি বিদেশী মালিকানায়—শিল্পোদ্যোগের একটি দশসালা ছুটি মঞ্জুর হয়ে যাবে। বৈদেশিক নীতিনিরপেক্ষতার মহড়ার মধ্যেই হাট করে দরজা খুলে দেয়া হবে বিদেশী সাহায্যের কাছে : অ্যাদ্দিনে সব ছোটোখাটো রাষ্ট্রই হাড়ে-মজ্জায় জেনে গেছে কেমন করে ধনী দেশগুলোর একটাকে আরেকটার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে খেলিয়ে-খেলিয়ে বেশী টাকা আদায় করতে হয়।

আওয়ামি লীগ যেহেতু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতোই বহুভাষী

ও হরবোলা, কর্মসূচিতে ভূমিসংস্কার ব্যাপারটি থেকে যাবে নেহাৎ লোক দেখানো, ছেলে ভোলানো। দলের মধ্যকার আদর্শবাদীরা এতে হতাশ হয়ে পড়বেন। অনতিবিলম্বেই তাঁরা আওয়ামি লীগ থেকে টুপ করে খসে পড়বেন, বহুধাচ্ছিন্ন প্রগতিবাদী দলগুলোয় গিয়ে ভিড় জমাবেন। পশ্চিমবঙ্গের কায়দায় এই দলগুলো নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করবে—প্রতিদিনকার মন্ময়, অন্তর্মুখ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ পরিস্থিতির দ্বন্দ্বরূপ অধ্যয়ন করবে। মার্কিন টাকায় দেশ ছেয়ে যাবে। যদিও মার্কিনরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সবগুলো চাপা সুরকে দমাতে পারবে না, তারা অন্তত তুষ্ট হয়ে তাকিয়ে দেখবে জন্ম-লগ্নেই পাশ্চাত্যবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর বিষঙ্গী ভবন। লোকে ক্রমশই ভারতবিদ্বেষী হয়ে উঠবেঃ সব কাল্পনিক বা সত্যিকার বাধাবিপত্তির জন্য দায়ী করা হতে থাকবে ভারতীয়দের কলকাঠি নাড়াচাড়াকে। কিন্তু সে তো নিয়তিই ভারতের নাগাল ধরে ফেলছে। কাউকে তো তার নিপীড়ক পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। ভারত—সে তো আসলে মারোয়াড়ি ফড়ে আর দালাল আর বাঙালি হিন্দু জমিদারের সমাহার —ভারত এছাড়া অন্য কোনোরকম পরিসমাপ্তিই আশা করতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ তাই চমৎকার সব বাংলা কবিতা লিখে যাবে, আর ভারতের উদ্দেশে ঘৃণা আর বিষ ওগরাবে; শেখ, কোনো নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে ভারতের সঙ্গে শাশ্বতমৈত্রী বন্ধনের কথা আওড়াবেন এবং দলের মধ্যে নিত্যই লোককে ভারত যে কী-সব চক্রান্ত করে চলেছে সে-সম্বন্ধে সরবে ফুঁসে উঠতে অবাধ সাহায্য করবেন।

ভূরি-ভূরি শোনা যাবে সমাজতন্ত্রের কথা, কিন্তু শাসনযন্ত্র ক্রমেই আরো স্বৈরাচারের দিকে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকবে। সব মিলিয়ে, বাংলাদেশকে এমন-এক অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, গত পঁচিশ বছর ধরে ভারত যার মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছে। এমন-কি তাও অবশ্য দেশ দুটিকে মেলাবেও না, ঘনিষ্ঠও করবে না।

এদিকে, যখন আপনি আলোচনা করছেন, ১ জানুয়ারি ১৯২৭-এ তোপখানা রোডে যা হয়েছে, তার সঙ্গে বার্লিন অক্টোবর ১৯২৭ অথবা এপ্রিল ১৯৩২-এর কী অদ্ভুত সাদৃশ্য, শেখের ছবি আপনার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকবে। এতে কিছুই এসে যায় না, শেখ সকলেরই তত্ত্বাবধান করবেন, সব কিছুরই, দু-একটা ছোটোখাটো গরমিল শুদ্ধ।